বারিদবরণ ঘোষ

আদিম

বসবাসের

ভিটে

ও অন্যান্য

ভূতেরা একসময় কলকাতার জমিদারি করতেন। বিশেষ করে ইংরেজদের আমলে। দেশি-বিদেশী ভূতে জমজমাট শহর কলকাতার বড় বড় বাড়িতে এমনকি মামলার ভয় থাকলেও হাইকোর্টে পর্যন্ত তাঁদের বাসা ছিল। গান শুনতে ভূতে ভালবাসে কিনা বলতে পারি না, কিন্তু আকাশবাণীতে এঁরা থাকতেন; থাকতেন নাচমহলেও। ক্রমশ তাঁদের আত্মীয়-স্বজনেরা কলকাতা ছাড়িয়ে শহরতলি এবং আরও দূরে ভারতের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের সবাইকে এক জায়গা করে গা-ছমছম-করা একটা অশরীরীর রাজ্যে এই বইয়ের পাঠকেরা উপস্থিত হবেন। তাঁদের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেতে পারে, পেঁচোয় তাঁদের আক্রমণ করতে পারে জেনেও এই বই শেষ না-হওয়া অবধি তাঁরা ছাড়তে পারবেন না। এমনকি সাকিন কলকাতার ভূতেদের নিয়ে প্রবীণ-নবীন গল্পগুলো বাড়তি হিসেবে পেয়ে মনে হবে ভূতের রাজা বর দিয়েছে বলেই এই ঐতিহাসিক- রসময় বইটি আপনার হাতে এল। এখন লেখক একদা এঁদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন বলে এর বিশ্বাসযোগ্যতায় সন্দেহ জাগবে না।

9 788180 930584

বীরভূম জেলার নানুর থানা বড়া গ্রামে ১৫ জুন ১৯৩৯ তারিখে জাত বারিদবরণ ঘোষ স্বগ্রাম ও বোলপুর-এর নানা বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের পর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্নাতকোত্তর উপাধি সসম্মানে লাভের পর ইউজিসি বৃত্তি পেয়ে শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করে পিএইচ.ডি. উপাধি—ভূষিত হন। পরে বাংলা সমাজ ও সাহিত্যে নিত্যানন্দ বিষয়ে গবেষণান্তে ডি.লিট উপাধি—ভূষিত হন। শ্রীগোপাল ব্যানার্জি মহাবিদ্যালয় ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পর বর্তমান বেলুড় বিবেকানন্দ ডিম্‌ড্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত। কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত সিনিয়র ফেলোশিপ ফর আউটস্ট্যাণ্ডিং মেরিট প্রাপ্ত হয়ে 'রবীন্দ্র সংবর্ধনার ইতিহাস : দেশে ও বিদেশে' দুই খণ্ডে রচনা করেন। রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৫২, সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৭০। বর্তমানে ১০ খণ্ডে প্রয়াত বাঙালি জীবনীকোষ রচনায় ব্যাপৃত। আমাদের প্রকাশনা থেকে রচিত সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা ১০।

'ভূত শব্দটি শুনলেই একটা গা-শিরশির ভাব জাগে। প্রবল অবিশ্বাসী গলা ফাটিয়ে ভূত নেই বললেও ভিতরে ভিতরে তিনি জানেন, তিনি সত্যি কথা বলছেন না। ভূত কবে থেকে আছে কেউ জানেন না, মনে হয় মৃত্যু যেদিন থেকে শুরু হয়েছে, সেদিন থেকেই তেঁনারা মনুষ্য সংসারে বাস করতে লেগে গেছেন।

ভূতেরা নানা প্রকারের। হিন্দু-মুসলমান-খ্রিশ্চান ভেদে কেউ পেত্নী-ব্রহ্মদৈত্যি, কেউ মামদো, কেউবা শুক বা গবলিন। এদের আচার ব্যবহার আলাদা আলাদা রকমের। কলকাতা শহরের পত্তন হতে না হতেই নানান জাতের ভূত—পুরুষ এবং মহিলা কলকাতার নানান বাড়িতে বসবাস শুরু করে দেয়। এদের মধ্যে এঁদো ভূতেরা আদাড়ে-পাঁদাড়ে থাকলেও খানদানি ভূত, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পেত্নীরা বেশ জমকালো সব বাড়িতে থাকাটাই পছন্দ করেছিল। এদের মধ্যে বেলভেডিয়ার—এখনকার জাতীয় গ্রন্থাগার, হেস্টিংস হাউস, আকাশবাণী থেকে রাইটার্স বিল্ডিংস মায় জিপিও-এর বাড়িতে এদের থাকা নিয়ে নানা সময়ে নানা কাহিনী গড়ে উঠেছিল। অনেকে কলকাতা এবং বৃহত্তর কলকাতা এমনি সারা ভারতের বাঙালি আবাসে ভূত স্থান নিয়ে চমৎকার সব স্মৃতিকথা লিখে গেছেন। সেইসব কাহিনী আর স্মৃতিকথা নিয়ে কলকাতা এবং অন্যত্র ভূতেদের কীর্তিকলাপ নিয়ে গড়ে উঠেছে এই বইয়ের লোমখাড়া-করা শিরা-উপশিরাগুলি। কলকাতার ভূতেদের নিয়ে গল্পও কম লেখা হয়নি। এসবেরই ভূতীয়-ককটেল হল এই বই। রাতে পড়লে আলো নিভিয়ে ঘুমোতে যাবেন না, দিনে পড়লে একা একা থাকতে পারবেন না।

আদিম কলকাতার ভুতুড়ে বাড়ি
ও অন্যান্য

বারিদবরণ ঘোষ

নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড □ কলকাতা-৭০০ ০০৯

ADIM KOLKATAR BHUTURE BARI O ANANNYA

by Barid Baran Ghosh

₹ 250/

প্রথম প্রকাশ

জুলাই ২০১৩ □ আষাঢ় ১৪২০

প্রকাশক

সমীরকুমার নাথ □ নাথ পাবলিশিং

৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড □ কলকাতা-৭০০ ০০৯

অক্ষর বিন্যাস

নায়েক এন্টারপ্রাইজ

১৩০৮ পূর্ব সিঁথি রোড □ কলকাতা-৭০০ ০৩০

প্রচ্ছদপট

রঞ্জন দত্ত

মুদ্রণ

অন্নপূর্ণা প্রিন্টার্স

৬১ সূর্য সেন স্ট্রিট □ কলকাতা-৭০০ ০০৯

ISBN : 978-81-8093-054-4

পরিবেশক

আদি নাথ ব্রাদার্স

৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট □ কলকাতা-৭০০ ০৭৩

₹ ২৫০ টাকা

আমার ভূতগ্রস্ত কনিষ্ঠা কন্যা

সুবর্ণাকে

পরম স্নেহে

—বাবা

সূচিপত্র

- খোদ কলকাতার ভূতুড়ে বাড়ি ২৪—৯৬
  - ★ হেস্টিংস হাউসের অশরীরী সাহেবরা ২৫
  - ★ ভূতের পিয়ানো বাজানোর রহস্য ২৮
  - ★ ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পাল্কিতে ভূত ৪৮
  - ★ হাইকোর্টের চত্বরে ভূত ৫২
  - ★ রেডিও স্টেশনের ভূত-সম্প্রদায় ৫৮
  - ★ মহর্ষি ও কবির ছায়া দেখা গেল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ৬৫
  - ★ ভূতের কবলে রাইটার্স ৬৭
  - ★ চিঠিবাড়িতে ভূতের সংসার ৭৭
  - ★ মাঝেরহাট ব্রিজের সেই বাড়িটাতে ৮৫
  - ★ কবি করুণানিধান ভূতের সঙ্গে মাংস খেলেন ৮৮
  - ★ জ্যান্ত মেমের ঘাড়ে মামদো আত্মা ৯০
- নিজের চোখে ভূত দেখা ঃ এদিক-সেদিক ৯৭—১৪৪
  - ★ কুকুর ভূতের কারসাজি ৯৯
  - ★ ভূতেও পায়েস খেলেন ১০১
  - ★ সুন্দরী পেত্নীর পাল্লায় বঙ্কিমচন্দ্র ১০৪
  - ★ কবরেজ বাড়িতে মুসলমানি ভূত ১১০
  - ★ তারাশঙ্করের বাড়িতে ভূত! ১১৫
  - ★ পিঠাপুরম্-এর হানাবাড়ি ১১৭
  - ★ হাকিমের বাংলোর বিবিভূত ১২৫
  - ★ বারাসতে 'শিশিরকুঞ্জে' প্রেতাত্মার কথোপকথন ১৩১
  - ★ দেওঘরের এক বাড়িতে দিনের বেলায় ভূত দেখা গেল ১৩৮
  - ★ ধূর্জটিপ্রসাদ ভূত দেখলেন মামার বাড়িতে ১৪১
- আধুনিক সাহিত্যিকেরাও ভূত দেখেন ১৪৫—১৫৪
  - ★ আলো জ্বালিয়ে গিয়েছিল—শক্তি চট্টোপাধ্যায় ১৪৭
  - ★ বন্ধুর ভূত পাশের খাটে!—সমরেশ বসু ১৪৭
  - ★ ভূত মুখে বরফের কুচি ছড়িয়ে গেল—সুচিত্রা মিত্র ১৪৯
  - ★ হেডলাইটের আলোয় ছায়ামূর্তি—তপন সিংহ ১৫০

★ এসে মালিশ করে গেল!—মৃণাল সেন ১৫১
★ ভূত নাবানো—হুতোম প্যাঁচা ১৫২
● কলকাত্তাইয়া ভূতের গল্প ১৫৫—২৫৬
★ মহেশের মহাযাত্রা—পরশুরাম ১৫৭
★ হানাবাড়ির খপ্পরে—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ১৬৮
★ ডাক্তারের সাহস—প্রবোধকুমার সান্যাল ১৭৯
★ দুই বন্ধু—বুদ্ধদেব বসু ১৮৪
★ নিজে বুঝে নিন—আশাপূর্ণা দেবী ২০০
★ ম্যাজিকের ভূত—সুমথনাথ ঘোষ ২১৮
★ টেলিফোন—সত্যজিৎ রায় ২২৫
★ সত্যি ভূতের গল্প—বিমল কর ২২৯
★ সঙ্গী—আলোক সরকার ২৩৪
★ ছেলেবেলার ভূত—প্রলয় সেন ২৩৯
★ ভূতুড়ে রসিকতা—আনন্দ বাগচি ২৪৪
★ ভূতেরা এরকমই হয়—বিকাশ বসু ২৫১

॥ ভূতাত্মা-বাণী ॥

দেখতে দেখতে আমার ভূতচর্চার রজত-জয়ন্তী বর্ষ অতিক্রান্ত প্রায়। কোন্ শুভলগ্নে শ্রদ্ধাভাজন রমাপদ চৌধুরী আমাকে দিয়ে 'ভূতের কুলপঞ্জিকা' লিখিয়ে আনন্দবাজারের পুরো পাতা জুড়ে ছেপে দিয়েছিলেন—তারপর থেকে আমি ভূতগ্রস্ত হয়ে আছি। নয় নয় করে খান পাঁচেক ভূতগ্রন্থ রচনা-সম্পাদনা করে বসে আছি। বহুজনের, সকলেই তাঁরা পেঁচোয়-পাওয়া সন্দেহ নেই, আমাকে সাধুবাদ (সাধুতা বাদ এই অর্থে কিনা জানি না) জানিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নরম 'ভূতুম' হয়ে পড়েছিলেন 'জনপদবধূ' উপন্যাসের ক্ষণজন্মা রচয়িতা শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন সেরা ভূতের গল্প সঙ্কলনে আমার 'ভূতিকা' পড়ে, যা আমার কাছে প্রায় 'নোবেল' পুরস্কারের ('Noble' prize) কাছাকাছি ছিল। এরপর থেকে প্রকাশকেরা আমার কাছে ভূতেদের ঠিকানা, মর্জি, খাওয়া- দাওয়া ইত্যাদি প্রসঙ্গে এমনতর সব প্রশ্ন করেন যে আমার শরীরী অবস্থান সম্পর্কে আমি নিজেই সন্ধিহান হয়ে পড়েছি।

এই অশরীরী জগৎ সম্পর্কে আমার রক্তের সম্পর্ক বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে শ্রদ্ধাভাজন শ্রীসমীরকুমার নাথ একাধিক বছর ধরে কলকাতার ভূত বিষয়ে (কারণ তাঁদের আভিজাত্য বা খানদানই আলাদা) একটি বই লিখবার জন্যে তাগাদা দিতে থাকেন। এ বিষয়ে আমার দীক্ষাগুরু 'ওঝা' মশায় ছিলেন জাতীয় গ্রন্থাগারের বন্ধু সুভাষ সমাজদার মশায়। তিনি গুণী মানুষ ছিলেন অনেকেই জানেন। কিন্তু আমার কাছে তিনি গুণিন মানুষও। তাঁর একটি এতদ্বিষয়ক গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন এই সমীর নাথ মশায়। বোঝা যাচ্ছে বহুদিন ধরেই তাঁকে ভূতে ধরেছে। সমাজদার মশায় আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন বেশ কয়েক বছর। তাঁর নির্মিত ইমারতে দাগরাজি আর রং-রিফু করে একটি বই লেখার কথা হল সমীরবাবুর সঙ্গে। এ বই তারই ফসল। আখ্যাপত্রে লেখক হিসেবে আমার নাম ছাপা হয়েছে। কিন্তু যা ছাপা হয়নি অথচ উজ্জ্বলভাবে পাঠকেরা পড়তে পারছেন—তা আমার ওই বন্ধুবরের নাম। তাঁকে আলাদা করে না ছেপে গোটা বইয়ের অঙ্গে অঙ্গে নামাবলির মতো ধারণ করে নিয়েছি।

ভূত আছে কিনা?—এই প্রশ্নের উত্তরে আমি খুব সহজ করে বলে থাকি—আছে, আছেই। আবার যাঁরা ঘুরিয়ে প্রশ্ন করেন—ভূত বলে কোনও কিছু নেই, তাঁদেরকে আমি আরও সহজে বলি—না, ভূত বলে কিছু নেই, নেইই তো। আসলে যা আছেই, আবার নেইও—তারই নাম ভূত। এই কথা ভেবে পাঠকেরা বইটি অবশ্য পড়বেন। যাঁরা এই বিষয়ে সন্দিহান—তাঁদের বলি 'ভূত নাবানো' লেখানি

পড়ে ভূতদের জিজ্ঞাসা করে সদুত্তর নিয়ে নিন। তবে যাঁরা বলেন ভূতের বই পড়ে আমরা একটুও ভয় পাই না—তাঁদেরকে বলি—সে তো আপনারা ভূত হয়ে গেছেন বলেই ভয় পান না। আমার গভীর বিশ্বাস (কোনও মানুষের মৃত্যুতে মন্ত্রীরা যেরকম গভীর শোক প্রকাশ করেন—সেই গভীরতা আমার নেই অবশ্য)—এই বই যাঁরা পড়বেন, তাঁদের যে ভূতে পেয়েছে—সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। তিনি হিন্দু হলে ভূত-প্রেত-পিশাচ, মুসলমান হলে মামদো এবং ক্রিশ্চান হলে স্পুক, স্পিরিট গবলিনদের সঙ্গে মিশে আছেন জানি। অন্য জাতির ভূতেদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, তবে তাঁরা আমার জ্ঞাতি নন।

ভূতেদের একটা সুবিধা হল তাঁরা মানুষদের ভালবাসে। গোভূতের কথা শুনেছি বটে, তাতে তাঁদের গো-জন্ম সার্থক হয়েছে কিনা আমি জানি না। কিন্তু মনুষ্য ভূতগণ ক্রমশ আধুনিক হয়ে উঠছেন—এমনকি টেলিফোন ব্যবহারেও অভ্যস্ত। কিন্তু দেশী-বিদেশী এমন কোনও ভূতের সন্ধান আমি গুগ্‌ল্ খুঁজেও পাইনি—যাঁরা ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন। আসলে, ভূতেরা কোনও কারণেই ইন্টার বা আউটার কোনও নেটেই, কোনও জালেই ধরা পড়তে চান না। ফেস বুকে যেতেও তাদের বুক দুরদুর করে, কারণ শ্রীface দেখাবার মতো কদর কি তাঁদের আছে? পাঠকবর্গ তবুও তাঁদের সন্ধান পেলে, জানাবেন—পরের সংস্করণে তাঁদের আনা যাবে।

কলকাতার ভূতেরা ইদানিং বড্ড নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন বলে আমি ভারতজোড়া তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজ দিয়েছি। এবং যাঁরা পাস্তাভূতের জ্যান্ত ছানাদের স্বচক্ষে দেখতে চান, তাঁদের নিয়ে কলকাতা জোড়া ভৌতিক গল্পরাজিদের কয়েকটি উপহার দিয়েছি। একে নৈবেদ্যর উপর বাতাসা ভাবতে পারেন, অথবা পাতের শেষে আইসক্রিম। ভূতের গল্প-কাহানি পড়ে যাঁদের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়—তাদের পাতে আইসক্রিম—তোফা জমবে। ছবিগুলো কেমন লাগছে?

বারিদবরণ ঘোষ

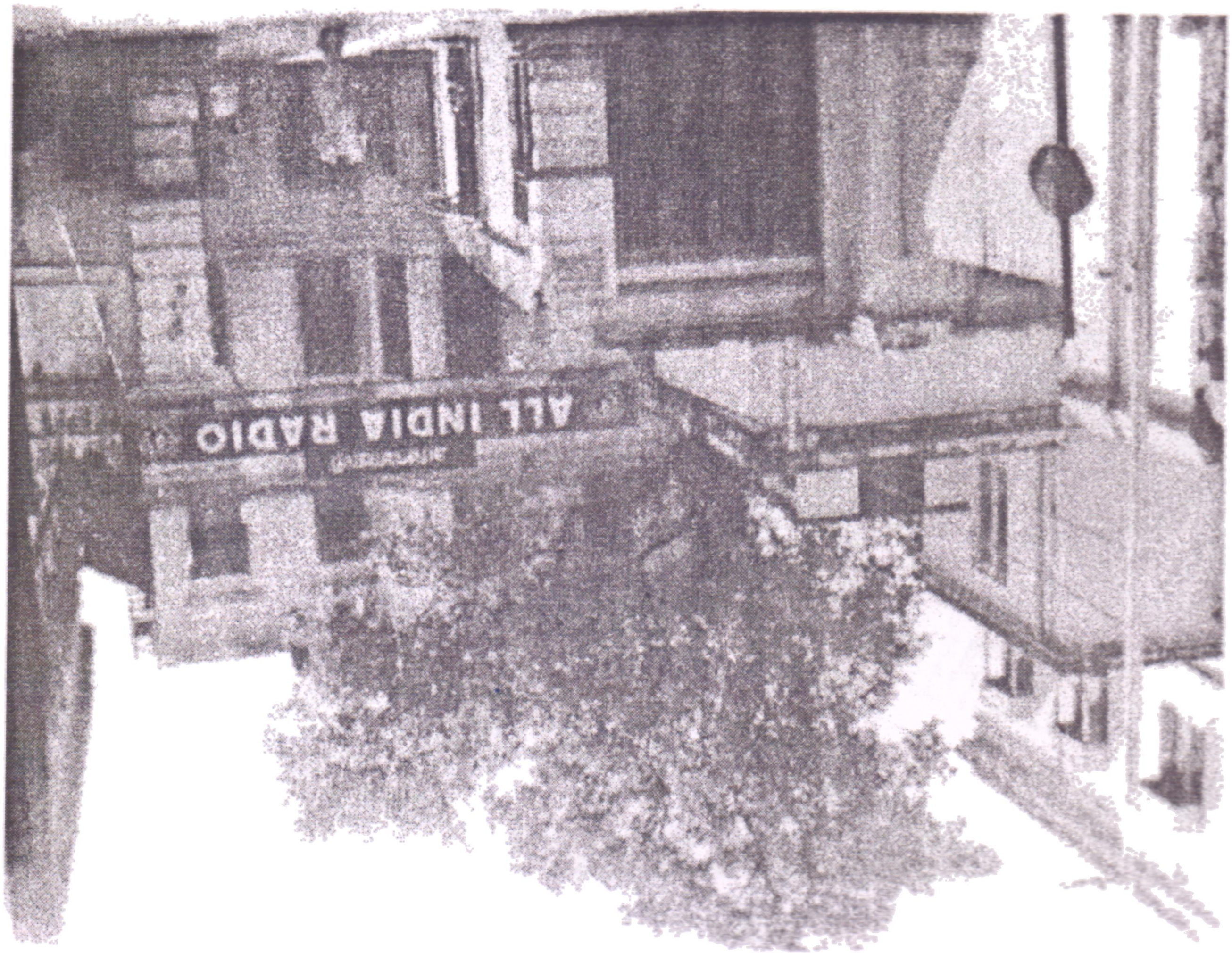
ALL INDIA RADIO

হাইকোর্টের সেই বিখ্যাত করিডর

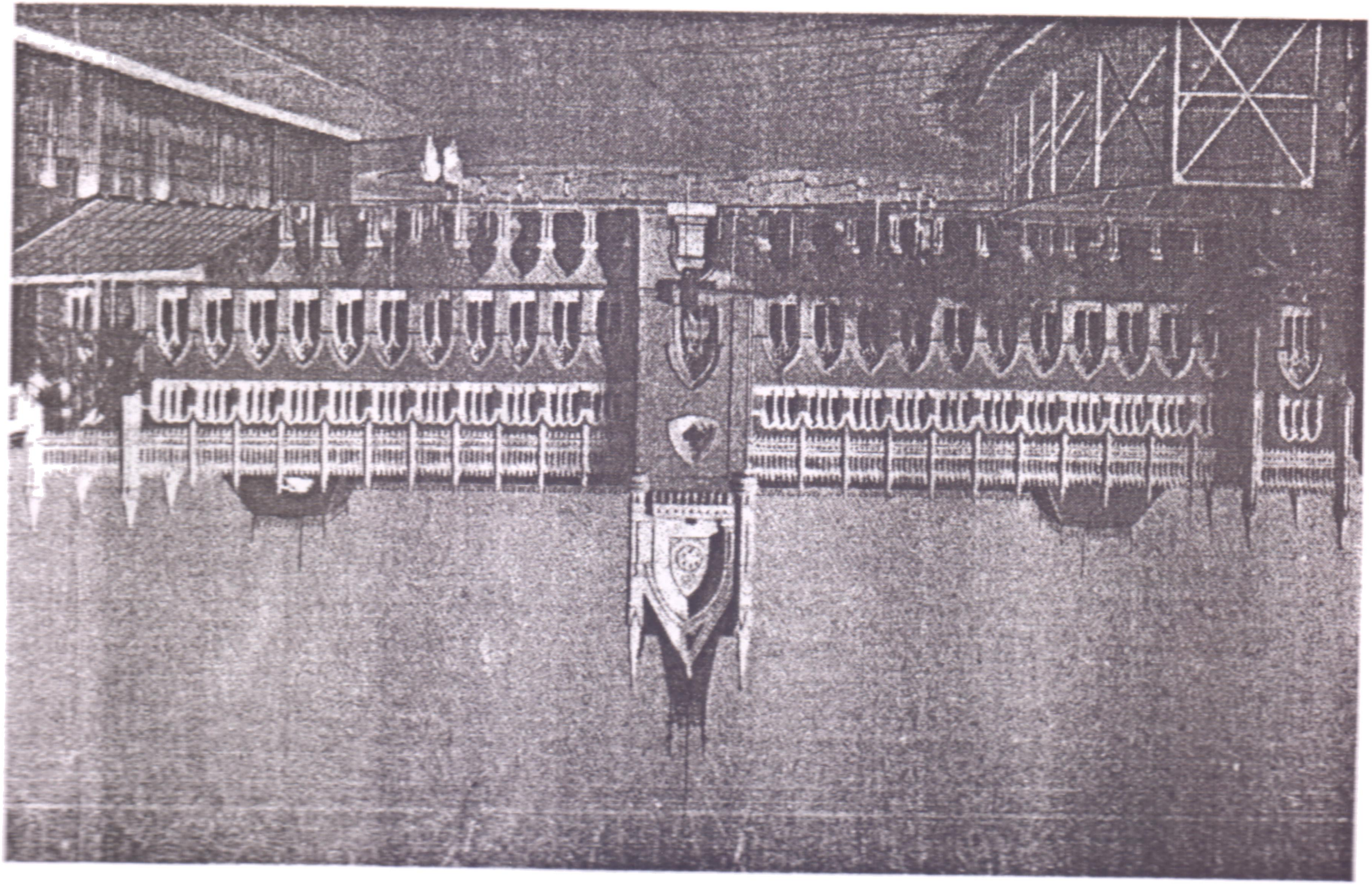

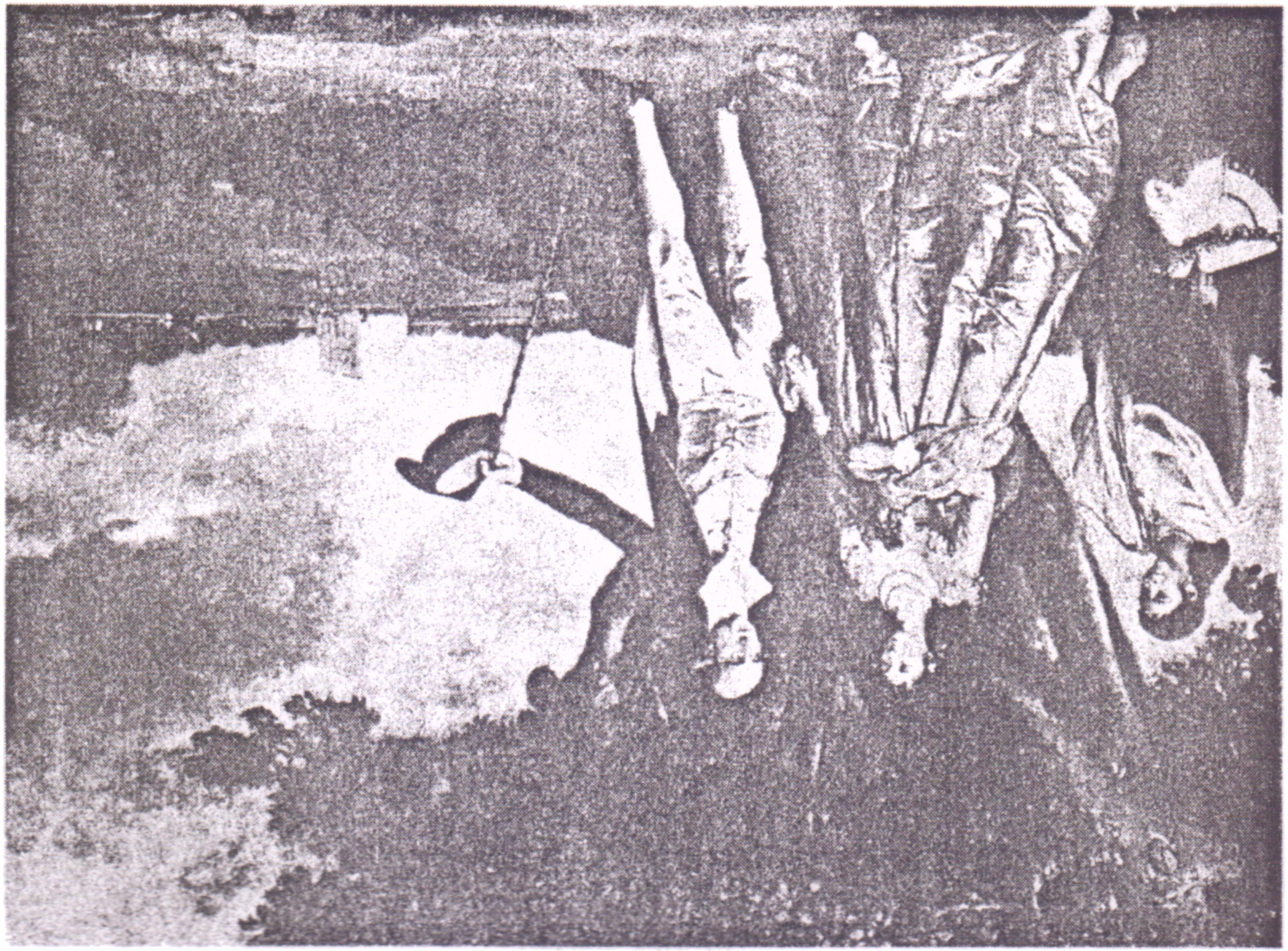

ওয়াশিংটন স্কোয়ার এবং তাঁর প্রতিমূর্তি

হেস্টিংস হাউস

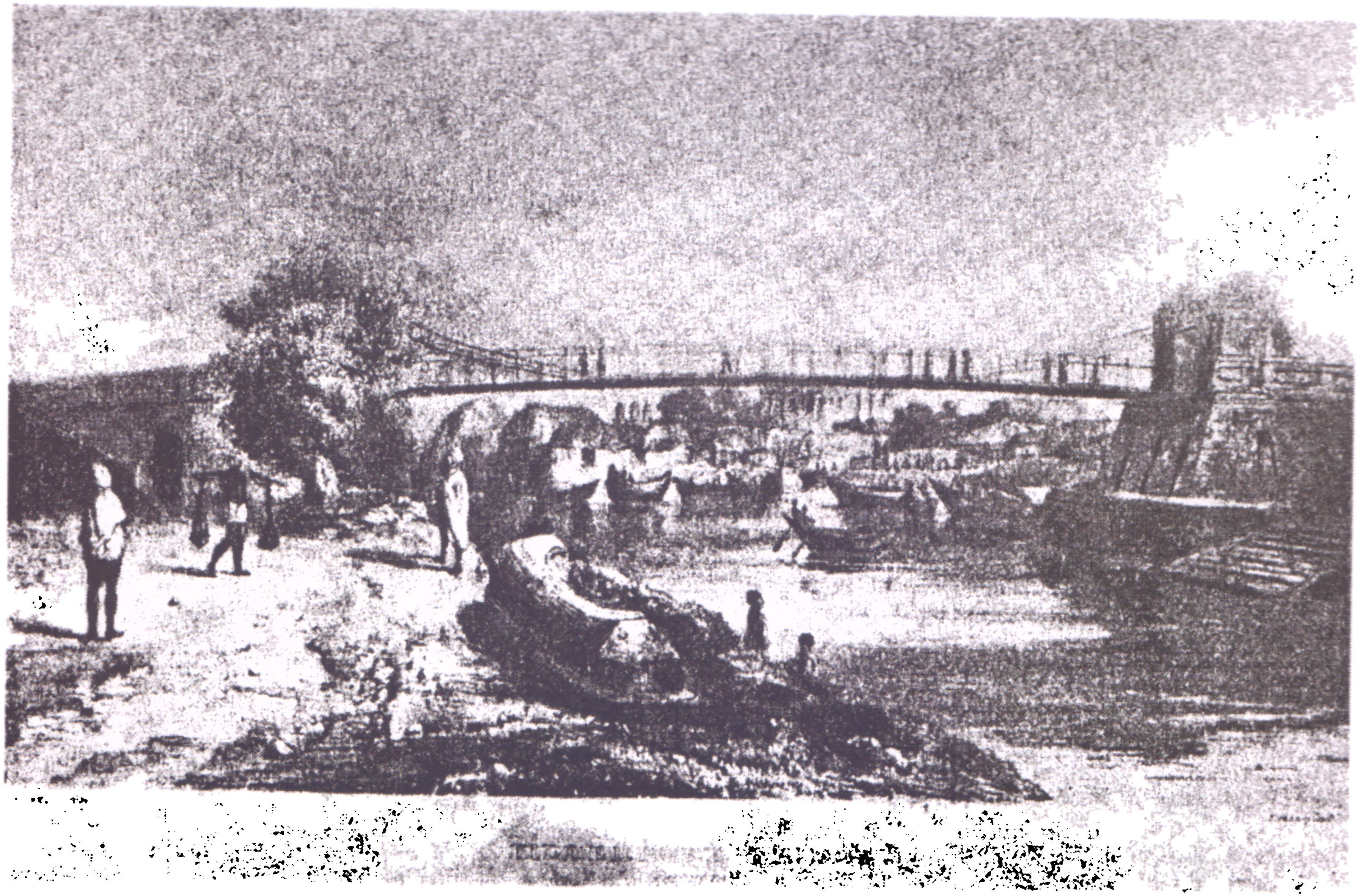

বিখ্যাত সেই আদি নালা

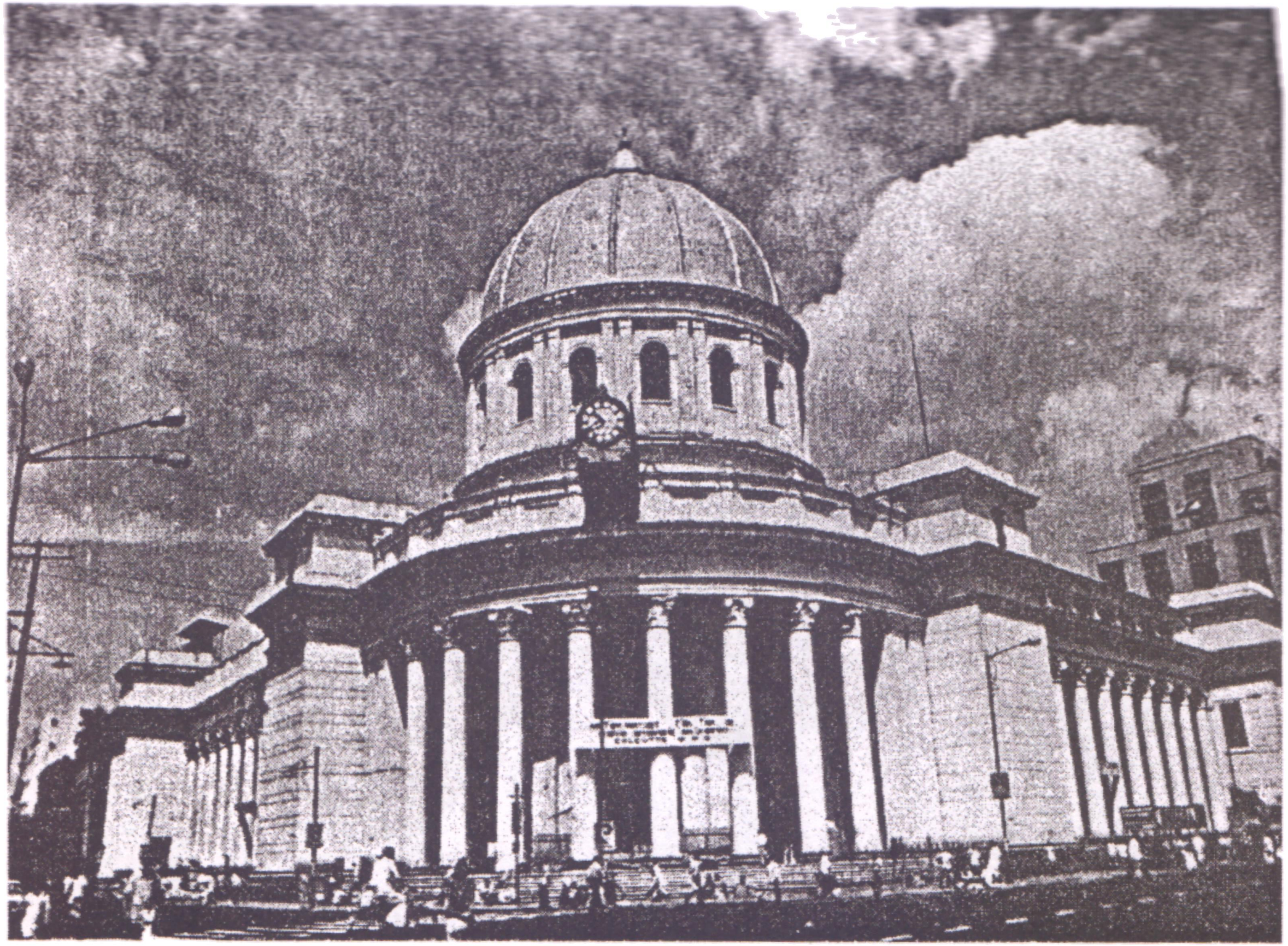

জি.পি.ও. (জেনারেল পোস্ট অফিস)

রাইটার্স বিল্ডিংস

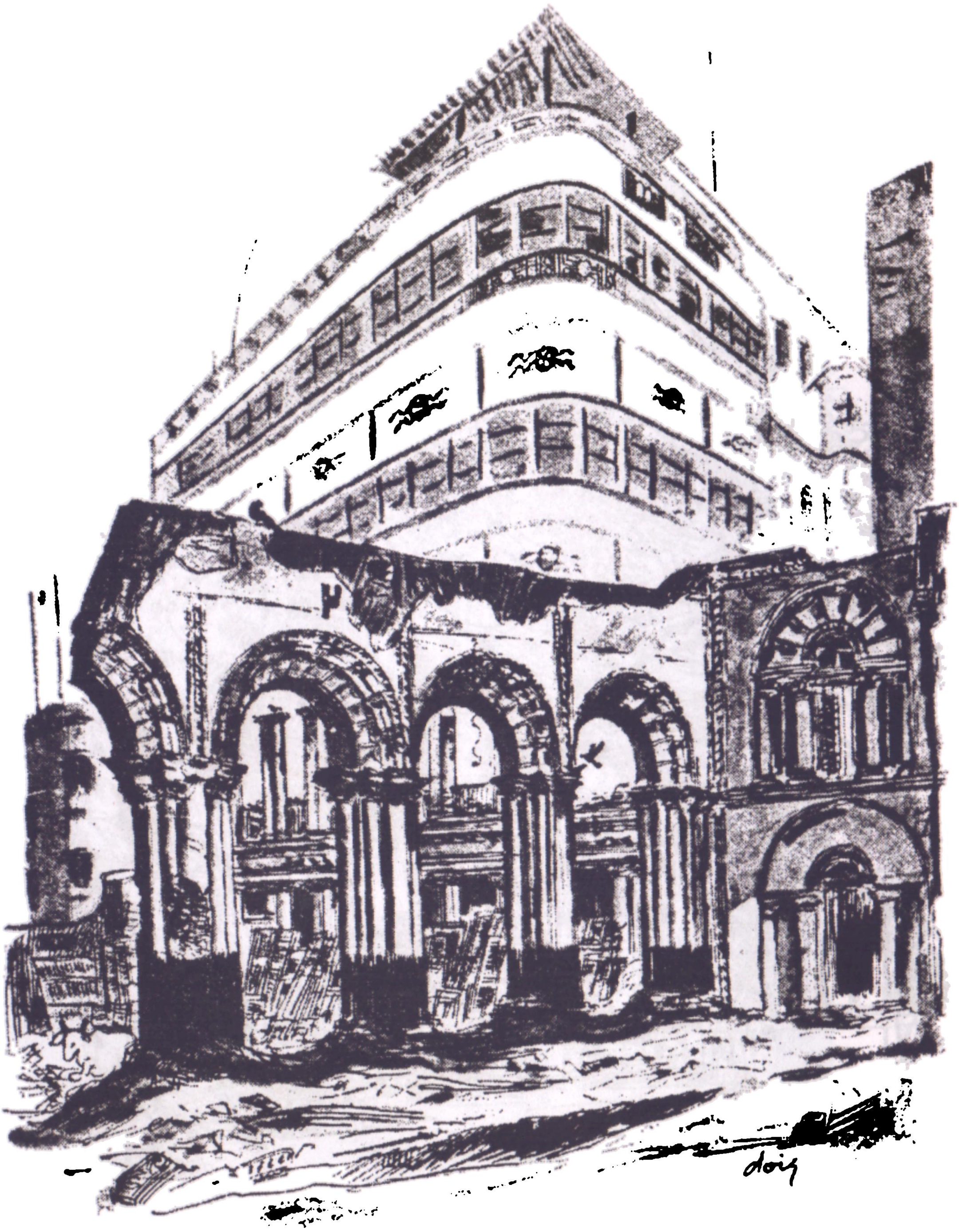

কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ি ঃ চিত্রীর দৃষ্টিতে

হেস্টিংস হাউস : চিত্রীর দৃষ্টিতে

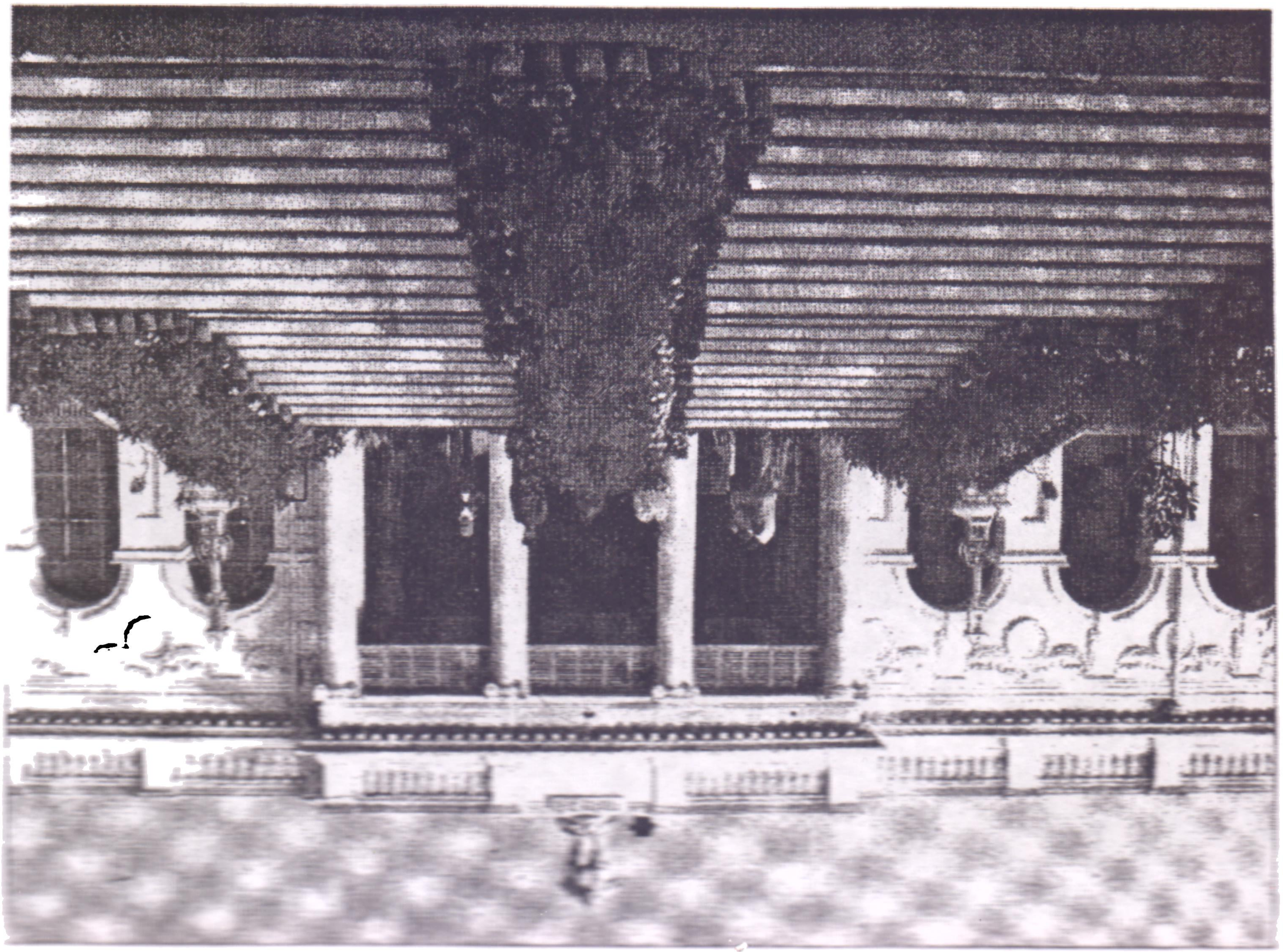

বেলেডাঙ্গার বাড়ির দক্ষিণের সামনের দিকের ছবি

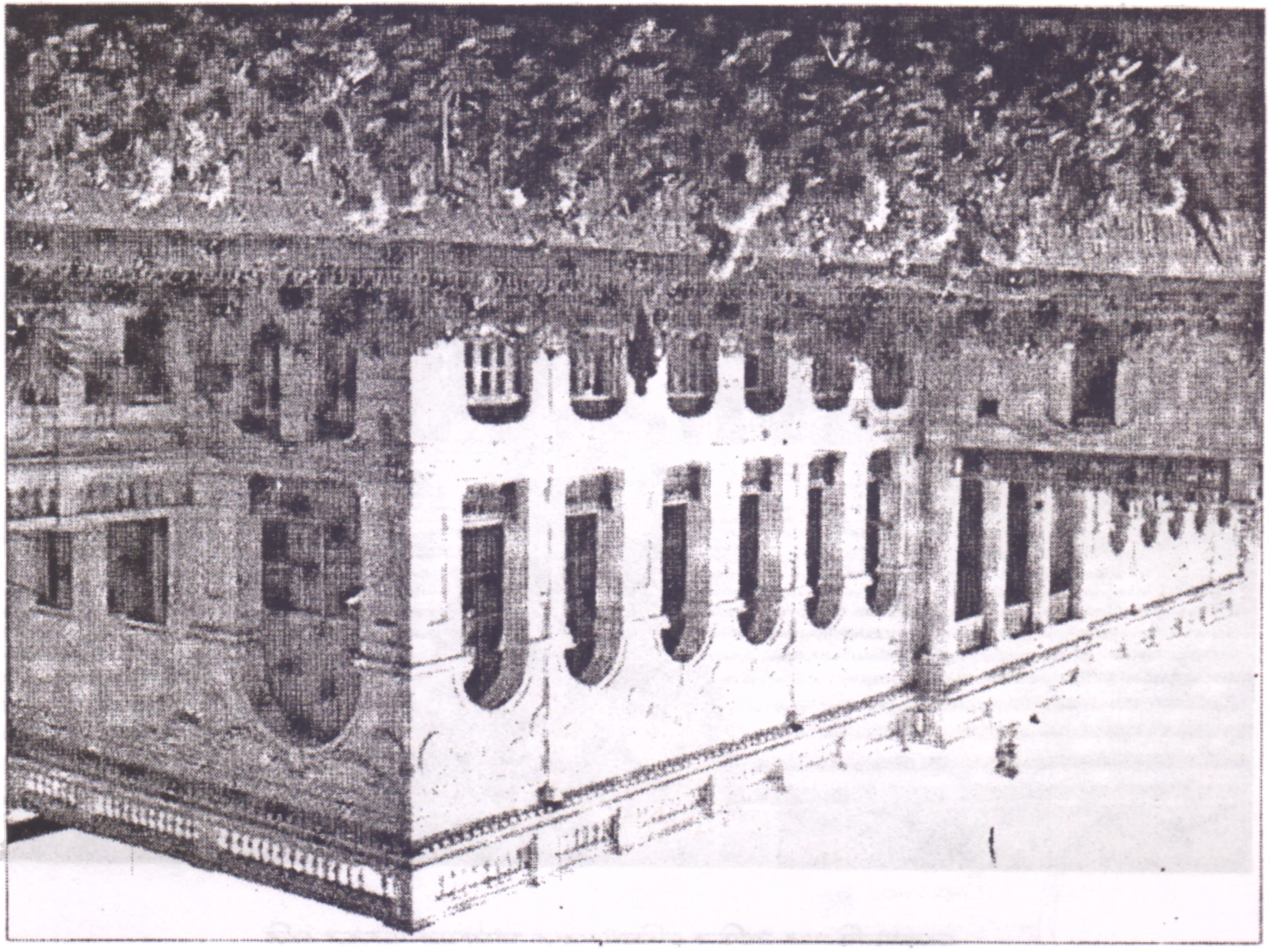

বেলভেডিয়ার রাড়ের দক্ষিণ দিকের দৃশ্য

এমনই ছিল ১৭৫৪ সালের ফোর্ট উইলিয়ামের ছবি

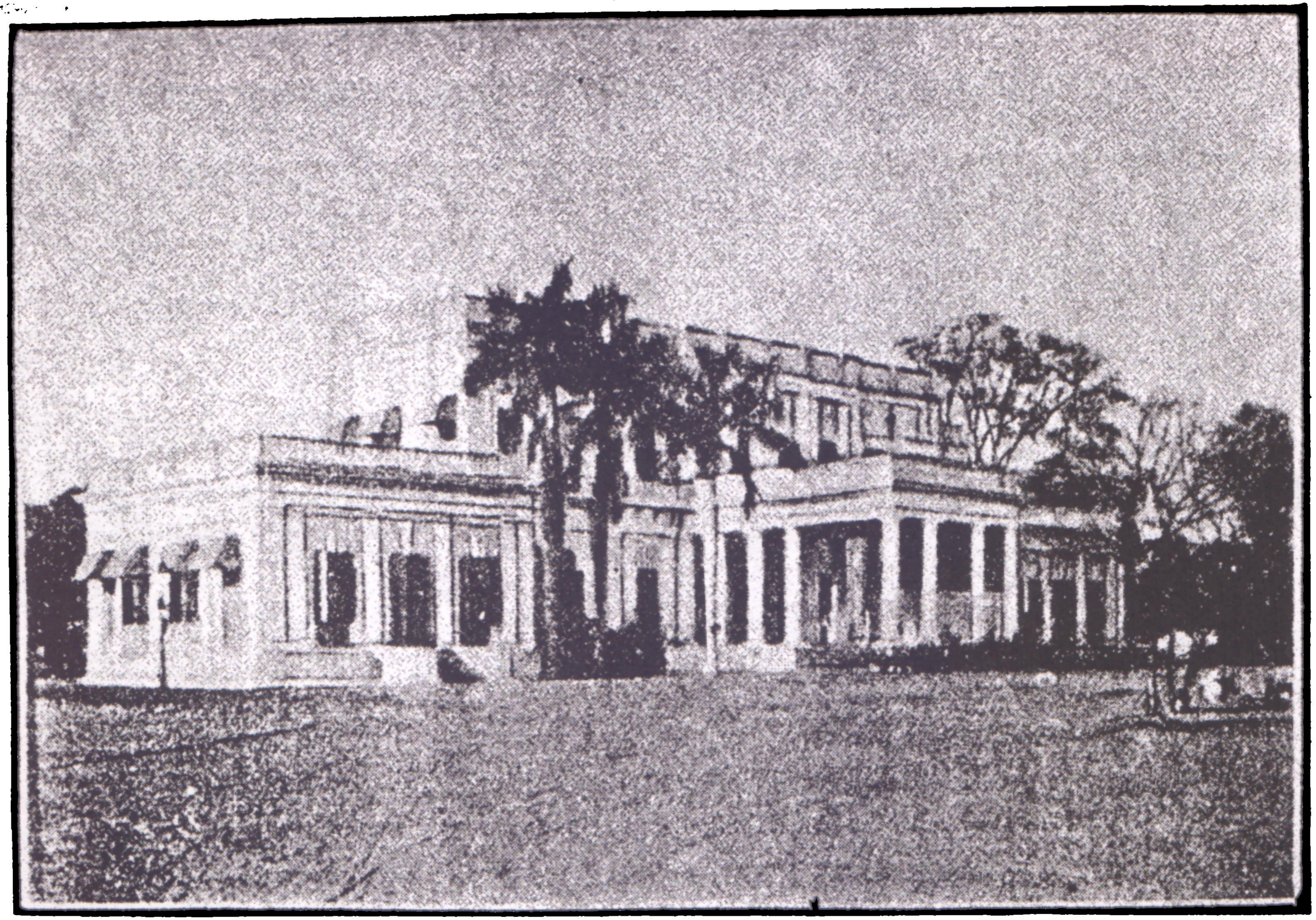

আলিপুরের সেই বিখ্যাত 'হেস্টিংস হাউস'

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল

খোদ কলকাতার ভুতুড়ে বাড়ি

হেস্টিংস হাউসের অশরীরী সাহেবেরা

আলিপুর ছিল কলকাতার একেবারে যেন সাহেবপাড়া—একসময়ে তাই ছিল। সাহেবরাও মৃত্যুর পর ভূত হয়ে যায়। তাদের ভূত হওয়াটাও সহজ, কারণ তাদের কবর দেওয়া হয়, পুড়িয়ে ছাই করা হয় না। ভূতমন্ত্রে জেগে উঠে তারা আবছা কায়া ধারণ করতে পারে সহজেই। এই আলিপুরেই একবার খোদ লাটসাহেবই ভূত হয়ে গিয়েছিলেন—স্পুক না গব্‌লিন—কোন্ জাতের তা আমি ঠিক বলতে পারবো না।

কথাটা বলতে গেলে আলিপুরের হেস্টিংস হাউসের কথা বলতে হয়। এটা এখন শিক্ষক- শিক্ষণ-কেন্দ্র হিসেবে খুব পরিচিত—বাসের কণ্ডাক্টার এখানে এলেই প্রবল চিৎকারে হেস্টিংস স্টপের নাম ধরে বাসযাত্রীকে সচেতন করে দেন। চিড়িয়াখানার সামনে যে হর্টিকালচার বাগান—সেই পুষ্পোদ্যানের ভিতর দিয়ে সোজা গেলে রেস কোর্সের উল্টোদিকের হেস্টিংসে সহজেই পৌঁছানো যায়।

ওয়ারেন হেস্টিংস-এর নাম জানেন না—এমন আধুনিক বাঙালি সম্ভবত কেউ নেই। হ্যাঁ, তিনিই বিখ্যাত হয়ে আছেন মহারাজা নন্দকুমার নামে এক বরিষ্ঠ বাঙালিকে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে। তাঁর বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডে যে মামলা হয়েছিল ইতিহাসে তা 'ইমপিচমেণ্ট অফ ওয়ারেন হেস্টিংস' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ভূতের চলাফেরা প্রসঙ্গে হেস্টিংস সম্পর্কে কিছু কথা বলেছে। এর কাছাকাছিই জজ কোর্টের পাশে হেস্টিংস হাউস। দেখতে দেখতে বাড়িটার বয়স হয়ে গেল বেশ। আর চৌদ্দ বছর কেটে গেলেই আড়াইশো বছর পূর্ণ করবে। ১৭৭৭ সালে বাড়িটা তৈরি হয়েছিল। কে বা কারা করেছিলেন জানি না, কিন্তু চারপাশটায় এখনকার মতো ভিড়-ভাড়াক্কা ছিল না। বরং চারপাশে জঙ্গল গজিয়ে উঠেছিল। বাড়িটাকে দেখে হেস্টিংসের খুব পছন্দ হয়ে গেছিল। বেলভেডিয়ার প্রাসাদের বিশালতার পরে এই ছোট বাড়িটাও তাঁর আয়ত্তে এল—বনজঙ্গল গুছিয়ে বাড়িটাকে নিজের পছন্দের উপযুক্ত করে সাজিয়ে তুললেন। এখানেই জমে উঠত বন্ধুদের নিয়ে তাঁর আড্ডার আসর। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি—স্যার ইলাইজা ইম্পে—তাঁর একদা সহপাঠী—এখন এক গেলাসের বন্ধু। নইলে হেস্টিংস কি নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশটা আদায় করে নিতে পারতেন। আসতেন ফিলিপ ফ্রান্সিসের খাস সচিব এবং অবশ্যই প্রিয়তামা স্ত্রীর সহোদর শালাবাবু ম্যাক্রাবি। সেনা বিভাগের অধিনায়ক কর্নেল মনসনদের মতো মানুষদের জন্যে এ বাড়ির দরজা সর্বদা উন্মুক্ত থাকত। একটা আরণ্যক পরিবেশ গড়ে তোলা এই অতিথি শালাটি হেস্টিংসের গৌরব এবং গর্ব—দুইই বাড়িয়ে

দিয়েছিল। এজন্যে তিনি এখানেই বসবাস করতে শুরু করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তার নববিবাহিতা স্ত্রী ম্যারিয়ান ইমফেকে নিয়ে এলেন এই বাড়িতেই—যেটি হেস্টিংস নামেই সুপরিচিত। ১৭৮৪ সাল পর্যন্ত এ বাড়িতেই থেকে শ্রীমতী হেস্টিংস দেশে ফিরে যান। আর তারপরের বছরই সব পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যান নিজের দেশে স্বয়ং লাটসাহেবই।

হেনরি কটন তাঁর Calcutta : Old and New বইতে স্পষ্ট করে লিখে গেছেন— 'Tradition connects this house with a famous ghost.' এই বিখ্যাত ভূতটির আসল মালিক কে ছিলেন তা জানতে হলে আমাদের শ্রীমতী ম্যারিয়ান সম্পর্কে আরও একটু জানতে হবে। বড়লাট হেস্টিংস তাঁর সব চালচলনই বড়লাটের মতো। মহিলা সম্পর্কেও তাঁর লালসা ছিল বড় রকমের। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ভূত বিষয়ে আমরা নারীদেহের প্রতি তাঁর আকর্ষণের কথা বলেছি।

হেস্টিংস দেশে ফিরে গেলেন। সঙ্গে জাহাজ ভর্তি মালপত্র। বেশ কিছুদিন পরে জিনিসপত্রের খোঁজ করতে গিয়ে তিনি তাঁর অতি প্রিয় এবং গোপনীয় সেই কালো বাক্সটার কোনও হদিশ পেলেন না। অথচ তাতেই আছে গোটা কতক গোপন ছবি আর বেশ কিছু গোপনীয় কাগজপত্তর। সর্বনাশ, সেটা যদি কারও হাতে পড়ে! তাই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি টমসন সাহেবকে জরুরি চিঠি পাঠিয়ে বাক্সটার খোঁজ করতে বললেন। প্রায় বছর দুয়েক কেটে গেছে কালো বাক্সের মালিক ইংল্যাণ্ড ফিরে গেছেন। এর মধ্যে মালিকের অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে সেই বাক্সটাও সম্ভবত নিলামে উঠেছিল, টমসন কিছুতেই তার হদিশ করতে পারলেন না। তাই ক্যালকাটা গেজেটে বাক্সটার খোঁজখবর চেয়ে একটা বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থা করলেন তিনি। সেইমত ৬ সেপ্টেম্বর ১৭৮৭ তারিখে একটা বড় বিজ্ঞাপন বের হল বাক্সটির খুঁটিনাটি প্রকাশ করে। কিন্তু তার খোঁজ পাওয়া গেল না।

বিলেতে ফিরে যাবার আগে হেস্টিংস বাড়িটার মালিকানা বদল করে গেছিলেন, আর ভারতে ফিরে আসার পরিকল্পনা তিনি মাথাতেই আনেননি। ম্যারিয়ান তো আগেই চলে এসেছেন। তাঁর একটা পিছনের ইতিহাস ছিল। তিনি ওয়ারেনকে বিয়ে করার আগেই বিবাহিত ছিলেন—প্রথম স্বামী ছিলেন ব্যারন ইমহফ। সুন্দরী ম্যারিয়ানকে দেখে ওয়ারেন লোভ সামলাতে পারেননি। নানান জাল বিস্তার করে তিনি ব্যারনের স্ত্রীকে ফুসলিয়ে এনে বিয়ে করে বসেন। কিন্তু তার আগেই ম্যারিয়ান মা হয়েছিলেন—জন্ম দিয়েছিলেন জুলিয়াস ইমহফকে। স্ত্রীর এই প্রথম পক্ষের পুত্রটিকেই ওয়ারেন হেস্টিংস হাউসটি দান করে যান। এর দখল নিতে অবশ্য জুলিয়াসের বেশ দেরি হয়েছিল। কে জানে, বৈপিতার এমন বদান্যতা তিনি গ্রহণে মানসিকভাবে প্রস্তুত হন কিনা।

যাইহোক জুলিয়াস ভারতে এলেন ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে এবং এসে ওঠেন এই

বাড়িতেই। এগারো বছর এখানে বাস করার পর ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যু হয়। এই জুলিয়াসের ছেলে—উইলিয়াম, চার্লস এবং জন। এঁরাও এই বাড়িতে থেকেই মারা যান এবং প্রত্যেককেই এই হেস্টিংস হাউসের ভিতরের মাঠে এক জায়গাতেই সমাধিস্থ করা হয়। জুলিয়াসের এই তিনটি ছেলের মৃত্যুকে জড়িয়ে ছিল কোনও একটা জটিল রহস্য। সেই রহস্যই এখানে জন্ম দিয়েছিল একটা প্রেতাত্মার।

এত কাণ্ড যখন হয়ে চলেছে, তখনও বেঁচে আছেন ম্যারিয়ানের প্রথম স্বামী ব্যারন। তাঁর স্ত্রী বেহাত হয়ে গেলেও ভারত ছেড়ে চলে যাননি। হয়তো ভিতরে ভিতরে তাঁর পুরুষত্বের এই অপমানের বদলা নেবার জন্যে তিনি তৈরি হচ্ছিলেন। তাঁর কথা কেউ আর মনে রাখেননি। তাঁর কি এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছিল? তাঁর অতৃপ্ত আত্মা কি তখনও খোঁজ করে চলেছে স্ত্রী-পুত্রদের স্মৃতিকে? নাহলে নিশুতি রাতে ঐ ঘন বাগানের মধ্যে সমাধিস্থলে হাতে একটা আলোর মতো কিছু নিয়ে ওই কবরগুলোর পাশে কে ঘুরে বেড়ায়? ব্যারনই কি, অথবা তাঁর আত্মাই কি পুত্র আর পৌত্রদের কবরখানা থেকে তাঁর আত্মীয়তার সূত্র আবিষ্কার করতে চাইছিলেন?

এখানে মেয়েদের শিক্ষা-শিক্ষণ কলেজ ছাড়া, বিহারীলাল কলেজ অফ হোম সায়েন্সও এখানেই অবস্থিত। হেস্টিংস হাউসে মেয়েদের থাকার জন্যে একটি লেডিজ হস্টেলও আছে। সেখানের এক পাচক ছিলেন অর্জুন দাস। তাঁকে জিগ্যেস করে এই বাড়ির সেই বিখ্যাত ভূত সম্পর্কে কিছু জানতে চাওয়া হয়েছিল। অর্জুন চালাকি করেননি। বলেছিলেন, নিজের চোখে তিনি কোনদিন ভূত দেখেননি। তবে মাঝরাত্তিরে ঘোড়ার গাড়ির আওয়াজ পেয়েছেন— ভিতরের গোল রাস্তা ধরে চলে যাবার আওয়াজ। যাঁরা ভূত 'দেখেছেন'—তাঁরা বলে গেছেন বিভিন্ন জনের কাছে যে হেস্টিংস হাউসের ভিতরে তাঁরা একটা সাহেব ভূতকে দেখেছেন অফিসের দেরাজ, আলমারি সব হাট করে খুলে ঘুরছেন—ঘরের এক কোণ থেকে অন্য কোণে। কী খুঁজছিলেন তিনি—সেই কালো বাক্সটা, যেটার ভিতরে আছে সেই দুটো রহস্যময় ছবি আর গোপন কিছু নথিপত্র? কেউ কেউ আবার একজন নয়, দু'জন অর্ধপাগল সাহেব দেখেছেন—ঘরের ভিতরে এবং বাগানের মধ্যে। এক সাহেব ধীরে সুস্থে ফাইল খুঁজছেন—অন্যজন হয়তো হারিয়ে যাওয়া জীবনটাকে! কে জানে ঘরের মধ্যে পিয়ানোটায় কেউ বুঝি অসামান্য কোনও সুর তুলতে চাইছেন। পাশের আলিপুর জেলের কারাবন্দিরাও সাক্ষ্য দিয়েছেন কেউ কেউ— রাতের গভীরে এই বাড়িটা থেকে পিয়ানোর সুরের মূর্ছনা ভেসে আসছে।

তবে কি অর্জুনের কথাই সত্যি—'এখন তাঁরা আর আসেন না, এখন লোক বেড়ে গিয়েছে তো?' সত্যিই তো ভূতেদের মতো নির্জনতাপ্রিয় আর কোনও সত্তা কি আছে? এমন অনিসন্ধিৎসু আর পিছনকে এমন করে ভালবাসা?

দিয়েছিল। এজন্যে তিনি এখানেই বসবাস করতে শুরু করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তার নববিবাহিতা স্ত্রী ম্যারিয়ান ইমফেকে নিয়ে এলেন এই বাড়িতেই—যেটি হেস্টিংস নামেই সুপরিচিত। ১৭৮৪ সাল পর্যন্ত এ বাড়িতেই থেকে শ্রীমতী হেস্টিংস দেশে ফিরে যান। আর তারপরের বছরই সব পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যান নিজের দেশে স্বয়ং লাটসাহেবই।

হেনরি কটন তাঁর Calcutta : Old and New বইতে স্পষ্ট করে লিখে গেছেন— 'Tradition connects this house with a famous ghost.' এই বিখ্যাত ভূতটির আসল মালিক কে ছিলেন তা জানতে হলে আমাদের শ্রীমতী ম্যারিয়ান সম্পর্কে আরও একটু জানতে হবে। বড়লাট হেস্টিংস তাঁর সব চালচলনই বড়লাটের মতো। মহিলা সম্পর্কেও তাঁর লালসা ছিল বড় রকমের। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ভূত বিষয়ে আমরা নারীদেহের প্রতি তাঁর আকর্ষণের কথা বলেছি।

হেস্টিংস দেশে ফিরে গেলেন। সঙ্গে জাহাজ ভর্তি মালপত্র। বেশ কিছুদিন পরে জিনিসপত্রের খোঁজ করতে গিয়ে তিনি তাঁর অতি প্রিয় এবং গোপনীয় সেই কালো বাক্সটার কোনও হদিশ পেলেন না। অথচ তাতেই আছে গোটা কতক গোপন ছবি আর বেশ কিছু গোপনীয় কাগজপত্তর। সর্বনাশ, সেটা যদি কারও হাতে পড়ে! তাই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি টমসন সাহেবকে জরুরি চিঠি পাঠিয়ে বাক্সটার খোঁজ করতে বললেন। প্রায় বছর দুয়েক কেটে গেছে কালো বাক্সের মালিক ইংল্যাণ্ড ফিরে গেছেন। এর মধ্যে মালিকের অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে সেই বাক্সটাও সম্ভবত নিলামে উঠেছিল, টমসন কিছুতেই তার হদিশ করতে পারলেন না। তাই ক্যালকাটা গেজেটে বাক্সটার খোঁজখবর চেয়ে একটা বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থা করলেন তিনি। সেইমত ৬ সেপ্টেম্বর ১৭৮৭ তারিখে একটা বড় বিজ্ঞাপন বের হল বাক্সটির খুঁটিনাটি প্রকাশ করে। কিন্তু তার খোঁজ পাওয়া গেল না।

বিলেতে ফিরে যাবার আগে হেস্টিংস বাড়িটার মালিকানা বদল করে গেছিলেন, আর ভারতে ফিরে আসার পরিকল্পনা তিনি মাথাতেই আনেননি। ম্যারিয়ান তো আগেই চলে এসেছেন। তাঁর একটা পিছনের ইতিহাস ছিল। তিনি ওয়ারেনকে বিয়ে করার আগেই বিবাহিত ছিলেন—প্রথম স্বামী ছিলেন ব্যারন ইমহফ। সুন্দরী ম্যারিয়ানকে দেখে ওয়ারেন লোভ সামলাতে পারেননি। নানান জাল বিস্তার করে তিনি ব্যারনের স্ত্রীকে ফুসলিয়ে এনে বিয়ে করে বসেন। কিন্তু তার আগেই ম্যারিয়ান মা হয়েছিলেন—জন্ম দিয়েছিলেন জুলিয়াস ইমহফকে। স্ত্রীর এই প্রথম পক্ষের পুত্রটিকেই ওয়ারেন হেস্টিংস হাউসটি দান করে যান। এর দখল নিতে অবশ্য জুলিয়াসের বেশ দেরি হয়েছিল। কে জানে, বৈপিতার এমন বদান্যতা তিনি গ্রহণে মানসিকভাবে প্রস্তুত হন কিনা।

যাইহোক জুলিয়াস ভারতে এলেন ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে এবং এসে ওঠেন এই

বাড়িতেই। এগারো বছর এখানে বাস করার পর ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যু হয়। এই জুলিয়াসের ছেলে—উইলিয়াম, চার্লস এবং জন। এঁরাও এই বাড়িতে থেকেই মারা যান এবং প্রত্যেককেই এই হেস্টিংস হাউসের ভিতরের মাঠে এক জায়গাতেই সমাধিস্থ করা হয়। জুলিয়াসের এই তিনটি ছেলের মৃত্যুকে জড়িয়ে ছিল কোনও একটা জটিল রহস্য। সেই রহস্যই এখানে জন্ম দিয়েছিল একটা প্রেতাত্মার।

এত কাণ্ড যখন হয়ে চলেছে, তখনও বেঁচে আছেন ম্যারিয়ানের প্রথম স্বামী ব্যারন। তাঁর স্ত্রী বেহাত হয়ে গেলেও ভারত ছেড়ে চলে যাননি। হয়তো ভিতরে ভিতরে তাঁর পুরুষত্বের এই অপমানের বদলা নেবার জন্যে তিনি তৈরি হচ্ছিলেন। তাঁর কথা কেউ আর মনে রাখেননি। তাঁর কি এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছিল? তাঁর অতৃপ্ত আত্মা কি তখনও খোঁজ করে চলেছে স্ত্রী-পুত্রদের স্মৃতিকে? নাহলে নিশুতি রাতে ঐ ঘন বাগানের মধ্যে সমাধিস্থলে হাতে একটা আলোর মতো কিছু নিয়ে ওই কবরগুলোর পাশে কে ঘুরে বেড়ায়? ব্যারনই কি, অথবা তাঁর আত্মাই কি পুত্র আর পৌত্রদের কবরখানা থেকে তাঁর আত্মীয়তার সূত্র আবিষ্কার করতে চাইছিলেন?

এখানে মেয়েদের শিক্ষা-শিক্ষণ কলেজ ছাড়া, বিহারীলাল কলেজ অফ হোম সায়েন্সও এখানেই অবস্থিত। হেস্টিংস হাউসে মেয়েদের থাকার জন্যে একটি লেডিজ হস্টেলও আছে। সেখানের এক পাচক ছিলেন অর্জুন দাস। তাঁকে জিগ্যেস করে এই বাড়ির সেই বিখ্যাত ভূত সম্পর্কে কিছু জানতে চাওয়া হয়েছিল। অর্জুন চালাকি করেননি। বলেছিলেন, নিজের চোখে তিনি কোনদিন ভূত দেখেননি। তবে মাঝরাত্তিরে ঘোড়ার গাড়ির আওয়াজ পেয়েছেন— ভিতরের গোল রাস্তা ধরে চলে যাবার আওয়াজ। যাঁরা ভূত 'দেখেছেন'—তাঁরা বলে গেছেন বিভিন্ন জনের কাছে যে হেস্টিংস হাউসের ভিতরে তাঁরা একটা সাহেব ভূতকে দেখেছেন অফিসের দেরাজ, আলমারি সব হাট করে খুলে ঘুরছেন—ঘরের এক কোণ থেকে অন্য কোণে। কী খুঁজছিলেন তিনি—সেই কালো বাক্সটা, যেটার ভিতরে আছে সেই দুটো রহস্যময় ছবি আর গোপন কিছু নথিপত্র? কেউ কেউ আবার একজন নয়, দু'জন অর্ধপাগল সাহেব দেখেছেন—ঘরের ভিতরে এবং বাগানের মধ্যে। এক সাহেব ধীরে সুস্থে ফাইল খুঁজছেন—অন্যজন হয়তো হারিয়ে যাওয়া জীবনটাকে! কে জানে ঘরের মধ্যে পিয়ানোটায় কেউ বুঝি অসামান্য কোনও সুর তুলতে চাইছেন। পাশের আলিপুর জেলের কারাবন্দিরাও সাক্ষ্য দিয়েছেন কেউ কেউ— রাতের গভীরে এই বাড়িটা থেকে পিয়ানোর সুরের মূর্ছনা ভেসে আসছে।

তবে কি অর্জুনের কথাই সত্যি—'এখন তাঁরা আর আসেন না, এখন লোক বেড়ে গিয়েছে তো?' সত্যিই তো ভূতেদের মতো নির্জনতাপ্রিয় আর কোনও সত্তা কি আছে? এমন অনিসন্ধিৎসু আর পিছনকে এমন করে ভালবাসা?

ভূতের পিয়ানো বাজানোর রহস্য

একসময়ে আলিপুরের প্রেসিডেন্সি জেলের বেশ কিছু কয়েদি দল বেঁধে জেল সুপারের কাছে খুব হৈচৈ বাধিয়ে বসেছিলেন। না, না—কোনও খারাপ খাবারের নালিশ নয়, কোনও ওয়ার্ডারের খারাপ ব্যবহারের বিরুদ্ধে নালিশও নয়—একদম একটা আলাদা ব্যাপার নিয়ে তাঁরা জেল-সুপারের কাছে দরবার জানিয়ে বসলেন। সব কথা শুনে জেল-সুপার যে কী করবেন ভেবে ঠিক করতে পারলেন না। ধর্মভীরু মানুষ—তাঁদের কথা একেবারে হেসে উড়িয়ে দিতে পারলেন না। আবার ব্যাপারটার প্রতিকার করে দেবেন বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁদের হয়ে আবেদন করবেন—এমন কথাও বলতে পারলেন না। শুধু বললেন—তিনি নিজের চোখে দেখে তারপরে কয়েদিদের সঙ্গে কথা বলবেন। কিন্তু কয়েদিরা জানতে পারলেন যে ক'দিনের মধ্যেই সুপার নানা তদ্বির করে অন্য জেলে বদলি হয়ে চলে গেছেন। ওয়ার্ডাররা বলাবলি করেছিলেন—সাহেব একদিন গভীর রাতে আদিগঙ্গার তীরে কিছু একটা দেখতে পেয়েই বহু তদ্বির করে বদলির ব্যবস্থা করেছিলেন। কী দেখেছিলেন জেল সুপার? অলৌকিক কিছু কি তিনি শুনতে পেয়েছিলেন?

কীই-বা বলেছিলেন তাঁকে কয়েদিরা?

জেলখানার পাশেই একটা বড় মহলের বাড়ি। একসময় এই বাড়িতে থাকতেন উইলিয়াম মেকপিস থ্যাকারে সাহেব সপরিবারে। ১৯২৬ সাল নাগাদ তিনি চব্বিশ পরগণার জেলা সমাহর্তা বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পদে বহাল ছিলেন। তাঁর সামনেই বা ঠিক পরে পরে যে ব্যাপারটা ঘটে গেছিল—সেটাই ছিল কয়েদিদের প্রশ্নের উৎস। সেই কয়েদিরা ওই বন্ধ বাড়িটার কোনও এক ঘর থেকে মাঝরাতে শুনতে পেতেন পিয়ানোর টুংটাং-এর ছন্দিত বিষণ্ণ সুরের প্রবাহ। শুনতে শুনতে তাঁদের সঙ্গে জেলের নাইট গার্ডেরাও যেন সম্বিৎ হারিয়ে ফেলতেন। আর একজন অন্যজনের মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে থাকতেন অপলক নেত্রে।

এই সুরের রহস্যটাই শ্রোতাদের মনে একটা মূর্তির জন্ম দিল। একটি সুন্দরী রহস্যময়ী আদিগঙ্গার তীরে গান গেয়ে ঘুরে বেড়াতেন। ইনিই হয়তো পিয়ানোর অশরীরী সুরের তরঙ্গহিল্লোল তুলে থাকেন। অন্য কেউ কেউ বলেন ঠ্যাঙাড়েদের হাতে ঠ্যাঙানি খেয়ে যারা মরতেন তাঁদের এই আদিগঙ্গায় ফেলে দিত ঠ্যাঙাড়েরা। তাদের মধ্যে হয়তো কোনো নারী ছিলেন—তাঁরই প্রেতাত্মা গঙ্গার পাড়কে দীর্ঘশ্বাসে ভারি করে তোলে।

দেখতে দেখতে আলিপুর জেলের পাঁচিল পার হয়ে এই প্রেতাত্মার বিচরণ আর পিয়ানো বাদনের সংবাদ দূর-দূরান্তরে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। বিশ্বের সংবাদপত্রমহল চঞ্চল হয়ে উঠল। সাংবাদিকেরা রাতের অন্ধকার চিরে হাজির হলেন। তাঁদেরই একটি দলে ছিলেন এক গল্পলেখক, বরং বলা ভাল ভূতের গল্পের জাশুসি রচয়িতা। গল্পের রসদ সংগ্রহ করার জন্যে তাঁরা কালেক্টার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, তাছাড়া কাগজে ছাপার আগে একটা সরকারি অনুমতি নেওয়ারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু অনুমতি মিলল না। কিন্তু তাঁদের ধৈর্যের অভাব ছিল না। শেষ পর্যন্ত অনুমতি দিলেন তিনি। এদিক সেদিক নানা কথা বলার সুযোগ নিলেন সাংবাদিকমহল। এরপর ভূত-গল্পকার মহোদয় পিয়ানো বাজানোর প্রসঙ্গ তুলতেই থ্যাকারে সাহেব এক্কেবারে গম্ভীর। তারপরে ভাবলেন—ব্যাপারটা বহুদিন ধরেই লোকজনদের কাছে তিনি এড়িয়ে যাচ্ছেন, আর বোধহয় এড়িয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না। তাই ধীরে ধীরে যেন স্বগতোক্তি করতে লাগলেন—ব্যাপারটা খুবই রহস্য-জনক-মিস্টিরিয়াস। আমিও ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছি না তো আপনাকে কী বলবো? আমি আমার এস.পি.-কে ব্যাপারটার আদ্যোপান্ত তদন্ত করতে বলেছিলাম। তিনি তাঁর সমস্ত পুলিস বাহিনীকে এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের কাজে লাগিয়েছিলেন। কিন্তু এত চেষ্টা করেও এর রহস্যভেদ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, অথচ পিয়ানো বেজে ওঠা তো সত্যি ব্যাপারই।

লেখক প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা এটা তো আপনার পক্ষে জানা খুব স্বাভাবিক যে, আপনার আত্মীয় এ বাড়িতে ছিলেন—যিনি ভাল পিয়ানো বাজাতেন এবং পিয়ানো বাজাতেই খুব ভালবাসতেন। হয়তো কোনও অস্বাভাবিক কারণে এই বাড়িতেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। এমনটা কী ঘটেছিল বলে আপনার জানা আছে?

এবারে থ্যাকারে সাহেব যেন সহসা বাচাল হয়ে উঠলেন। হাঁ হাঁ করে বলে উঠলেন—নো, নো, নেভার, নেভার! আমার চৌদ্দ পুরুষের কেউ কখনও পিয়ানো বাজায়নি। তবুও বাজনা বাজছে—কী আশ্চর্য ব্যাপার বলুন তো?

এবারে সাহসী হয়ে গ্রন্থকার জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি নিজে কি কখনও রাতের গভীরে পিয়ানো বাজানোর আওয়াজ শুনেছেন? অথবা এই বাংলোতে বাস করেন এমন কেউ এই বাজনা শুনেছেন? যদি কেউ শুনে থাকেন, তবে তাঁর সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা যদি করে দেন তো খুব উপকৃত হই।

—'বেয়ারা', বলে একজন বেয়ারাকে ডাকলেন মিঃ থ্যাকারে। সে এলেই তাঁকে বললেন মিসেস গ্র্যাডিংসকো বোলাও। ভিতরে ভিতরে আনন্দে গুরগুর করতে লাগলেন ভূত-কার!

একটু বাদে সকল প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে একজন মহিলা, মোটামুটি সুন্দরী বলা যায় তাঁকে তাঁর এই মধ্যবয়সেও, এসে প্রবেশ করে সৌজন্য প্রকাশ করলেন। তারপরে একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে প্রশ্নকর্তার উত্তর দিতে লাগলেন

শান্তভাবে। দু-একবার অবশ্য গলায় সামান্য উত্তেজনার রেশ শোনা গেল। এরপরে পিয়ানো-রহস্যের চাবিটা আস্তে আস্তে খুলতে লাগলেন। একমনে শুনছেন তিনি এবং তাঁর সহযোগী সাংবাদিকরা দ্রুত লিখন পদ্ধতিতে তা নোট করে যেতে লাগলেন। সব সাক্ষাৎকারটি শেষ হয়ে গেলে তাঁরা পড়ে শোনাতে লাগলেন মিসেস গ্ল্যাডিংসকে। তিনি শুনতে শুনতে দু-এক জায়গায় পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটাতে লাগলেন। সেই সাক্ষাৎকারের লিখিতরূপের সবশেষে তিনি তাঁর দস্তখতটি এঁকে দিলেন।

এই সাক্ষাৎকার থেকেই এ.এফ.এম. আব্দুল আলি লিখে বসলেন তাঁর বিখ্যাত প্রেত- বিষয়ক বই—Ghost Stories of Old Calcutta—প্রাচীন কলকাতার ভৌতিক কহানিয়া। সাক্ষাৎকার আর বই প্রকাশের মধ্যে দুটি দশক কেটে গেছিল। কিন্তু পিয়ানোর সেই সুরের রহস্য এতটুকু ম্লান হয়নি। সেটা ছিল ১৯২৬ সাল। উইলিয়াম মেকপিস থ্যাকারে এরপরে আর বেশিদিন কলকাতায় থাকেননি—চাকরির শেষে তিনি স্বদেশে ফিরে যান, একই সঙ্গে সেখানে চলে যান শ্রীমতী গ্ল্যাডিংসও। ফিরে যাওয়ার কিছুদিন পরেই একটা অদ্ভুত যোগাযোগে পিয়ানো বাজানোর রহস্য তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়—সেই বিদেহী আত্মার সঙ্গীতপ্রীতি, সুরের মূর্ছনা অশরীরী আত্মার পরিতৃপ্তি এবং এর পিছনে গভীর বেদনার ইতিকথা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। জানি না, তারই আকর্ষণে, না, কলকাতায় থেকে যাওয়া কন্যার টানে আরও প্রায় বিশ বছর পরে ১৯৪৫ সালে বৃদ্ধা শ্রীমতী গ্ল্যাডিংস কলকাতা এসেছিলেন। যে রহস্যের একটা আভাসমাত্র ১৯২৬ সালে তিনি আলিসাহেবকে জানিয়েছিলেন তার আদ্যোপান্ত তাঁকে না জানিয়ে তিনি স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। খোঁজ খবর নিয়ে তাঁর ঠিকানা জোগাড় করে তিনি আলিসাহেবকে ডেকে পাঠালেন। তারপরে টানা চার ঘণ্টার বৈঠকে পিয়ানোর রহস্যজাল ছিন্ন করে আলিসাহেবকে সব জানালেন। বলতে বলতে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার মাঝে মাঝেই তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছিল—তাঁর মুখের রেখা থেকে তা স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন আলিসাহেব। কখনও চশমার ফাঁক দিয়ে রুমাল ঢুকিয়ে সিক্ত আঁখি পল্লব তিনি মুছে নিচ্ছিলেন। দুটি সাক্ষাৎকারই আলিসাহেব পৃথকভাবে উল্লেখ করে গেছেন তাঁর বইতে— একটি ১৯২৬ সালে ও অন্যটি ১৯৪৫ সালে প্রদত্ত।

প্রথম সাক্ষাৎকারটিতে মিসেস গ্ল্যাডিংস যা বলেছিলেন তাঁর জবানিতেই আলিসাহেব তা ব্যক্ত করে গেছেন। কলকাতার প্রখ্যাত ভূতের কারবারি বন্ধুবর সুভাষ সমাজদার মশাই এই সাক্ষাৎকারের একটি চমৎকার মুক্ত অনুবাদ করে গেছিলেন লেখাটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে। আমরা সেই অনুবাদটির (এর প্রকাশকও ছিলেন আমাদের বর্তমান প্রকাশকই) হুবহু অনুলিপি দিচ্ছি মূলের সৌরভ পাঠকদের কাছে পরিবেশনার মানসে ঃ—

"আমি বছর তিনেক আগে গর্ভনেসের চাকরি নিয়ে মিঃ থ্যাকারের কাছে

এসেছি। তাঁর শিশুপুত্র রবার্ট থ্যাকারের লেখাপড়া এবং দেখাশোনার যাবতীয় দায়িত্ব আমার।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের এই বাংলোর 'সারাউণ্ডিংস'টা আমার খুব ভালো লাগে। চারদিকে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা বিশাল এই দোতলা বাড়িটার সামনে সবুজ ঘাসে ঢাকা লন। তার দু'পাশে সারি সারি আম আর লিচু গাছ। এই বাড়ির বাঁদিকের বাউণ্ডারি-ওয়ালের গা ঘেঁসে বয়ে চলেছে টালিনালা। জোয়ারের সময় জল যখন ফুলে-ফেঁপে ওঠে তখন কোয়ার্টারের গায়ে ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শোনা যায়। আর ডানদিকেই পাহাড়ের মত উঁচু জেলখানার বিশাল প্রাচীর। চারদিক খুব শান্ত আর নিরিবিলি। পাখির ডাক, আর বাতাসের শাঁ শাঁ শব্দে নিঝুম দুপুরটা কেমন স্বপ্নের মত মনে হয়।

দোতলায় আমরা চারটি মাত্র প্রাণী। আমি, মিঃ থ্যাকারে, মিসেস থ্যাকারে এবং তাঁদের চার বছরের ছেলে রবার্ট। আর গ্রাউণ্ড ফ্লোরে কুক, বাটলার, খিদমতগার, চাপরাশি, বরকন্দাজ, সব মিলিয়ে জনাদশেক লোক থাকে। কিন্তু নিচের বড় হলঘরের (সার্ভেন্টরা এখানে থাকে) পাশেই একটা ছোট কামরা সব সময়ই তালা দেওয়া থাকে। মিসেস থ্যাকারেকে জিজ্ঞাসা করেছি অমন সুন্দর দক্ষিণ খোলা এবং টালিনালা ফেসিং ঘর বন্ধ থাকে কেন? মিসেস থ্যাকারে জানিয়েছিলেন, ও ঘর নাকি প্রিডিসেসারদের নানা টুকিটাকি জিনিসে একেবারে ঠাসা হয়ে গোডাউনের মত পড়ে রয়েছে।

কিন্তু এই ঘরের প্রসঙ্গ উঠলেই মিসেস থ্যাকারের চোখে-মুখে কেন যেন অস্বস্তির ছায়া ফুটে উঠতো। আমার মনে হতো, তিনি কি যেন লুকোতে চাইছেন। তাই আমারও কিউরিওসিটি বেড়ে গেল। এখানে এই ঘরে কি থাকে, কোন কোন জিনিসের স্তূপ, কেন এই বাংলোর সবচেয়ে ভালো ঘরটি সর্বদা বন্ধ থাকে—এসব জানার আগ্রহে মনটা ছটফট করতো।

একদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। চাঁদের আলোয় চারদিক দিন-মানের মত ফুটফুট করছে। আমার ঘরের সামনে দোতলার খোলা বারান্দায় এলাম। বাগানের দু'পাশে দেবদারু-বীথি আর শিরীষ গাছের নীচে আলোছায়ার জাফরি কেটেছে। কৃষ্ণচূড়ার ঝিরিঝিরি পাতায় বাতাস আকুলি-বিকুলি করছে। চাঁদের আলো বুকে নিয়ে দুলছে টালিনালার জল। আমার মনে হলো, আমি যেন স্বপ্নের একটা রাজ্যের ভেতরে এসে পড়েছি। অপরূপ—সত্যিই খুব লাভ্‌লি!

এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিলেন মিসেস গ্ল্যাডিংস। তার সুডৌল মুখে বিষণ্ণতার ছায়া থমথম করতে লাগল। খুব আস্তে আস্তে বললেন, লাভ্‌লি সেই মুনলাইট চোখের পলকে হয়ে উঠেছিল টেরিব্‌লি ড্রেডফুল।

—কেন—কেন—কি হয়েছিল? রিপোর্টার এবং লেখক একসঙ্গে প্রশ্ন করল।

কোন কথাই বললেন না গ্ল্যাডিংস। শুধু হাসি মিলিয়ে গিয়ে কেমন শক্ত হয়ে

উঠল তাঁর মুখের পেশীগুলো। কিছুক্ষণ পর কখনো তীব্র উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে, কখনো থেমে প্রচণ্ড আবেগে বলে গিয়েছিলেন তাঁর সেই ভয়ঙ্কর দুঃস্মৃতি—

গ্ল্যাডিংস যখন চাঁদের আলোর স্বপ্নে বিভোর সুষুপ্ত পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন ঠিক তখুনি দূর—খুব দূর থেকে কার যেন চাপা কান্নার আওয়াজ তাঁর কানে এল। কে যেন বুকভাঙা শোকে গুমরে গুমরে কাঁদছে। হয়তো বেয়ারা চাপরাশিদের কারো দেশ থেকে চিঠিতে কোন দুঃসংবাদ এসেছে।

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে নেমে এলেন গ্ল্যাডিংস। কান্নার শব্দ এবার আরো স্পষ্ট, আরও জোরালো বলে মনে হলো! কই, না তো—বেয়ারা-বাটলাররা তো যে যার তক্তাপোশে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে রয়েছে।

কয়েক মুহূর্ত সেই আবছায়া অন্ধকার একতলাটায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মনে হলো, ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজটা আসছে সেই রুদ্ধ ঘর থেকে। সেই ঘরের 'কী-হোলে'র ভেতরে চোখ রাখতেই কেমন শিরশির করে উঠল তাঁর সারা শরীর। মনে হলো, তাঁর শিরদাঁড়া বেয়ে যেন হিমশীতল জলের একটা স্রোত বয়ে চলেছে হু-হু করে। ঘরের ভেতরে ছায়া-ছায়া অন্ধকারে টেবিলের মত কি একটা যেন জড়িয়ে ধরে আকুল হয়ে কাঁদছে এক রমণীর ছায়াদেহ!

কে—কে ওখানে? কে আপনি? চিৎকার করে এই কথাগুলো বলতে চাইলেন গ্ল্যাডিংস। কিন্তু পারলেন না। কে যেন সাঁড়াশি দিয়ে জোর করে তাঁর গলা চেপে ধরেছে। ভয়ে উত্তেজনায় তাঁর সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে। ধড়াস ধড়াস করছে বুকের ভেতরটা। তবুও—তবুও তিনি মরিয়া হয়ে চিঁ চিঁ করে বললেন—কে—আপনি কে?

সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেল সেই কান্নার শব্দ। গ্ল্যাডিংসের গলার আওয়াজ পেয়ে প্রধান খিদমতগার এবং কয়েকজন খানসামা জেগে উঠল। তারা আলো জ্বালিয়ে বাংলোর চারদিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল—কোথাও কিছু নেই। শুধু সেই বন্ধ ঘরটার ভেতরে চাপ চাপ জমাট অন্ধকার অচল আর অনড় হয়ে রয়েছে, যেমন থাকে।

থ্যাকারের আগে চার-পাঁচজন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে চাকরি করা প্রবীণ সেই খিদমতগার অচ্ছয়প্রসাদ বলল, মেমসাহেব ইয়ে কম্‌রে আচ্ছা নহী হ্যায়—হিঁয়া জিন-পরি—

—আপনি যে কেন মিডনাইটে এই পোড়ো ঘরটাতে এসেছিলেন মিসেস গ্ল্যাডিংস, ঝাঁঝিয়ে উঠলেন মিসেস থ্যাকারে। একটু থেমে আবার অস্ফুট স্বরে বললেন, আপনাকে কতবার বলেছি, মিস্টারের প্রত্যেক প্রিডিসেসারদের 'নোট' থাকে—এই ঘর যেন না খোলা হয়—এই রুমটার না কি একটা ট্র্যাজিড হিস্ট্রি আছে।

—এই রুমে কেউ সুইসাইড করেছিল?

—নো। সেটা কোন প্রিডিসেসারের নোটে লেখা নেই। স্ট্রেঞ্জ!

জবরদস্ত ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ থ্যাকারে কিছুই বললেন না। শুধু আরও বেশি গম্ভীর—আরও বেশি চিন্তিত হয়ে গেলেন। গোস্ট-মোস্ট কোনকালে তিনি বিশ্বাস করেন না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস—এসব ওই টেরিরিস্ট পার্টির গুণ্ডাগুলোর কাজ। কে জানে, তাঁর কোন মারাত্মক সর্বনাশ করার ফিকিরে তাঁর বাংলোর আশেপাশে ঘুরছে। অতএব—এস. পি.-কে বলে তাঁর রেসিডেন্সে আর্মড গার্ডের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দিলেন।

এই ঘটনার ঠিক তিন মাস পরে আবার চব্বিশ পরগণার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের রেসিডেন্সে ঘটে গেল আর এক অলৌকিক কাণ্ড।

সেদিন ছিল বর্ষার রাত। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল। আর থেকে থেকে মাথা পাগলা এক- একটা দমকা বাতাসের ঝড়ে বাগানের গাছ-গাছালি থেকে বড় বড় ফোঁটা বৃষ্টির মত জল ঝরে পড়ছিল। সেদিন কেন যেন অনেক রাত পর্যন্ত কিছুতেই ঘুম আসছিল না গ্ল্যাডিংসের। মাথা, কানের দুই পিঠ আগুনের মত তেতে উঠেছিল। জানলা খুলে দিতেই ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা তাঁর নাকে-মুখে আছড়ে পড়ল শীতল জলের স্রোতের মত। ধীর পায়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন জানলায়।

বাগানের তরল অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভিজে ভিজে গাছগুলোর পাতায় পাতায় ঝড়ো বাতাসের শব্দ বেজে চলেছে—ঝমর-ঝম্। সেই বাতাস আর বৃষ্টির একটানা শব্দকেও ছাপিয়ে হঠাৎ তাঁর কানে এল, পিয়ানোর দূরাগত একটি মৃদু করুণ সুর। গ্ল্যাডিংসের মনে হলো, বৃষ্টি- ঝরা গভীর রাত্রে বেদনাদীর্ণ সেই সঙ্গীতের সুরে যেন যুগযুগান্তরের বিরহীদের কান্না উত্তাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু—

আশ্চর্য! যে বাংলোয় পিয়ানো কেন, কোন বাদ্যযন্ত্রের চিহ্ন পর্যন্ত নেই, সেখানে কে বাজাতে পারে এই 'ইনস্ট্রুমেন্ট'? এসব কথা—এমন কি কয়েক মাস আগের সেই রমণীর রহস্যময় ছায়ামূর্তির কথাও গ্ল্যাডিংসের মনে হলো না। বরং পিয়ানোর সেই মধুর সুরের মূর্ছনায় কোন অনিশ্চিত ভয় কিম্বা গা-ছমছম-করা কোন অস্বস্তিকর অনুভূতির বদলে নিবিড় একটা প্রশান্তির ভেতরে বিলীন হয়ে গেল তাঁর মন।

তিনি সম্মোহিতের মত নিচে নেমে এলেন। তাঁর মনে হলো আওয়াজটা আসছে সেই অভিশপ্ত রুদ্ধ ঘর থেকেই। যেই তিনি নিঃশব্দ পায়ে সেই ঘরের দরজার কাছে এলেন অমনি পিয়ানোর সেই ছন্দোময় ঝঙ্কারের অনুরণন যেন ঘরের সীমানা ছাড়িয়ে অন্ধকার বাগানের দিকে অপসৃয়মান হয়ে যেতে লাগল। গ্ল্যাডিংসও নেমে গেলেন বাগানে। সেই বাজনার শব্দকে অনুসরণ করে তিনি ঘনসন্নিবদ্ধ সেই দেবদারুবীথি ছাড়িয়ে, শিরীষ আর বট-পাকুড়ের নীচ দিয়ে পামগাছগুলোর নিচে প্রেতপুরীর জমাট অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর পা দুটোর ওপরে যেন তাঁর কোন বশ নেই। তার সমস্ত সত্তার ভেতরে, তাঁর মগ্ন-চৈতন্যের ভেতরে

যেন ধ্বনিত হচ্ছে পিয়ানোর সেই রাগিণী। বিশৃঙ্খল হয়ে গিয়েছে তাঁর চেতনা। মাথার ভেতরে ফেটে পড়ছে রক্তের উচ্ছ্বাস। শুধু বিক্ষুব্ধ মনের ভেতরে আগুনের মত জ্বলছে একটা—একটা মাত্র বাসনা—মধুর মনমাতানো সেই সুরের শিল্পীকে দেখতে হবে—জানতে হবে, কে সে!

কিন্তু আশ্চর্য—খুবই আশ্চর্য! গ্ল্যাডিংস যত এগিয়ে চলেছেন, বাজনার সেই আওয়াজও তত দূরে সরে সরে যাচ্ছে। কাঁটা গাছের ঝোপে লেগে তাঁর স্কার্ট ছিঁড়ে তার খানিকটা অংশ মরা সাপের মত দুলছে। পা দুটোয় বিছুটি পাতা লেগে চিন্ চিন্ করে জ্বলে যাচ্ছে। কোনদিকেই তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। বাগানের একেবারে শেষ সীমানায় বনতুলসীর ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেই তারকাঁটার বেড়া ডিঙিয়ে তিনি জেলখানার প্রাচীরের সামনে এসে পড়লেন অমনি চারদিক কাঁপিয়ে নৈশপ্রহরীর আতঙ্কিত চিৎকার শোনা গেল—হু গোজ দেয়ার?

আর সার্চলাইটের আলো বন্দুকের গুলির মত আছড়ে পড়ল গ্ল্যাডিংসের গায়ে। নাইট-গার্ড অস্ফুট আর্তনাদ করে বলে উঠল, ক্যা তাজ্জব কী বাত—ম্যাজিস্টর সাহেবকো কোঠি কি মেমসাব—

এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিলেন মিসেস গ্ল্যাডিংস। হয়তো সেই দুর্যোগ রাত্রির ভয়ঙ্কর দুঃস্মৃতির পীড়নেই মাথা নিচু করে বসে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপরে যেন বহু—দূর থেকে ক্ষীণ অস্ফুট গলায় বললেন, নিশির ডাকে নয়। বেশ স্পষ্ট মনে আছে পিয়ানোর সেই আর্টিস্টকে দেখার জন্যেই আমি সেই রাত্রে জঙ্গল ভেঙে ছুটে গিয়েছিলাম।

—স্টপ ইট্—থ্যাকারে হুঙ্কার দিলেন। প্রায় ধমকের সুরেই মিসেস গ্ল্যাডিংসকে বললেন, আপনি এবার ভেতরে যান।

কেমন করুণ আর অসহায় চোখে লেখক আলিসাহেব এবং রিপোর্টারদের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে ভেতরে চলে গেলেন মিসেস গ্ল্যাডিংস। মনো হলো তাঁর আরও কিছু বক্তব্য ছিল।

—থিওসফিক্যাল সোসাইটির জার্নালে ওসব ট্র্যাশ ভূতপ্রেতের গালগপ্পো পড়ে পড়ে ভদ্রমহিলার মাথাটাই বিগড়ে গিয়েছে, কটু গলায় মন্তব্য করলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব।"

কিন্তু গালগল্প বা ট্রাশ বলে যতই উড়িয়ে দিক না কেন, মিসেস থ্যাকারের পীড়াপীড়িতেই হোক কিম্বা আর যে কোন কারণেই হোক কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বিলেতে ফিরে গিয়েছিলেন।

পরের সাক্ষাৎকার ১৯৪৫ সালে প্রদত্ত। তার বয়ানটি ছিল এই প্রকারের ঃ

"এই বিশ বছরে দুনিয়া অনেক বদলে গিয়েছে। পরিবর্তনই হোক না কেন, হাজার হাজার মাইলের ব্যবধানে দুটো নরনারীর মনের ভেতরে কিন্তু একটা নিদারুণ আক্ষেপে মাথা খুঁড়ছিল—চব্বিশ পরগণার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের

পিয়ানোর সেই মেলোডির মিস্ট্রিটা তখনও জানা যায়নি।

তাদের দুইজনের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি বা উইলফোর্সের জন্যেই কেমন করে অতি আলৌকিকভাবে মিসেস গ্র্যাডিংস জানতে পেরেছিলেন সেই বিদেহী আত্মার পূর্বজীবনের ইতিবৃত্ত আর 'গোস্ট স্টোরিজে'র লেখক আলিসাহেবকে সবিস্তারে জানিয়েছিলেন এখন তার উল্লেখ করা যাক।

রিং রিং - রিং—

কোন এক গ্রীষ্মের দুপুরে আলিসাহেবের পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে ফোন বেজে উঠল।

হ্যালো। ইয়েস আব্দুল আলি স্পিকিং—গুড আফটারনুন, কে? মিসে-স গ্ল্যা ডিং স। ইয়েস-ইয়েস—ও! সেই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ থ্যাকারের কন্ট্রাক্টে...

আরও কিছুক্ষণ কুশল প্রশ্ন বিনিময় এবং বিভিন্ন কথাবার্তার পরই রিসিভার রেখে দিয়েই বেরিয়ে পড়লেন আলিসাহেব।

আলিপুরে বেকার রোডে মিসেস গ্ল্যাডিংসের জামাইয়ের বাড়িতে এলেন আলিসাহেব। বেয়ারা দিয়ে খবর পাঠাতেই তখুনি এলেন মিসেস গ্ল্যাডিংস। মাথার চুল শাদাফুলের রঙ ধরেছে। প্রতিমার মত সেই সুডৌল মুখখানার রেখায় রেখায় বার্ধক্যের নির্ভুল চিহ্ন আঁকা। লণ্ডন এবং কলকাতার হালচাল, পারিবারিক খবর এবং নানা প্রসঙ্গে কিছু খুচরো খুচরো আলাপের পর হঠাৎ আলিসাহেবের খুব কাছে সরে এসে মিসেস গ্ল্যাডিংস বললেন, ডি.এম-এর বাংলোয় আর কখনো গিয়েছিলেন না কি?

না, ম্যাডাম—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের রেসিডেন্সে কি যখন তখন হুটহাট্ করে যাওয়া যায়?

আপনি কি সেই ফ্যান্টম পিয়ানো মিউজিকের স্টোরি লিখে ফেলেছেন?

না, কি করে লিখবো, মিস্ট্রিই তো জানতে পারিনি। একটু থেমে আলিসাহেব বললেন, ওই বাংলোয় কোন সময়ে কোন মিউজিসিয়ান ছিলেন কি না—

হাতের ইশারায় থেমে যেতে বললেন গ্ল্যাডিংস। কিন্তু কেমন যেন গম্ভীর আর কঠোর হয়ে উঠল তাঁর মুখখানা। একটা কথাও বললেন না। শুধু মাথাটা নীচু করে দু'হাত নেড়ে বুকে ক্রশের মুদ্রা এঁকে ফিসফিসিয়ে বললেন, আমেন! কয়েক মুহূর্ত কি ভেবে আবার বললেন, সবই তো লর্ড যীশুর ইচ্ছাতেই হচ্ছে!

কি হয়েছে?

আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে বলেই হয়তো একেবারে মির‍্যাকেলি পিয়ানোর সেই মেলোডির মিস্ট্রিটা জানতে পেরেছি।

বলেন কি! তাই না কি? কি ব্যাপার—কি সেই রহস্য?

কোন কথাই বললেন না গ্ল্যাডিংস। বিষণ্ণতার ছায়া থমথম করতে লাগল তাঁর

মুখে। আলিসাহেবের মনে হলো, বিশ বছর আগের দুর্যোগপূর্ণ রাত্রির সেই ভয়াবহ দুঃস্মৃতির ভেতরে মগ্ন হয়ে গিয়েছেন মিসেস গ্ল্যাডিংস। কেমন নিভু নিভু গলায় বললেন, জানেন আলিসাহেব, আমি যদি জানতাম সেই পিয়ানোর আড়ালে ওইরকম মর্মান্তিক একটা ট্র্যাজেডির হিস্ট্রি আছে তাহলে আমি কখনো সুরের শিল্পীকে দেখার জন্য সেই রাত্রে বৃষ্টি মাথায় করে জঙ্গল ভেঙে ছুটতাম না।

—পিয়ানোর কি ট্র্যাজেডি ম্যাডাম—কেমন করে জানলেন?

—সে অনেক কথা আলিসাহেব, চোখ দুটো জানলার বাইরে ছড়িয়ে দিয়ে যেন কোন দুঃস্বপ্নের ঘোরে বিড়বিড় করে বললেন গ্ল্যাডিংস সব—সব কিছুই কেমন আশ্চর্য মনে হয়!

আলিসাহেবের মনটা কৌতূহলে চিন্‌চিন্‌ করে জ্বলে যাচ্ছে। মিসেস গ্ল্যাডিংসের আত্মমগ্ন ভাবটাকে বিঘ্নিত করে কোন প্রশ্ন করবো না করবো না করেও বললেন, কী, খুব আশ্চর্য মনে হয় মিসেস গ্ল্যাডিংস?

—কি আবার—সেই বিশ বছর আগে যা দেখেছিলাম ডি. এম.-এর বাংলোতে আর বিলেতে যা শুনেছি সেই পিয়ানো সম্বন্ধে—

—আমার তো বেশ স্পষ্ট মনে আছে, আপনি প্রথমে একদিন চাঁদনি রাত্রে কার একটা কান্নার আওয়াজ শুনে নিচে নেমে এসে দেখেছিলেন, আলিসাহেব সূত্র ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন, সেই সব সময়ে বন্ধ থাকা ঘরটায় এক রমণীর ছায়ামূর্তি টেবিলের মত কি একটা জড়িয়ে—

—অ্যান্ড্রু ল্যাঙ্গের (Andrew Lang) লেখা 'ড্রিমস অ্যান্ড গোস্টস' (Dreams and 'Ghosts) বইটি পড়া আছে আলিসাহেব? হঠাৎ বাধা দিয়ে বললেন মিসেস গ্ল্যাডিংস।

আলিসাহেব মাথা ঝাঁকালেন।

—প্রেততত্ত্ববিদ্‌ ল্যাঙ্গসাহেব এই বইতে তাঁর একটা অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। কয়েক মুহূর্ত কি ভেবে গ্ল্যাডিংস বললেন, মিঃ ল্যাঙ্গের সেই এক্সপিরিয়েন্সের সঙ্গে আলিপুরের পিয়ানোর ট্র্যাজেডিরও একটা আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে।

—কি রকম? তীব্র আগ্রহে আব্দুল আলির চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে।

—১৮৭৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বরের ঘটনা, মিসেস গ্ল্যাডিংস বলতে শুরু করলেন, ভিয়েনার এক বেশ ওয়েল-টু-ডু সিটিজেন জন গফ্‌-এর স্ত্রী মেরী মারা গেলেন। মেরী ছিলেন অত্যন্ত বৈষয়িক। কন্ট্রাক্টার ডেকে বাড়ির প্ল্যান বুঝিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে রাজমিস্ত্রীদের কাজ দেখা, হাটবাজার করা, ঝি-চাকর খাটানো, সংসারের সব—সব কাজ নিজে হাতে করতেন তিনি। মিঃ গফ্‌ ছিলেন শেয়ার মার্কেটের দালাল। সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরতেন। সংসারের কোন দিকে চোখ তুলেও তাকাতেন না। —একটু থামলেন মিসেস গ্ল্যাডিংস। আবার বললেন, একেবারে নির্জলা সত্যি ঘটনা আলিসাহেব। সেই মেরী তাঁর মৃত্যুর

মাসছয়েক আগে একটা ডাইনিং টেবিল কিনেছিলেন। একসঙ্গে চারজন খেতে পারে এমন ডাইনিং টেবিল। ওপরে সানমাইকা দেওয়া। এই খাওয়ার টেবিল তিনি নিজ হাতে ঝাড়পোঁছ করতেন দু'বেলা। এতটুকু নোংরা লেগে থাকলে মেড-সারভেন্টকে বকাবকি করে বাড়ি মাথায় করতেন। এককথায় এই টেবিলটা ছিল মেরীর প্রাণের চেয়েও প্রিয়। মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত আগে মিঃ গফের হাত দুটো ধরে তিনি বলেও গিয়েছিলেন, ডাইনিং টেবিলটার যেন কোন অযত্ন না হয়।

মাস ছয়েক যেতে না যেতে মিঃ গফ্ আবার বিয়ে করলেন মার্গারেটকে। মেরীর একেবারে উল্টো স্বভাবের মেয়ে—দিনরাত সিনেমা, বায়োস্কোপ, থিয়েটার, পার্টি আর আউটিং নিয়ে মেতে থাকতো মার্গারেট। ঝি-চাকর কুক যা করতো, যেমন করতো তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হতো গফ্কে। কিচ্ছু বলতে সাহস করতেন না মার্গারেটকে। দ্বিতীয় পক্ষের সুন্দরী স্ত্রী!

একদিন হলো কি—থিয়েটার দেখে খুব ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরল মার্গারেট। কুক এসে খবর দিয়ে গেল, ডাইনিং টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে। মার্গারেট চোখে মুখে জল দিয়ে খাওয়ার ঘরে পা দিয়েই আঁতকে উঠল—স্পষ্ট দেখল একটি মহিলার ছায়ামূর্তি ডাইনিং টেবিলে ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখছে।

কে—কে আপনি—আতঙ্কে চিৎকার করে উঠতেই সেই ছায়াদেহ মিলিয়ে গেল চোখের পলকে।

আরও একদিন। মিঃ গফ্ আর মার্গারেট দু'জনেই ডিনারে বসেছে। হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এল। মার্গারেটের মনো হলো, প্রচণ্ড জোরে তার চেয়ারটা কেউ যেন পিছনে টানছে। দড়াম্ করে চেয়ারসুদ্ধ মেঝেয় পড়ে গেল মার্গারেট। গফ্ তো একেবারে অবাক। তাঁর মনে হলো, মার্গারেটের নিশ্চয়ই ফিট-টিটের ব্যামো হয়েছে। সেইদিন রাত্রেই কম্প দিয়ে জ্বর এল তার।

দেড়মাস ধরে কত চিকিৎসা হলো, কত বড় বড় ডাক্তার এল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। পাড়ার কয়েকজন বৃদ্ধের পরামর্শে জন গফ্ এলেন স্পিরিচুয়্যালিস্ট অ্যাণ্ড ল্যাঙ্গের কাছে। সব বৃত্তান্ত বললেন গফ্। মিঃ ল্যাঙ্গ এলেন। পেসেন্টকে কিছুক্ষণ দেখেই হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মেঝেয় হাঁটু গেড়ে বসে করুণ মিনতি জানিয়ে মৃতা মেরীর উদ্দেশ্যে বললেন, আপনার এই সংসার—স্বামী—আপনার এই বাড়ির প্রতিটি জিনিস, আপনার ওই ডাইনিং টেবিলটা খুব প্রিয় জানি। কিন্তু সংসারের তুচ্ছ এসব জিনিসের প্রতি আপনার এত 'অ্যাটাচমেন্ট' কেন? এইজন্যেই নিজেও শান্তি পাচ্ছেন না যেমন তেমনি ওরাও শান্তি পাচ্ছে না। আমি মার্গারেটের হয়ে কথা দিচ্ছি উনি আপনার এই সংসারের, আপনার ডাইনিং টেবিলের যত্ন করবেন। আপনি অনুগ্রহ করে ওকে ছেড়ে দিন।

তারপরের দিনই জ্বর ছেড়ে গেল মার্গারেটের। প্রতিদিন সে নিজের হাতে ডাইনিং টেবিলটা ক্লিন করতো। আর কোনদিন জন গফের বাড়িতে কোন উপদ্রব

হয়নি।

থামলেন মিসেস গ্ল্যাডিংস। সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে শান্ত নির্জন বেকার রোডে। বাংলোর কম্পাউণ্ডে কৃষ্ণচূড়ার ঝিরি-ঝিরি পাতায় রাস্তার আলোর ঝিলিমিলির দিকে দৃষ্টি রেখে গ্ল্যাডিংস গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। খুব আস্তে আস্তে বললেন, এই ঘটনার বৃত্তান্ত- কথা লিখে মিঃ ল্যাঙ্গ মন্তব্য করেছেন, মৃত্যুর পর স্থূলদেহ ধ্বংস হলেও আনস্যাটিসফায়েড ডিজায়ার, অর্থাৎ অতৃপ্ত বাসনা এবং কামনায় ভরা 'সোল' কিছুতেই পার্থিব জীবনের মায়া কাটাতে পারে না। জীবিতকালে তার মনে যার প্রতি এবং যে-জিনিসের প্রতি অ্যাটাচমেণ্ট থাকে তার সোলের অ্যাট্রাকশান সেইদিকেই তত বেশি হয়। আর এই আকর্ষণ কিছুতেই তার আত্মাকে উর্ধ্বগামী হতে দেয় না। একটু থেমে বাইরে আসন্ন রাত্রির রঙে মলিন হয়ে আসা আকাশের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে আবার বললেন গ্ল্যাডিংস, ঠিক এই রকমই একটা ঘটনা জড়িয়ে রয়েছে ডি. এম.-এর বাংলোর সেই পিয়ানোর সঙ্গে।

ঘরের ভেতরের নিস্তব্ধতা লেখকের অসহ্য মনে হলো। আলিসাহেবের মনে ভিড় করে এল অনেক—অনেক প্রশ্ন—বিলেত থেকে পিয়ানো সম্বন্ধে কি জেনেছেন মিসেস গ্ল্যাডিংস? আর এমন কি জেনেছেন যা বলতে গিয়ে তিনি এত কষ্ট অনুভব করছেন?

মিসেস গ্ল্যাডিংস তাঁকে সব কথা বলবেন বলেই ডেকেছিলেন। পিয়ানোর রহস্য সম্বন্ধে যা জেনে এসেছিলেন সবই বলেছিলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তাঁর সেই দীর্ঘ বিবৃতিকে ভিত্তি করে আলিসাহেব লিখেছিলেন Ghost stories of Old Calcutta.

"১৯২৭ সালের প্রথমদিকে থ্যাকারের সঙ্গে বিলেত ফিরে যাওয়ার ঠিক বারো বছর পরে যখন মিসেস গ্ল্যাডিংসের মনে পিয়ানোর সেই দুঃস্মৃতিটা প্রায় ফিকে হয়ে এসেছে এমন সময়ে তিনি জানতে পেরেছিলেন নিশীথ রাত্রির সেই সুরলহরীর বিস্ময়কর ইতিহাস।

একদিন একটা চিঠি পেলেন গ্ল্যাডিংস। তাঁর সুদূর বাল্যকালের এক বান্ধবী মিসেস এলারটন লিখেছেন, লণ্ডনে যেকোন মুহূর্তে বোম্বিং (তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সবে শুরু হয়েছে) হতে পারে। তুমি এখানে আমার হাউসে চলে এসো। এখানে খুব আরামে ও নিরাপদে থাকবে।

বোমার ভয়ে লণ্ডন ছেড়ে কোথায় যাওয়া যায় ভেবে দিশেহারা হয়ে উঠেছিলেন মিসেস গ্ল্যাডিংস। অতএব সাদর আমন্ত্রণটা প্রত্যাখ্যান করলেন না।

লণ্ডন থেকে অনেক—অনেক দূরে প্রায় আয়ারল্যাণ্ডের সীমানায় এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম গ্ল্যামোরগ্যানশায়ারে মিসেস এলারটনের বাড়িতে এলেন গ্ল্যাডিংস। বাড়ির কম্পাউণ্ডে পা দিতেই এলারটনের উচ্ছ্বসিত কলরব শোনা গেল—কি রে এসেছিস? আয়—আয়। পথে কোন কষ্ট হয়নি তো ভাই?

দীর্ঘদিনের ব্যবধানে অন্তরঙ্গ দুই বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে যা হয়—যা হয়ে থাকে—পুরো একটা সপ্তাহ যেন খুশির হাওয়ায় শরতের হাল্কা মেঘের মত উড়ে গেল।

একদিন দুই বন্ধু বাগানে বেড়াচ্ছেন। শীতের সকালের হলদে রোদের টোপর পরে মাথা দোলাচ্ছে রাশি রাশি ডালিয়া। সারি সারি ফার্নের ঝিরি-ঝিরি পাতায় পাতায় ভোরের বাতাস আকুলিবিকুলি করছে। শিশিরে ভেজা ঘন বেগুনি রঙের ক্রিসেন্থিমামগুলোর দিকে দৃষ্টি রেখে হঠাৎ গ্ল্যাডিংস বললেন, আচ্ছা এলারটন, তোদের বাড়িটা মিডিয়াভেল পিরিয়ডের একটা ক্যাসলের (দুর্গের) মত কেন রে?

কোন কথা বললেন না এলারটন। শুধু চোখ দুটো ছড়িয়ে দিলেন মধ্যযুগীয় দুর্গের মত অদ্ভুত বাড়িটার দিকে। বেশ উঁচু একটা টিলার ওপরে রক্তবর্ণ পাথরে তৈরি প্রাসাদের চারদিকে উঁচু পাঁচিল। সেই প্রাচীরের বাইরে গভীর জঙ্গলাকীর্ণ ঢালু জমি। মনে হয়, একদা এই প্রাসাদকে বেষ্টন করে ছিল পরিখা। আরও কয়েক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করে অস্ফুটস্বরে বললেন, তুই তো জানিস—উনি (মিঃ এলারটন) ছিলেন ব্যারনের বংশধর। এটা ওঁদের পৈতৃক—

—আচ্ছা, কতদিনের পুরনো হবে এই বাড়িটা?

—কম করে দুশো বছর তো হবেই। দূরে—বহুদূরে কুয়াশার ঝাপসা বিষণ্ণ পাহাড়গুলোর দিকে দৃষ্টি রেখে আস্তে আস্তে বললেন এলারটন, পুরনো কালের মস্ত এই বাড়িটা যেন হাঁ করে গিলে খেতে আসে। একটু থেমে আবার বললেন, রাত্রে কেমন ভয় ভয় করে।

—ভয়? কেন? সাতদিন তো থাকলাম, রাত্রে তেমন কিছু দেখিনি তো!

কোন কথা বললেন না এলারটন। নিঃশব্দে তাঁর শুকনো ঠোঁটের কোণে একটা হাসির আভা জেগে উঠল। কিন্তু কয়েকমুহূর্ত পরেই কেন যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। আচমকা কিছু মনে পড়ে গিয়েছে এমন করে বললেন এলারটন—আজ কি বার রে গ্ল্যাডিংস?

—কেন—বুধবার।

—তারিখ?

—২৩শে ডিসেম্বর ১৯৩৯ সাল, বিস্মিত হয়ে গ্ল্যাডিংস বললেন, কেন বল তো তুই সন-তারিখের হিসাব নিচ্ছিস?

কোন কথা বললেন না এলারটন। আঙুলের কর গুনে গুনে কি যেন হিসাব করলেন। তারপর যেন অনেক—অনেকদূর থেকে বললেন, আজ—আজ রাত্রেই তো তিনি আসবেন!

—কে আসবে, কার কথা বলছিস তুই? বিস্ময়ের যন্ত্রণায় গ্ল্যাডিংসের চোখ দুটো ছটফট করতে লাগল।

একটা কথাও বললেন না এলারটন। বলতে চাইলেন না। হয়তো বা বলতে

পারলেনও না। শুধু কেমন ধোঁয়াটে চোখে তাঁর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অবসন্ন গলায় বললেন, তুই তো জানিস ওঁর মৃত্যুর পর আমি এ বাড়িতে এসেছি মাত্র বছর খানেক হলো।

—হ্যাঁ—তুই তো তোদের ব্রিস্টলের বাড়িতে ছিলি।

—তাই তো—এ বাড়ির হালচাল কিছুই জানি না ভাই—শুধু শুনেছি, বলেই হঠাৎ থেমে গেলেন এলারটন। যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল তাঁর মুখে। অস্ফুটস্বরে বললেন, এটা তো ১৯৩৯ সাল! আজকে দশ বছর পূর্ণ হলো। আজই রাত্রে তিনি আসবেন।

—তুই কি কোন স্পিরিটের কথা বলছিস?

—দেখাই যাক না, তুই তো থাকবি আমার সঙ্গে!

গ্ল্যামোরগ্যানশায়ারের সেই জঙ্গলাকীর্ণ প্রাসাদের চারদিকে রাত্রি নামল ঘন হয়ে। ঘুম নেই দুই বন্ধুর চোখে। তাঁরা জানলার কাঁচের শার্সিতে চোখ রেখে আকুল আগ্রহে তাকিয়ে আছেন বাইরে। সেই টিলা থেকে নীচের বাড়িগুলোকে মনে হচ্ছে যেন কাকজ্যোৎস্নায় সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা সারি সারি কবরের মত। হঠাৎ কোথা থেকে তীক্ষ্ণ একটা হাওয়ার ঝলক বয়ে এল। বাগানের শেষপ্রান্তে দীর্ঘ ইউক্যালিপটাসের সরু সরু পাতায় শাঁ শাঁ করে কান্নার মত শব্দ বাজল। হঠাৎ তাঁদের মনে হলো, প্রাচীন ওক গাছটার নীচে একটা অতিলৌকিক ছায়া কেঁপে উঠল থরথরিয়ে। আর ঠিক সেই সময়ই সুষুপ্ত পৃথিবীর নিথর স্তব্ধতা বাতাসে তরঙ্গায়িত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল দূর অন্ধকার দিগন্তে। আর সেই সুপ্রাচীন কালের অট্টালিকার একটি প্রকোষ্ঠের বিনিদ্র দুই প্রৌঢ়াকে বিস্মিত এবং হতবাক করে দিয়ে ঘন কুয়াশায় ছেয়ে থাকা ওকগাছের নীচে ঝাপসা অন্ধকারে ফুটে উঠল অশ্বারূঢ় এক বলিষ্ঠ ছায়ামূর্তি। তারা-ভরা আকাশের পটভূমিতে তার মুখের ছায়াময় আকৃতিতে রাজকীয় আভিজাত্যের সুস্পষ্ট ছাপ। অস্পষ্ট ঘসা ঘসা ছবির মত একে একে পরিস্ফুট হয়ে উঠল তার অনুচরদের ছায়াদেহ। সেই নিশীথ রাত্রির বুকজোড়া কুয়াশার ভেতরে জ্বলন্ত রক্তের ছিটের মত জ্বলে উঠল এক-একটি মশাল। সেই মশালের আলোয় রহস্যময় রাজপুরুষের নেতৃত্বে শুরু হলো তার অনুগামীদের শোভাযাত্রা। ছায়াবাজির এক বিশাল জটলার মত সেই মিছিল প্রধান তোরণ দিয়ে বেরিয়ে ধীর পদক্ষেপে প্রাসাদ পরিক্রমা করে বাগানেরই গাছগাছালির ঝুপসি অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

—কী আশ্চর্য—এঁরা কারা?

—উনিই তো দশ বছর পর পর ঠিক এই দিনটিতে দেখা দেন তাঁর পাত্রমিত্রসহ। একটু থেমে অভিভূত সেই আচ্ছন্নতার ঘোর কাটিয়ে মিসেস এলারটন কেমন অস্পষ্ট গলায় বললেন, আমার স্বামী তো আমাকে কিছুই বলে যাননি। ব্রিস্টলে মৃত্যুর আগে শুধু বলেছিলেন গ্ল্যামোরগ্যানশায়ারে তাঁদের একটা পৈতৃক বাড়ি

আছে। তবে আমি সেখানে থাকতে পারবো কিনা তা তিনি বলতে পারেন না—হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন এলারটন। গ্ল্যাডিংসের বিহ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, এখানে আসার পর থেকেই স্থানীয় লোকের মুখে শুনেছি এটা নাকি গোস্ট হন্টেড হাউস! আর দশ বছর পর পর এই অলৌকিক কাণ্ডটা ঘটে। কিন্তু কে ওই রাজপুরুষ—কার বিদেহী আত্মা সে-সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে পারে না। তুই গোস্ট-টোস্ট নিয়ে ইন্টারেস্টেড বলেই তো ডেকে পাঠিয়েছি তোকে।

মিসেস এলারটন কি বলছেন, কাকে বলছেন কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছেন না গ্ল্যাডিংস। তাঁর মনের ভেতরে ভেসে উঠল, সুদূর আলিপুরের ডি.এম.-এর বাংলোর রুদ্ধ ঘরের ঘন অন্ধকারে রহস্যময়ী সেই রমণীর ছায়াদেহ, সেই দুর্যোগপূর্ণ রাত্রে পিয়ানোর করুণ মধুর সুরকে অনুসরণ করে বনজঙ্গল ভেঙে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যাওয়া—সুদীর্ঘ তের বছর আগের সেই দুঃসহ স্মৃতির পীড়নে তাঁর চেতনা যেন কেমন আড়ষ্ট হয়ে এল।

—কি এত ভাবছিস বল তো?

মিসেস এলারটনের কথায় ধাক্কা খেয়ে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন গ্ল্যাডিংস। বন্ধুর মুখের দিকে না তাকিয়ে আচ্ছন্নের মত বিড়বিড় করে বললেন, ভালো জায়গায় এনেছিস দেখছি—হঠাৎ নিজেকে একটা যেন প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে সংযত আর স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে বললেন, আশ্চর্য লোক তুই? তোর জানতে ইচ্ছে হয় না—কে এই অশ্বারোহী পুরুষ? এই গ্ল্যামোরগ্যানশায়ারে কি কোন প্রাচীন লোক একটাও নেই যে বলতে পারে এই স্পিরিটের —উত্তেজনায় রুদ্ধ হয়ে এল গ্ল্যাডিংসের কণ্ঠস্বর। তার কথাগুলোর ভেতরে উত্তাপের রেশ ফুটে উঠল।

—তোকে এখানে ডেকে এনেছি বলে কি তুই রাগ করেছিস গ্ল্যাডিংস, প্রচ্ছন্ন অপরাধবোধের ছায়া পড়ল এলারটনের মুখে। একটু থেমে সঙ্কোচে আবার থেমে বললেন, কি করবো ভাই, এখানকার ওই পাহাড়ের ঢালুতে বুইল্ট ক্যাসল, ডাম্বারটন ক্যাসল সব—সব দুর্গ প্রাসাদই নাকি হন্টেড—

—স্ট্রেঞ্জ! এই বাড়িগুলোর হিস্ট্রি কেউ জানে না?

—শুনেছি প্রেমবোকশায়ারের এক ওল্ড ম্যান নাকি জানেন সব—তাঁর সেখানে সবচাইতে বড় ফার্ম হাউস। একটু থেমে এলারটন বললেন। আবার, উনি নাকি তোর মতই ইণ্ডিয়াতেও বহুকাল ছিলেন।

—রিয়েলি? চল চল—কালই সকালে চল তাঁর কাছে।

দুই বন্ধু। দুই প্রৌঢ়া।

দুই ঘোড়ায় টানা খোলা গাড়িতে করে এলেন প্রেমবোকশায়ারে। চারদিকে কম্পাউণ্ড ওয়াল দিয়ে ঘেরা ফার্ম-হাউস। ঘন সবুজের ছবির মত লনের ভেতরে

সুরকি-বিছানো চক্রাকার পথ দিয়ে ঘুরে গাড়ি এসে দাঁড়ালো বাড়ির সামনে। ড্রইংরুমে বসে খবর দিতেই বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ। চোখেমুখে আভিজাত্যের সুস্পষ্ট ছাপ।

—নমস্কার। আমিই জেমস ডোনাল্ড। বলুন, কি দরকার?

মিসেস এলারটন নিজের পরিচয় দিতেই বৃদ্ধের ধূসর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, আপনার শ্বশুরমশাই ব্যারন য়'ডোনহো ছিলেন আমার পিতৃদেবের বাল্যবন্ধু। আপনার স্বামীও আমার বন্ধু। আপনাদের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক সৌহার্দ্য—একটু থেমে মিসেস এলারটনের বিব্রত মুখখানার দিকে তাকিয়ে আবার বললেন ডোনাল্ড, এতদিন আসেননি কেন? শুনেছি ব্রিস্টল থেকে তো এসেছেন অনেকদিন। একটু থেমে মিসেস গ্ল্যাডিংসের দিকে ইশারা করে বললেন, ইনি কে?

—ওনার পরিচয়, আমার ছোটবেলার বন্ধু মিসেস গ্ল্যাডিংস!

—বাঃ বেশ—বেশ। আপনিও এসেছেন দেখে খুব খুশি হয়েছি মিসেস গ্ল্যাডিংস।

আরও কিছুক্ষণ এ-কথা সে-কথার পর মিসেস এলারটন বিগত রাত্রের অলৌকিক ঘটনার কথা বলতেই ডোনাল্ড বললেন, ও, এই ব্যাপার! আয়ারল্যাণ্ড আর ইংল্যাণ্ডের সীমানায় গ্ল্যামোরগ্যানশায়ারের কাউন্টির প্রায় সব পুরনো দুর্গপ্রাসাদ অর্থাৎ ক্যাসল্ই গোস্ট-হণ্টেড হাউস।

—সে তো আমি জানি মিঃ ডোনাল্ড। কিন্তু ওই বুইল্ট ক্যাসলে কেন দেখা যায় এক সুন্দরী রমণীর ছায়াদেহ, কেন ডাম্বারটন ক্যাসলে দেখা যায় চার ঘোড়ায় টানা একটা কালো গাড়ির ছায়া ছুটে আসে সমুদ্রের দিক থেকে?

—বলছি বলছি—আমি যেটুকু জানি বলছি, তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন ডোনাল্ড, প্রতিটি গোস্ট হণ্টেড হাউসেরই একটা হিস্ট্রি আছে। একটু থেমে কেন যেন গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললেন, প্রেতের আনাগোনা যে বাড়িতে থাকে, সে বাড়ির ইতিহাস কিছুটা কিংবদন্তীর মতও হয়ে যায়।

—কি রকম? বুইল্ট ক্যাসলের মহিলার হিস্ট্রিটা কি?

—বুইল্ট ক্যাসলটা হলো পর্তুগালের এক কাউণ্ট ও'নিয়েলের বিলেতের রেসিডেন্স। ও'নীয়েল ছিলেন অসাধারণ মাইজার অর্থাৎ কৃপণ। তাঁর একমাত্র মেয়ের জন্মদিনে প্রতি বছর দিতেন একটি মুদ্রা। পরের দিনই আবার ফিরিয়ে নিতেন। ও'নিয়েল টাকাপয়সা সম্পত্তি ছাড়া কিচ্ছু বুঝতেন না। তাঁর নিশ্বাসেও ছিল টাকার গন্ধ। ও'নিয়েলের কাছে তাঁর মেয়ের জন্মদিনের মুদ্রা যখন হলো ত্রিশটা, সেই সময় সেই জনমানবহীন শ্মশানের মতো বাড়িতে এল দূর সম্বন্ধের এক আত্মীয় যুবক। একটু থেমে মন্ত্রমুগ্ধের মত আবিষ্ট দুই মহিলার দিকে তাকিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, এই তরুণের সঙ্গে যেই প্রণয়াসক্ত হলো মেয়েটি অমনি ঘটে গেল

একটি দুর্ঘটনা।

একদিন দেখা গেল গভীর খাদে যুবকের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। পরের দিন এই ক্যাসলে মেয়েটি আত্মহত্যা করেছিল, এই পর্যন্ত বলে থামলেন ডোনাল্ড। কয়েক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করে বললেন, গভীর রাত্রে তরুণী সুন্দরীর প্রেতচ্ছায়া দেখা যায়—লোকে বলে সে ওই কাউন্টের মেয়ে। কিংবদন্তী একথাও বলে যে, রাত্রে দেখা যায় ওই মেয়েটির ছায়াদেহ কোন খুশির উল্লাসে নাচছে; কাউকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আর সে দৃশ্য যার চোখে পড়বে সে না কি বাঁচে না।

—ডাম্বারটনক্যাসলের কালো গাড়ি?

—ওই একই রকম ইতিহাস। এই ক্যাসলের মালিক ছিলেন এক অত্যাচারী জমিদার। তাঁর জঘন্য অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর প্রজারা তাঁকে সমুদ্রে ডুবিয়ে খুন করেছিল। একটু থেমে ছাড়া ছাড়া গলায় আবার বললেন, এখানকার স্যান ক্যাসল, সেন্ট ডোনেট ক্যাসলের মত আর আর সব পুরনো বাড়িই হণ্টেড হাউস—থামলেন ডোনাল্ড।

মিসেস এলারটন দূরে জঙ্গলাকীর্ণ খাড়া পাহাড়ের গায়ে স্যান ক্যাসলের ধ্বংসাবশেষের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

—আচ্ছা একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো—মিসেস গ্ল্যাডিংস সসঙ্কোচে বললেন, আমার বন্ধু বলছিল, আপনি নাকি ইণ্ডিয়াতে ছিলেন?

—হ্যাঁ ম্যাডাম।

—কোথায় ছিলেন?

—বেঙ্গলে—একটু থেমে যেন সাবেকদিনের কোন স্মৃতি নিয়ে মনের ভেতরে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন ডোনাল্ড, উনিশশো বারো থেকে উনিশশো পনের—তিন বছর আমি টুয়েণ্টিফোর পরগণার ডি. এম. ছিলাম।

কি বললেন! তীব্র উত্তেজনায় থরথর করে কেঁপে উঠলেন গ্ল্যাডিংস। তাঁর মাথার ভেতরে ফেটে পড়ল রক্তের উচ্ছ্বাস। কোনরকমে নিজেকে সংযত করে বললেন, আপনি কি আলিপুরের টালিনালা আর জেলখানার মাঝখানে ডি.এম.-এর সেই বাংলোতে ছিলেন?

—হ্যাঁ ম্যাডাম, গ্ল্যাডিংসের উত্তেজিত এবং উদ্ভ্রান্ত মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে ডোনাল্ড বললেন, মনে হচ্ছে—আপনিও বোধহয় কোন সময়ে সেই বাংলোতে ছিলেন।

কোন কথা বললেন না গ্ল্যাডিংস। বলতে পারলেন না।

বিশ বছর—সেই বিশ বছর আগে গভীর নিশীথে কোন সুদূর দেশের সেই রোমাঞ্চকর অলৌকিক ঘটনার টুকরো টুকরো ছবি তাঁর মনের ভেতরে ঠিক ছায়াবাজির মত ফুটে উঠতে লাগল। আর সেই ভয়ঙ্কর দুঃসহ স্মৃতির পীড়নে তাঁর চেতনা কেমন বিকল হয়ে এল।

—নমস্কার, আপনারা একটু চা খাবেন তো, ভেতর থেকে ধীর পায়ে বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধা। তাঁর ধারালো নাকে, উজ্জ্বল দুটো চোখে ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং আভিজাত্যের ছাপ এত সুস্পষ্ট যে বলে দিতে হয় না ইনি লেডি ডোনাল্ড। তবুও—

তবুও প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে চব্বিশ পরগণার ম্যাজিস্ট্রেট জেমস ডোনাল্ড আগন্তুক দুই মহিলার সঙ্গে স্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। আর মিসেস গ্ল্যাডিংসকে আবার প্রশ্ন করলেন, আপনি কোন সময় আলিপুরে ডি.এম.-এর বাংলোতে ছিলেন?

—নাইন্টিন টুয়েন্টিসিকসে।

—তখন ম্যাজিস্ট্রেট কে ছিলেন?

—মিঃ থ্যাকারে।

—ও মাই গড—আপনিও আলিপুরে ডি.এম.-এর রেসিডেন্সে ছিলেন, কলকল করে বললেন লেডি ডোনাল্ড। ফার্স্ট গ্রেট ওয়ারে আমি, আমার মা—বলেই হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি। বেদনার ছায়া ভেসে উঠল তাঁর মুখে। আর একটা কথাও বললেন না তিনি। কয়েক মুহূর্ত পরে কি ভেবে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বললেন, আমরা প্রায় চার বছর ছিলাম বেঙ্গলে।

ডোনাল্ড কিন্তু তীক্ষ্ণ চোখে গ্ল্যাডিংসের মনের ভেতরের আলোড়নটাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে বললেন, আপনি কি বেঙ্গলের 'আই মিন, আলিপুরের ডি.এম.-এর রেসিডেন্স সম্বন্ধে কিছু বলবেন?'

ইয়েস স্যার। বিশ বছর আগে সে বাড়িতে এমন একটা আশ্চর্য ঘটনা দেখেছিলাম—যার কোন সায়েন্টিফিক এক্সপ্ল্যানেশান আমি আজও খুঁজে পাইনি—

মিসেস গ্ল্যাডিংস তাদের বলেছিলেন। বলেছিলেন, সেই একতলার বন্ধ ঘরে ছায়ামূর্তির করুণ আর্তনাদ, বলেছিলেন সেই টেবিলের মত কি একটা জড়িয়ে ধরে সেই কান্নায় থরো-থরো ছায়াদেহের কথা; কিন্তু সেই ঝড়-জলের রাত্রে পিয়ানোর সুরকে অনুসরণ করে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে যাওয়ার বৃত্তান্ত বলতেই হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল ঘরে—

ও!—মাই গড! গ্ল্যাডিংসের কথা শেষ হওয়ার আগেই অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেছিলেন লেডি ডোনাল্ড। আর কেমন বিবর্ণ পাণ্ডুর হয়ে গিয়েছিল তার রোগা রোগা মুখখানা। দুই হাতে বুক চেপে ধরে যেন তীব্র কোন যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে কান্নায় ভাঙা ভাঙা অস্পষ্ট গলায় বললেন, উনি—উনিই আমার—আমার মা। বলেই কেমন নিষ্পলক, শূন্য দৃষ্টিতে দূরে আকাশের গায়ে আঁকা ধূসর পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

গভীর শোকের মত নিথর স্তব্ধতা নেমে এল ঘরে। কিছুক্ষণ পর যেন নিজের মনের ভেতর ডুব দিয়ে বললেন জেমস ডোনাল্ড,—আচ্ছা আপনি কবে প্রথম দেখেছিলেন সেই কালো ছায়ামূর্তি মিসেস গ্ল্যাডিংস?

—আমার স্পষ্ট মনে আছে ১২ই মার্চ, ১৯২৬ সাল।

—স্ট্রেঞ্জ! ঠিক ওই দিনেই তো মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, উত্তেজনায় হাঁসফাঁস করতে করতে বললেন মিসেস ডোনাল্ড।

তাঁর কথায় কোন ভ্রূক্ষেপ না করে ডোনাল্ড আবার প্রশ্ন করলেন, আর কবে সেই সুর শুনে ছুটেছিলেন?

সেটা ছিল বর্ষার একটা দিন—তারও তারিখ মনে আছে, একটু থেমে স্মৃতির ভেতরে তুরপুন চালিয়ে মিসেস গ্ল্যাডিংস বললেন, টুয়েন্টি-ফার্স্ট জুলাই, টুয়েন্টি-ফার্স্ট জুলাই! নাইন্টিন-হাণ্ড্রেড অ্যাণ্ড টুয়েন্টি-সিক্স!

আর্তনাদ করে উঠলেন মিসেস ডোনাল্ড। রুদ্ধশ্বাসে বললেন, ওইদিন—ওইদিনই তো মা মারা যান—ইজ নট ইট ডার্লিং?

ঘরে যেন একটা বাজ পড়েছে। কারো মুখে কোন কথা নেই। কিন্তু ঘরের প্রত্যেকের মনে ঘনিয়ে আসে একটা প্রশ্ন—রোগগ্রস্ত অবস্থায় কিম্বা মৃত্যুর আগে কি মানুষের স্পিরিট তার প্রিয়তম কোন জিনিসের দুর্বার আকর্ষণে অতি দূর দেশে যেতে পারে?

বহুদর্শী এবং প্রেতবিদ্যা বিশেষজ্ঞ জেমস ডোনাল্ড হয়তো প্রত্যেকের মনের অবস্থা অনুধাবন করেই আস্তে আস্তে বললেন, আপনারা টেলিস্থেসিয়া (Telesthesia) এবং ট্র্যাভেলিং ক্লেয়ারভয়েন্স (Travelling Clairvoyance)—এই দুটো কথা কখনো শুনেছেন? ঘরের সবাই মাথা নাড়ল।

—এই দুটো কথার অর্থ হলো দিব্যদৃষ্টি বা আকাশদৃষ্টি এবং দূরবিজ্ঞপ্তি (Travelling Clairvoyance)। যোগীরা যেমন সূক্ষ্ম দেহে দূরদেশে গিয়ে কোন ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে চলে আসতে পারেন তেমনি অসুস্থ বা মুমূর্ষু অবস্থায় সাধারণ লোকও মাঝে মাঝে তাদের অজ্ঞাতসারে দিব্যদৃষ্টি পেতে পারে এবং সূক্ষ্ম দেহে অনেক দূরদেশে তার কোন প্রিয়জন কি প্রিয় বস্তুর কাছে গিয়ে ফিরে আসতে পারে—থিয়োসফিস্টরা এই অলৌকিক ঘটনাকেই বলেছেন টেলিস্থেসিয়া এবং ট্র্যাভেলিং ক্লেয়ারভয়েন্স। থামলেন ডোনাল্ড শ্রোতাদের মুগ্ধ বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে, আবার বললেন, স্পিরিচুয়্যালিস্ট মিসেস ক্রাউ (Mrs. Crow)-এর লেখা The Nightside of the Nature গ্রন্থে আছে—

ফিলাডেলফিয়ায় এক ভদ্রমহিলা অনেকদিন থেকে অসুখে ভুগতে ভুগতে যখন মুমূর্ষু অবস্থায় এলেন তখন তাঁর প্রবল ইচ্ছে হলো স্বামীকে দেখতে। ভদ্রলোক ছিলেন এক সওদাগরী জাহাজের ক্যাপ্টেন এবং তিনি তখন পৃথিবীর কোন বন্দরে, কোন শহরে আছেন তা বহু চেষ্টা করেও জানা যায়নি। মৃত্যুর আগের দিন ভদ্রমহিলা অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। পরের দিন তাঁর অসুখের প্রকোপ কম দেখা গেল। ভদ্রমহিলা তাঁর মাকে বললেন, মা, আমি কাল রাত্রে তোমার জামাইকে দেখেছি। লণ্ডনে এক হোটেলে বসে বেশ সুস্থ অবস্থায় কফি খাচ্ছে। একটু থেমে

ক্ষীণ স্বরে আবার বললেন, যাক, ও ভালো আছে, ওকে দেখেছি—এখন আমার মরতে কোন দুঃখ নেই, বলতে বলতেই মৃত্যুপথযাত্রীর চোখ দুটো জলে ভরে এল।

ভদ্রলোক দেশে ফিরে এলে তাঁর বাড়ির লোক এই বৃত্তান্ত বলতেই তিনি বললেন, সেই রাত্রেই আমি মেরীকে দেখেছিলাম এবং খুব দুঃস্বপ্নও দেখেছিলাম ওকে নিয়ে। তাই তাড়াতাড়ি চলে এলাম।

ট্র্যাভেলিং ক্লেয়ারভয়েন্সের আরও একটি ঘটনা বলছিলেন ডোনাল্ড।

মনোবিজ্ঞানী এবং অধ্যাপক রাইনের (Rhine) স্ত্রী দুপুররাতে ধড়মড় করে জেগে উঠেই স্বামীকে বললেন, তাঁকে এখুনি ন মাইল দূরে তাঁর পিত্রালয়ে নিয়ে যেতে। প্রফেসর রাইন কারণ জিজ্ঞাসা করতেই মিসেস জানালেন তাঁর দাদাকে নিয়ে বিশ্রী দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর দাদা বিকেলে গোয়ালঘরে গরু-বাছুর তুলে রেখে খড়ের গাদার ওপরে বসেছিলেন। সেখানেই পিস্তল দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

অধ্যাপক রাইন তাঁর সম্বন্ধীর বাড়িতে এসে দেখলেন, তাঁর স্ত্রী যে দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেন ঠিক তাই ঘটে গিয়েছে আগের দিন বিকেলে। শুধু অসুস্থ নয়, সুস্থ মানুষও স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম দেহে ভ্রমণ করতে পারে—এটা তার প্রমাণ।

কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে কি ভেবে জেমস ডোনাল্ড ছাড়া ছাড়া গলায় বললেন, আমার শাশুড়ির বিদেহী আত্মা ডেফিনিটলি অসুস্থ অবস্থায় এবং মৃত্যুর আগে আলিপুরে ডি.এম.-এর রেডিডেন্সে গিয়েছিল।

—তিনি কি পিয়ানো বাজাতে পারতেন? গ্ল্যাডিংসের চোখ দুটো উৎসুক হয়ে উঠল।

—হ্যাঁ, তিনি ছিলেন খুব বড় মিউজিসিয়ান। আমাদের সঙ্গে তিনিও আলিপুরের বাড়িতে ছিলেন। তাঁর বাজনা শোনার জন্য ইউরোপিয়ান অফিসাররা দল বেঁধে আসতেন আমার কোয়ার্টারে।

—বিঠোফেনের নাইনথ সিম্ফোনিতে আমার মার জুড়ি ছিল না, মাথা নিচু করে অস্ফুটস্বরে বললেন লেডি ডোনাল্ড। চফিন, মোজ্যার্ট—প্রতিটি সুরশিল্পীর সুর তুলতে পারতেন। থেমে আবার বললেন, খুব শখ করে লেটেস্ট মডেল ভিয়েনিজ পিয়ানো কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন। পিয়ানোটা ছিল তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয়—সেই পিয়ানো—

—সে পিয়ানোর কি হলো?

—কি আর হবে, আলিপুরের ভূতপূর্ব ম্যাজিস্ট্রেট ডোনাল্ড বললেন আমার টার্ম শেষ হলো। বহু চেষ্টা করে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া স্টিম ন্যাভিগেশান কোম্পানির জাহাজে তিনটি টিকিট পেলাম লণ্ডনের। কিন্তু মুশকিল হলো—কোম্পানি কিছুতেই পিয়ানোটা নিতে রাজি হলো না। সবে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। তখন অ্যাকোমোডেশান এবং কারগো খুব রেস্ট্রিক্টেড্—

থামলেন ডোনাল্ড। হয়তো পুরনো দিনের স্মৃতিতে মগ্ন হয়ে গেলেন। আবার আস্তে আস্তে বললেন, আমার মাদার-ইন-ল বেঁকে বসলেন—বললেন, পিয়ানো না নিতে পারলে তিনিও যাবেন না।

আমি এশিয়াটিক স্টিম ন্যাভিগেশান কোম্পানি, বাকনাল কোম্পানি, এলারমান স্টিমশিপ —আরও কত জাহাজ কোম্পানির দরজায় দরজায় ঘুরলাম। কিন্তু কিছুতেই কোন শিপিং কনসার্নকে রাজি করাতে পারলাম না—হঠাৎ থেমে গেলেন ডোনাল্ড। ব্যথার ছায়া ফুটে উঠল বৃদ্ধের মুখে। হয়তো ত্রিশ বছর আগের সেই বেদনাদায়ক ঘটনার স্মৃতিই তাঁকে ব্যথাতুর করে তুলছে।

—শেষ পর্যন্ত পিয়ানোটাকে রেখেই চলে এলেন?

—কি আর করবো, অগত্যা তাই করতে হলো, আমার সাকসেসারকে বলেছিলাম পিয়ানোটা বিলেতে পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, কেউ আর গা করে না। বহু চিঠি লিখে অনেক অনুরোধ করেছিলাম বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টকে। কিন্তু একটু ইনিশিয়েটিভ নিয়ে কেউ পিয়ানোটাকে আর পাঠালো না।

—রওনা হওয়ার আগের দিন পিয়ানোটাকে জড়িয়ে ধরে ছেলেমানুষের মত মার সে কী কান্না! ভাঙা ভাঙা অস্পষ্ট গলায় এই কথাগুলো বললেন লেডি ডোনাল্ড। আর—আর হয়তো চোখের জল গোপন করার জন্যই দ্রুত পায়ে ভেতরে চলে গেলেন।

এতদিনে রহস্যভেদ সম্ভব হলো।

ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পাল্কিতে ভূত

ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, জাতীয় গ্রন্থাগার—যে নামেই ডাকি না, সে কিন্তু সাড়া দেবে বেশি বেলভেডিয়ার প্যালেস নামে। বড়লাটের আরামগৃহ বলে কথা। এবং আরও বড় কথা, এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ইতিহাসটা কম বড় নয়। কলকাতার যে তল্লাটে এই প্রাসাদোপম বাড়ি, সে অঞ্চলটা আলিপুর নামেই সুপরিচিত। আলিপুর নামটি উচ্চারণের সঙ্গে বেশিরভাগ লোকের মনে জেগে ওঠে চিড়িয়াখানার কথা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যখন মধ্যযুগ, তখনই এর প্রতিষ্ঠা বেসরকারি উদ্যোগে। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন অযোধ্যার নির্বাসিত নবাব ওয়াজির আলি সাহেব এর চোরাবাগানের রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিক। এই চিড়িয়াখানাকে উপলক্ষ করে আলিপুরের বাড়বাড়ন্ত।

এরই গা-লাগোয়া আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগার—সিংহলাঞ্ছিত বিশাল তোরণ পার হয়ে যেখানে ঢুকতে হয়। এর মধ্যস্থলেই বিশালাকার সাদা বাড়িটাই এই চত্বরে জাতীয় গ্রন্থাগারের আদি আশ্রয়—এখন 'ভাষা ভবন' গুরুত্ব পেয়েছে, কিন্তু আপন মহিমা নিয়ে বেলভেডিয়ার আজও মহিমময়। সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে এখানেই ছিল দিল্লীশ্বর আজিম ওসমানের সাময়িক নিবাস। তারও আগে ফ্রাঙ্কল্যাণ্ডের বাগানবাড়ি। আঠারো শতকে এটি হয়ে যায় মিরজাফরের সম্পত্তি। তাঁর হাত থেকে হেস্টিংস সাহেবের হাতে। তারপরে নানা হাতবদল হয়ে শেষে লাটভবন। এককালে হেস্টিংস হাউস নামে সুখ্যাত বাড়িটার মালিকও ছিলেন মিরজাফর আলি খাঁ। আর বেলভেডিয়াদের বাড়িটা ছিল মিরজাফরের নবীনা মহিষী মণিবেগমের খাসমহল।

হঠাৎ করে কী যেন এক বাহানায় হেস্টিংসকে এই বাড়িতে আসতে হয়েছিল এবং অবাক বিস্ময়ে সেদিন তিনি দেখেছিলেন প্রৌঢ় নবাবের পাশে বসে উদ্ভিন্ন যৌবনা মণিবেগমকে—সেদিন তাঁর মাথায় এক চিলতেও ঘোমটা ছিল না। কী যেন এক কৌশলে তিনি বেগমসাহেবার সঙ্গে আলাপও করে নেন এবং বুঝতে পারেন এই রমণীর বুকের তিয়াশা মেটাবার সাধ্যি প্রৌঢ় নবাবের নেই।

আর তারপর থেকেই এই মহলে হেস্টিংস-এর কাজের পরিমাণ খুব বেড়ে যায়। তাঁকে ঘন ঘন এই প্রাসাদে আসতে হয়। সম্ভোগের লিপ্সা তাকে তাড়না করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাঁর খাসমহলে প্রবেশের কোনো সাধ্যি নেই তাঁর। তাঁরই পরামর্শে মণিবেগম নবাব সাহেবের কণ্ঠলগ্না হয়ে একদিন আর্জি পেশ করে বসলেন—আল্লার কাছে নিভৃতে এবাদতের জন্যে তাঁর একটা নিভৃত মহলের প্রয়োজন,

ভিড়ের মধ্যে তাঁকে স্মরণে বেগমসাহেবার বড্ড অসুবিধা হচ্ছে। তিনি প্রার্থনা নিয়েই থাকবেন। একটা নির্দিষ্ট দিনে তিনি নবাবের সঙ্গে মিলিত হবেন মাত্র, অন্যদিনগুলোতে নয়।

পত্নীনিষ্ঠ মীরজাফর তাঁর হুকুম তামিল করলেন। চলছিল ভালই। কিন্তু একদিন নির্দিষ্ট দিনের নির্দেশ না মেনে এক অ-দিনেই মিরজাফর আলি সেই নতুন মহলে গেলেন এবং দেখলেন মণিবেগম হেস্টিংসের বাহুবন্ধনে নিষ্পিষ্টা হচ্ছেন। কিছু করার ছিল না নবাবের, তাঁর অধীশ্বর হেস্টিংসের বিরুদ্ধে কিছু করার সামর্থ্যই ছিল না তাঁর। মণিবেগমের কী হয়েছিল জানি না, কিন্তু হেস্টিংস ওই নতুন মহল আর পুরনো মহলের অধীশ্বর হয়ে গেলেন। বেলভেডিয়ার আর হেস্টিংস হাউস তাই কামনার প্রতিক্রিয়া, কামনার প্রতিচ্ছবি, কামনার প্রতিধ্বনি। কে জানে আদি গঙ্গার আবহাওয়ায় সব পাপকর্মের শুদ্ধিকরণ ঘটে যেত কিনা! নইলে এই অসম্ভব কামুক পুরুষ সম্পর্কে তাঁর জাতভাই সাহেবেরাই এমন এমন কথা লিখে যেতে পারতেন—

★ He had a lucrative mania for house building and Selling.

★ He had built total 13 buildings.

★ It was in Belvedere he became very close with Baron Imphofts wife Mr. Marian Imphoff.

আর এই বাড়ির বাগানের পশ্চিমদিকে দুশো বছরের বেশি আগে দুই ইংরেজ দ্বন্দ্বযুদ্ধে, সামনা-সামনি লড়াইয়ে নেমেছিলেন—সুখ্যাত-কাম-কুখ্যাত ওয়ারেন হেস্টিংস বনাম ফিলিপ ফ্রান্সিস। কলকাতায় তখন এক অতি সুন্দরী মহিলার বাস—মাদাম গ্র্যাণ্ড। তাঁর স্বামী মিস্টার ফ্রান্সি গ্র্যান্ড যখন বাড়িতে থাকতেন না, তখনই তাঁর বাড়িতে হাজির হতেন ফিলিপ ফ্রান্সিস। মিসেস গ্র্যান্ড থাকতেন আলিপুর লেনের রেড গার্ডেন হাউসে। এখানেই তাঁর কাছে যেতেন হেস্টিংস, তারই বন্ধু বারওয়েল এবং অবশ্যই কাউন্সিলার ফ্রান্সিস। ২০ নভেম্বর, ১৭৭৮—এদিনে হেস্টিংস বেলভেডিয়ারে তাঁর বলনাচের আসরে নেমন্তন্ন করেছিলেন অন্যদের সঙ্গে গ্র্যাণ্ড দম্পতিকে। এখানেই শ্রীমতী গ্র্যান্ডের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল ফ্রান্সিসের। পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠল। দুর্বার, দুরন্ত প্রেমে ফ্রান্সিস হাবুডুবু খেতে লাগলেন। কিন্তু সেই প্রেমের পথ নিষ্কণ্টক ছিল না, কাঁটা হয়ে ফুটে উঠলেন তারই বন্ধু স্বয়ং ওয়ারেন হেস্টিংস। হেস্টিংসের পক্ষে একটু অসুবিধা ছিল তাঁর পদমর্যাদা। লাটসাহেবের পক্ষে যখন তখন এর-ওর বাড়িতে যাওয়াটা শোভন ছিল না। ফিলিপের পক্ষে সেই অসুবিধেটা ছিল না বলে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর সুযোগটা তাঁরই বেশি ছিল। মিসেস গ্র্যান্ডের পক্ষপাতিত্ব কার প্রতি ছিল—তাও নিশ্চয় করে বোঝা যাচ্ছিল না।

এহেন সময়ে ৭ ডিসেম্বর তারিখে সেই দুর্দৈবটা ঘটে গেল। এদিনে বারওয়েল সাহেব গ্র্যান্ড দম্পতিদের নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁর খিদিরপুরের বাড়িতে। খবরটা কানে যেতেই ফ্রান্সিস সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন এবং সোজা চলে গেলেন সন্ধে হতে না হতেই বারওয়েল সাহেবের খিদিরপুরের বাড়িতে এবং পাঁচিল টপকে সেই বাড়িতে ঢুকে সোজা প্রেমিকার ঘরে হাজির!

দেখতে পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে বারওয়েলের আরদালি। মিঃ ফ্রান্সিসের কাছে সোজা এসে জানাল—সাহেব, ফিলিপ সাহেবকে একেবারে হাতে নাতে ধরে ফেলেছি, তাঁকে একতলার ঘরে দরজা বন্ধ করে দিয়ে আটকে রেখেছি।

শুনেই উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে চলে গেলেন মিঃ গ্র্যান্ড। কিন্তু তালা খুলতেই প্রবল বেগে ধাক্কা দিয়ে নাগর ফ্রান্সিস একেবারে ছুটে বাইরে গিয়ে একেবারে হাওয়া।

খবরটা গিয়ে পৌঁছে গেল হেস্টিংস-এর কানে। এতদূর স্পর্ধা। প্রেমে তাঁর পরাজয় হয়েছে ঠিকই, তাই বলে সেই হার মেনে নিতে তিনি নারাজ—লড়কে লেঙ্গে। কিন্তু লড়ার সুযোগ আসতে আসতে দেড়টা বছর গড়িয়ে গেছে। ১৭ আগস্ট ১৭৮০ সালে প্রায় ঢোল সহরত করে সবাইকে জানানো হয়েছে—এদিন সকাল সাড়ে ছ'টায় দু'জনের ডুয়েল লড়াই হবে। ময়দানে যুযুধান পক্ষ হাজির—ফ্রান্সিসের সহায়ক হিসেবে হাজির ওয়াটসন, হেস্টিংসকে সহায়তা দেবেন লেফ্‌টেন্যান্ট কর্নেল পিয়ার্স।

বেলভেডিয়ার হাউসের বাগানেই লড়াই। দু'দিক থেকে দু'জন—কদম কদম বাড়িয়ে চলেছেন। তারপর সঙ্কেত বাঁশি বাজতেই দু'পক্ষই রিভলবার বের করে গুলি চালাতে উদ্যত। ফিলিপ গুলি ছুঁড়লেন—শুধু একটা নিষ্ক্রিয় শব্দ শোনা গেল। বারুদ স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে—গুলি আর ছুটল না। ক্লেমেন্সি হেস্টিংস সহসা উদার হয়ে ফিলিপ্‌কে আরও একটা সুযোগ দিলেন—এবার দু' পক্ষেরই গুলি ছুটল। ফিলিপের গুলি হেস্টিংসের শুধু কানের লোম স্পর্শ করল কিন্তু হেস্টিংসের গুলি সোজা বিঁধে গেল ফিলিপের ঘাড়ে যন্ত্রণায় কাতরে উঠলেন তিনি। হেস্টিংস ছুটে গেলেন তাঁর দিকে—ঈশ্বর, তিনি তো এতটা চাননি। ঝুঁকে পড়ে তাঁর গায়ে মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন। ওয়াটসন ছুটে গিয়ে প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে কোথা থেকে একটা ব্যাণ্ডেজ নিয়ে এলেন। কেউ একটা পাল্কির ব্যবস্থাও করে ফেললেন। রক্তাক্ত ফিলিপ পাল্কিতে উঠতে চাইছিলেন না। তখন আদি গঙ্গায় জোয়ারের বান ডেকেছে—তা পার হয়ে শহরে আর যেতে পারল না পাল্কি। যা প্রত্যাশিত ছিল তাই হল?

ফলে যখন বেলভেডিয়ার ন্যাশনাল লাইব্রেরি হল তখন এর দ্বাররক্ষক নৈশপ্রহরী বীরবাহাদুর একবার সন্ধ্যার অন্ধকারে বাগানের মধ্যে একটা পাল্কিকে চলে যেতে দেখেছিল। তার দরজা দুটো খোলা ছিল। কোণা থেকে চাঁদের আলো

এসে পাল্কিটার ভিতরে পড়েছিল। আর তাতেই বীরবাহাদুরের নজরে এসেছিল—একটা সাহেব পাল্কির মেঝেতে শুয়ে একটা হাত বাইরে ঝুলছে, আর তার কাঁধ থেকে রক্ত বেরিয়ে এসে তার গোটা কামিজটাকে লালে লাল করে দিয়েছে। আলোটা উঁচিয়ে ধরতেই পাল্কিটা নিমেষে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছিল। বীরবাহাদুরের নিজেরই বিশ্বাস হয়নি, সে কী দেখেছিল! ফ্রান্সিস ফিলিপের সেই গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহটা, এতকাল পরেও। তবে কি বাগানটায়...

সেদিন বীরবাহাদুর নিজের কোয়ার্টারের সামনের চত্বরে খাটিয়া পেতে শুয়েছিল উত্তর গেটের দিকে মুখ করে। শীতের আমেজটা ছিলই, তাই কম্বলটাকে গায়ে জড়িয়ে একমনে রামধুন গাইছিল। কিছুক্ষণ আগেই হাতের কোৎকাটাকে ঠুকে ঠুকে গোটা চত্বরটা রাউণ্ড দিয়ে এসেছে—জনমানবটি নেই। কেবল পাতা পড়ার আওয়াজ—পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে। সেই আওয়াজ তার ঢুলুনিটার পাশাপাশি ঘটছিল। হঠাৎ মনে হল কারা যেন আসছে। তাদের পায়ে একটা ছন্দ—চলার ছন্দ। সেই হিমজড়ানো রাতে বীরবাহাদুর যেন ঘামতে শুরু করল। চোখের সামনে দিয়ে একটা পাল্কি চলে যাচ্ছে—তারই খোলা দরজা দিয়ে একটা রক্তাক্ত লাশকে দেখতে পেল। চিৎকার করে উঠল, সহকর্মী রক্ষীরা ছুটে এল। বীরবাহাদুরের দাঁতে দাঁত লেগে গেছে।

পালকিতে কি ফ্রান্সিসের সেই লাশটা। এতদিন পরে? পড়াশুনোর শেষে রাতে যখন ফিরে আসি, এত আলোর মধ্যেও কী গা ছমছম করে না?

হাইকোর্টের চত্বরে গলাকাটা ভূত

কলকাতা হাইকোর্টে প্রেতাত্মার ঘোরাফেরা নিয়ে নানান মুখরোচক গল্প আছে। অন্তত দুটো কাহানি তো বেশ যাকে বলে মুখরোচক তাই—এক সময় লোকের মুখে মুখে ফিরতো এ-সব গল্প। গল্প বলিয়েরা এই উচ্চ আদালতেরই কর্মী ছিলেন। এখন দু-চারজন পুরনো কর্মীকে জিগ্যেস করে দেখেছি, তাঁরা বলেছেন—আমরা শুনেছি বটে, তবে নিজের চোখে দেখিনি। ভূতনাথ অবশ্য একদিন বলেছিল...। ভূতনাথের খোঁজ নিতে গিয়ে শুনি—তিনি কবেই 'ভূত' হয়ে গেছেন। গল্প বলছি বটে, কিন্তু যাঁরা এ-সব বলে গেছেন তাঁরা যে 'চাক্ষুষ' প্রমাণ দিয়ে গেছেন—তাকে উড়িয়ে দিতে পারি—এমন সাধ্যি নেই। কারণ তাঁরা অশরীরী, কখন কী যে ঘটে যায়...! তার চেয়ে সেই শোনা ইতিহাসটাই আবার শোনানো যাক। ক্যালকাটা হাইকোর্টের ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্টস-এ যখন এসব কথা ঠাঁই পেয়ে গেছে, তখন 'আঁখুরে' প্রমাণ থেকে সেই ভৌতিক কথাগুলি উপহার দেওয়া যেতে পারে।

হাইকোর্টের দোতলায় যে লাইব্রেরিটি আছে তার নাম অ্যাডভোকেট লাইব্রেরি। তার পাশেই স্টেটমেণ্ট সেকশন। ভজহরি পৈতুণ্ডি মশায় একমনে কাজ করে চলেছেন, অফিসে ছুটি হয়ে যাওয়ার অনেক পরেও। শীতের রাত্রি, ঘড়িতে আটটা ছুঁই ছুঁই। পাশে বসে আছেন তাঁর সহকারী মনমোহন ঘোষাল মহাশয়। দু'জনেই একই দিকে থাকেন। একসঙ্গেই ফেরেন। বড়বাবু ভজহরির কাছে এসে মনমোহনবাবু বললেন,

—স্যার, একটু আসছি ছোট বাইরে থেকে।

চশমাটিকে নাকের ডগায় ঝুলিয়ে তার ফাঁক দিয়ে বড় বড় গোল গোল চোখ দু'টোকে আরও গোলাকার করে পৈতুণ্ডি মশায় কী যেন ঠাহর করে দেখতে লাগলেন। তারপরে বললেন জজসাহেবদের এজলাসের দিকে যে পেচ্ছাবখানা আছে, সেদিকটায় যেও না বাপু, এই স্টেটমেন্ট সেকশনে পিছনের দিকে যে আড়ালটা আছে সেখানে যাও। দরজার পাল্লা নেই বটে সেখানে তবে রাত-বিরেতে তো সেখানে আর লোকজন যাচ্ছে না।

—আজ্ঞে হাঁ, তাই যাবো।

বললেন বটে 'আজ্ঞে' কিন্তু ওই নরককুণ্ডের দিকে যেতে তাঁর এতটুকু ইচ্ছে হল না। হেঁটে জজসাহেবের এজলাসের পাশের টয়লেটেই যাবেন ঠিক করলেন। বিশাল করিডরটা, শেষটায় কে দাঁড়িয়ে আছে, অপর প্রান্ত থেকে তা নজর করে দেখাটাই মুশকিল। সেই লম্বা করিডর ধরে স্থূল দেহটাকে টেনে নিয়ে যেতে রাতের

নির্জনতায় তাঁর পায়ের ভারি আওয়াজটা স্পষ্ট যেন নিজের কানেই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। এবং তাতেই যেন গা ছমছমানিটা বেড়ে গেল। কেন যে বড়বাবু ফুট কেটে বলে দিলেন—ওদিকে যেও না হে। হঠাৎ নিজের পায়ের আওয়াজ ছাপিয়ে আর একটা আওয়াজ করিডরের শেষ প্রান্ত থেকে ভেসে আসতে লাগল—ঝম্‌ঝম্ ঝম্‌ঝম্...।

কান পাততেই ঘোষাল মশায়ের মনে হল কেউ যেন তোড়া পরে হাঁটছে...ঝম্ ঝম্...ঝম্ ঝম্...। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। হঠাৎ করে মনে হল তাঁর বুকের সমস্ত রক্ত জল হয়ে গেছে। আর তারপরেই বুকের স্পন্দনও যেন একেবারে থেমে গেছে। একটা অর্থহীন নিষ্পলক চোখে তিনি দেখতে পেলেন জাজেস কোর্টের প্রায়ান্ধকার করিডর ধরে একটা মেয়ের কবন্ধ মূর্তি যেন হেঁটে আসছে, তারই প্রতিটি পদক্ষেপে আওয়াজ উঠছে ঝম্ ঝম্...ঝম্ ঝম্...

এবং আরও অবাক চোখে মনমোহনবাবু দেখলেন—তাঁকে দেখতে পেয়েই সাজগোজ করা কবন্ধ মেয়েটি ঘুরে দাঁড়াল এবং মিলিয়ে গেল জাস্টিস সৈয়দ আমির আলি সাহেবের স্মৃতিফলকটার আড়ালে। 'কৌন হ্যায়' বলতে গিয়েও তাঁর গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বের হল না। চকিতে তার মনে পড়ে গেল হাইকোর্টের পাহারাদার ত্রিবেণী ওঝার কথা। বাবু খুব খতরনাক ওরা, হর আঁধিয়ার রাতে ওরা ফিন ফিন করকে আসে আউর মিলিয়ে ভি যায়! ভাবতে ভাবতেই ঘোষাল মশায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

এদিকে ঘোষালের পো-র আসতে দেরি দেখে পৈতুণ্ডিমশায় কোনও এক অজানা আশঙ্কায় সিট ছেড়ে উঠে করিডরে এসেই দেখেন অনতিদূরে ঘোষাল পড়ে রয়েছে আর একটা দারুণ ঝলমলে ঘাঘরা-পরা মেয়ে, সে কবন্ধ, হাত দিয়ে ঘোষালের মুখে জলের ছিটে দিচ্ছে। পৈতুণ্ডিকে দেখেই সে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। রাম নাম জপতে জপতে তিনি কোনক্রমে ঘোষালের হাত ধরে তাঁকে উঠিয়ে নিজের সেকশনে নিয়ে এলেন। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাইয়ে পাহারাদারকে ডেকে ঘরে তালা দিয়ে নিচে নেমে একটা পথ চলতি টাঙ্গা ডেকে উঠে বসলেন। পরের তিনদিন অফিসে ছুটি নিতে হয়েছিল তাঁকে।

কে ওই কবন্ধ মহিলা দামি সাজসজ্জায় এত রাতে ঘুরে বেড়ায়। হাইকোর্টের দেওয়ালগুলো এখন আর ফিস ফিস করে কিনা জানি না। কিন্তু এখানেই জজ সাহেবের এজলাসে একটা দরখাস্ত জমা পড়েছিল, যার বয়ানটা ছিল অনেকটা এইরকম—'হামার শরীল কিছু সময় ধরে ভালো যাইতেছে না। মহামান্য আদালত নজদিগে হামারা নিবেদন হ্যায় কি, কমন প্রস্টিটিউটের রেজেস্‌টিরি বহি থেকে আমার নাম কাটিয়া দেওয়া হউক।'

কে এই কমন প্রস্টিটিউট—সাধারণ গণিকা? এতো সাধারণ নয়, যে এমন দরখাস্ত করে সে তো সাধারণ বেশ্যা হতে পারে না। সত্যিই সে সাধারণ ছিল না।

হাজার খরিদ্দার মনোরঞ্জন করতে পারে যে, আপন রূপের ছটায় হাজার লোকের দিল যে লুটে নিতে পারে সে আপাতদৃষ্টিতে বারোয়ারি নারী হতে পারে। কিন্তু বেশ্যাদের যে ভালবাসতে নেই, এই ফর্মুলাতে সে শেষ অবধি আস্থা রাখতে পারেনি—তাই অসাধারণ বেশ্যা বইকি! নইলে শরীর খারাপের অজুহাত তো নেহাতই একটা বাহানা। আসলে সে মন দিয়ে ফেলেছে মাঝারি-মাপের এক বেওসাদার শালিখরামের কাছে। ঠিক করেছে শালিখরামকে সে বিয়ে করবে। আর পাঁচটা ঘরোয়া বড়দের মতো সেও স্বামী চায়, সংসার চায়, আর সন্তান তো চায়ই। ঘেন্না ধরে গেছে তার এই হাজারভাতারির জীবন। কতজনকে মন দেওয়ার অভিনয় সে করবে? তারপরে যখন যৌবনে ঢল নামবে তখন কী করবে? এত যে ভালবাসার ছল করে মরদ মানুষগুলো—তার দিকে ফিরেও তাকাবে না। বুড়ো বয়সে স্বামীর কোলে মাথা রেখে মরার যে কী সুখ সে ওই গেরস্ত গিন্নিদের দেখে বুঝে নিতে পেরেছে। সতী-নারীর মতো ঘর-সংসার করার ইচ্ছে থেকেই পণ্যানারী, সোনাগাছির ডাকসাইটে মক্ষীরানী নিস্তার রাউত কোর্টে ওই রকম একটা দরখাস্ত জমা দিয়েছিল তার উকিলের মারফতে।

গণিকার ঘরসংসারের বাসনা নতুন কথা নয়, কিন্তু হাইকোর্টের রেজেস্ট্রি বই থেকে তার নাম কেটে দেওয়া হোক—এমনতর আবেদন নতুন তো বটেই। আবার এও নতুন নয় যে কারও বা কয়েকজনের ভাল লাগার গণিকাকে কোন একজন ফুসলে নিয়ে তার বাঁধাবাবুটি হয়ে বসবে, নারী মাংসখোর ওই মিন্‌সেগুলো তো সইবে কেমন করে? অতএব....নিস্তার রাউত দরখাস্ত করেছে অতএব, তার আবেদন মতো কোর্ট সমন জারি করেছে নিস্তারের ওপর। শরীর খারাপের দোহাই —তাও গণিকার। মেডি এগজামিনের জন্যে নিস্তারকে কোর্টে হাজিরা দিতে হবে। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে আবেদনকারিণী হাজিরা দিলে না। তবে কি আর সবাই বিদায় নিলেও গভীর রাতে, হয়তো শেষ রাতে শালিখরামের অঙ্কশায়িনী হয়ে তার বাহুবন্ধনে অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছিল। আর তাতেই সমন পেয়েও আসতে পারেনি কোর্টে নির্দিষ্ট সময়ে।

সোনাগাছির ব্যাকরণ এই সব নিয়ম মেনে চলে না। তখন সেখানে একটা দারুণ তৎপরতা দেখা দিয়েছে। নিস্তারের অন্যবাবুরা তখন এককাট্টা হয়েছে শালিখপাখির গলাটি টিপে ধরতে। শালিখকে তারা অনেক করে বোঝাল—খারাপ মেয়েরা কখনও ঘর করে না হে। শালিখের তখন টাকার গরম, আর ঘর সংসার না করুক একটা ডাকসাইটে পরির মতো সুন্দরী মেয়ে তার ঘরের বিছানায় তার আশ মেটাচ্ছে—এই ভাবনাতেই মশগুল। সহখরিদ্দারদের পরামর্শ সে কানেই তুলল না। আর তাতেই তাদের মাথায় খুন চেপে গেল।

নিস্তারের সঙ্গে খুব মাখামাখি ছিল এমন এক জমিদার পুত্তুরকে দিয়ে শত্তুরের মুখে ছাই দিতে লাগল তারা। জমিদার নন্দন সোজা থানায় গিয়ে হাজির। পুলিসে

এজাহার দিয়ে জানাল যে শালিখরামটা নেমকহারাম। সে রাঁড়খোর নিস্তারকে লাগিয়ে নিস্তারকে বক্‌শিস-ইনাম- নজরানা হজম করে বসে আছে। নিস্তার হারামজাদিটাও কি কম? সে শালিখরামকে বিয়ে করবে বলে তাদের দেওয়া সব কিছু শালিখরামকে দিয়ে বসেছে। এখন রেজিস্টার্ড বেশ্যাটা খাতা থেকে নাম কাটিয়ে সতী হয়ে তার টাকা নিয়ে সট্‌কে যেতে চাইছে—হুজুর, এর একটা বিহিত করে বসুন। দারোগাবাবুর বাঁ হাতের একটা মোটা খাম চালান হয়ে গেল পকেটে। জমিদারনন্দন বুঝতে পারলেন— দাওয়াইয়ে কাজ হবে এ...।

হঠাৎ করে একদিন শালিখরামের বাড়ি সার্চ করে বসলো পুলিস এবং অভিযোগ মতো তার বাড়ির নিস্তারকে দেওয়া জমিদার পুত্রের সব গয়নাগাঁটি, টাকাকড়ির হদিশ পেয়ে গেল। সকালবেলা স্নান করে 'চুল আঁচড়াচ্ছিল নিস্তার। খবর এল জমিদারপুত্তুর তার আদরের গুঁইবাবুর দেওয়া মালপত্র শালিখরামের বরানগরের বাড়ি থেকে পুলিস পেয়ে গেছে। নিস্তারই যে সব তাকে দিয়েছে, শালিখরাম যে চুরি করেনি—এই সত্যটা যে পুলিসের কাছে বলার জন্যে বের হতে চাইল। কিন্তু শুনল যে, পুলিস বমাল পেয়েই একটুও দেরি না করে শালিখরামকে গ্রেপ্তার করে আদালতে নিয়ে গেছে।

পোড় খাওয়া নিস্তার রাউতের মাথা ঘুরতে লাগল। তার চোখের সামনে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে যেতে লাগল তাঁর সংসার করার বাসনার প্রাসাদ। আর তো ক'দিন পরেই আদালতে তার নাম কাটা হয়ে গেলেই, সে বিয়ে করে সংসার পাতবে। আদালত বলল—শুধু শালিখরামকে ধরলেই হবে না, নিস্তারকেও কোর্টে হাজিরা দিতে হবে। একবার তাকে সমন পাঠিয়েও আদালতে তাকে আনা যায়নি। আবার তাকে সমন পাঠাও। আগের ব্যাপারে নিস্তারই তার ঘৃণ্য ব্যবসা থেকে নিস্তার পেতে দরখাস্ত করেছিল। এখন সেই নিস্তারের বিরুদ্ধে আদালতই চুরির মামলায় হাজির হবার সপিনা পাঠাল।

দু' দুবার সমন গেল—তবুও হাজির হল না নিস্তার। কী হয়েছে তার? ১৮৮১ সালের এই ইতিহাসের কথা মনে রেখে কী হয়েছিল তার এই প্রশ্ন আজ হয়তো কেউ করে না। কিন্তু কিছু তো একটা হয়েছিল। যেটা হয়েছিল—তা পুলিস তদন্ত করে দু'দিনের মধ্যেই জানতে পারল যখন শালিখরামের বরানগরের বাড়ি থেকে একটা পচা দুর্গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দরজা ভেঙে পুলিস দেখল নিস্তার রাউতের দেহটা শালিখরামের শোবার ঘরে মেঝের উপরে পড়ে আছে। আর তার মুণ্ডুটা একেবারে লোপাট—পুলিস তল্লাসি চালিয়ে যেটা উদ্ধার করতে পারেনি। পরনে বাঈজির ঘাগরা, পায়ে রুপোর তোড়া। মেঝেতে রক্তের চাপ—শুকিয়ে কালো হয়ে গিয়েছে। গোটা শরীরে মাছি ভন্ ভন্ করছে।

দেহটাকে মর্গে পাঠিয়ে পুলিস করোনারের রিপোর্ট আদালতে জমা দিলে।

ঘটনাটি ঘটেছিল ১৮৮১ সালের ২ জুন। আধুনিক সময়ে হাইকোর্টের

পশ্চিমাংশে, যেটাকে বলে সেন্ট্রাল ব্লক, সেখানে জাজেস করিডরের ঠিক নিচে একেবারে নিচের তলায় ছিল হাজতটা। মোটা মোটা রড দেওয়া দু-একটা ঘর আজও দেখতে পাওয়া যায়।

হাইকোর্টে যাঁরা পরে চাকরি করতে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা রাত্তির পর্যন্ত থেকেছেন অথবা যাঁরা নৈশ প্রহরী—তাঁদের মধ্যেই অনেকে শুনেছেন তোড়া পরে হেঁটে যাওয়ার শব্দ ঝম্‌ঝম্‌ ঝম্‌ঝম্‌। মনমোহনবাবু তো ওই আওয়াজটাই শুনেছিলেন। আর দেখেছিলেন একটা কবন্ধ নারীর মূর্তি।

সেকালের লোকেদের মনের মধ্যে একটা বিশ্বাস জন্মে গেছিল যে শালিখরামের সন্ধানেই সেদিনও ওই গলা-কাটা নিস্তার রাউতের প্রেতাত্মা আজও ঘুরে বেড়ায় ওই হাজতের শক্ত গরাদগুলো পার হয়ে। ভালবাসা তবে কি পরজন্মেও অথবা অশরীরী জীবনে প্রবাহিত হয়ে আসে। সে তো মমতাময়ীই হতে চেয়েছিল—নইলে হতচেতন মনমোহনবাবুর চেতনা ফেরানোর জন্যে জলের ছিটে দিতে যাবে কেন? এ কি স্বপ্ন না মায়া? —স্বপ্নো নু মায়া নু। প্রেতাত্মাও কি এমনি করেই সান্নিধ্য সুখ পেতে চায়। কে দেবে উত্তর!

হাইকোর্টে ভূতের ঘোরাফেরা নিয়ে আর একটি গল্প বলার আগে একটা জরুরি কথা জানানোর দরকার। এখানে কাজে-অকাজে বহু মানুষ প্রতি কাজের দিনে আসেন। ছুটির দিনেও কিছু মানুষ তো থাকেনই। এই বই পড়ে পাছে কেউ অস্বস্তিবোধ করেন—সেজন্যে আগে-ভাগে জানিয়ে রাখি যে এখানে যে-সব অশরীরী আত্মারা বসবাস করতেন (এখনও করেন কিনা, হলফ করে বলতে পারবো না)—তাঁরা কোনও কারণেই কাউকে ভয় দেখাননি কোনদিনই। তাঁরাও তো জানেন এটা আদালত, অকারণে হুমকি দিলে দায়রায় সোপর্দ হবার সম্ভাবনা থাকবে এবং কবি তাপিস-এর মতো ফাঁসির দড়িতে ঝুলে যাবার সম্ভাবনা আছে। বিচারকদের অবশ্য তাঁরা 'মি লর্ড' বলতে চাইতেন কিনা—সে বিষয়ে আদালতের পুরনো নথিতে তেমন কিছুর উল্লেখ পাওয়া যায়নি।

আঠারো শতকের শেষের দিকে কবি তাপিসকে হাইকোর্টে সোপর্দ করেছিল স্বয়ং ব্রিটিশ সরকার। সে কথা সবিস্তারে বলার আগে হাইকোর্টে বছর পঞ্চাশেক আগেও স্ট্যাম্প ভেন্ডাররা যেখানে বসেন—সেখানের স্ট্যাম্প-ভেন্ডার বটকৃষ্ণ-বাবুর অভিজ্ঞতার কথাটা বলে রাখা দরকার। তখন হাইকোর্টের কাজ শেষ হয়ে গেছে। বিচারকেরা তো অনেক আগেই চলে গেছেন, আইনজীবীরাও একে একে চলে যেতে আরম্ভ করেছেন। শীতের সন্ধ্যা, তাড়াতাড়িই সন্ধে এসে গেছে। কর্মচারীরাও পাততাড়ি গোটাতে শুরু করেছেন। বটকৃষ্ণবাবুও তাঁর কাগজপত্র বাক্সে রেখে বড় থামটার সঙ্গে একটা বড় শিকল দিয়ে বেঁধে আলো-আঁধারি করিডরটায় কয়েক কদম মাত্র এগিয়ে গেছেন—হঠাৎ শুনতে পেলেন কে যেন ওই কোণাটায় দাঁড়িয়ে একটা কুঁজো থেকে জল ঢেলে খাচ্ছে! রাম, রাম, বলে দুটো

হাত জোড়া করে কপালে ঠেকিয়ে কী সব যেন উচ্চারণ করে চলেছেন বটকৃষ্ণবাবু। এই শব্দ শোনা তো তাঁর নতুন কিছু নয়। কতদিনই এমন সন্ধ্যাতে এই পিপাসার্ত একটা আত্মাকে এমনি করেই পিপাসা মেটাতে শুনেছেন তিনি।

কার আত্মা এমন পিপাসাকাতর? কে তিনি?

এর উত্তর জানতে হলে সে সময়ের ভারতীয় রাজনীতির একটা সামান্য প্রসঙ্গ জানাতে হবে। কারণ এই রাজনীতির পরিণতিতেই ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় একজন কবি তাপিসকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হয়েছিল। কবি তাপিস, বিদ্রোহী কবি বলাই ভাল। তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাদের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি হায়দরাবাদের তৎকালীন নিজাম ও শাসনকর্তার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ব্রিটিশদের বিরোধিতা করেছিলেন। হাতে হাতেই তার ফল পেয়েছিলেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করার পর এই হাইকোর্টেই তার বিচার করা হয়। এখানের হাজতেই তাঁকে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। বেচারা একটু জল পান করতে চেয়েছিলেন—তাই প্রতিদিনই একটু একটু করে জলের মাত্রা কমিয়ে দিয়ে তাকে শুকিয়ে কাঠ করে দেওয়া হয়েছিল। ভারী সুন্দর দেখতে ছিলেন কবি তাপিস, এক্কেবারে ফুলবাবুটি—ছিপছিপে দোহারা তীক্ষ্ণনাসা আর মুখে হাসিটি লেগেই আছে। আর যখন ফাঁসিকাঠে তাকে ঝোলানো হল—একটা শক্ত শুকনো কোটরগতচক্ষু প্রায়-নিস্পন্দ মানুষকে ঝুলিয়ে মারতে জহ্লাদকে কোনও কষ্টই করতে হয়নি।

সেই পিপাসার্ত আত্মা রাতের বেলায় এক অদৃশ্য জলপাত্র থেকে জল ঢেলে ঢেলে তাঁর তিয়াস মিটিয়ে ফিরতো এই হাইকোর্টের নিশীথ চত্বরে।

রেডিও স্টেশনের ভূত-সম্প্রদায়

কলকাতার বড় একটা ভাগ্য হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে পরেই—ভারতের মধ্যে দ্বিতীয় রেডিও স্টেশন পাবার। সেটা ঘটার বছর দুয়েক আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. শিশিরকুমার মিত্র তাঁর বিভাগের ছোট্ট ঘরে একটা ট্রান্সমিটার বসিয়ে এমনতর উদ্যোগের সূচনা করেছিলেন।

'ক্যালকাটা কলিং' এই মহৎ ধ্বনিটি প্রথমবার প্রচারিত হয়েছিল ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬ আগস্ট তারিখে যে বাড়িটি থেকে সেটার অবস্থান ছিল গারস্টিন প্লেসের এক নম্বর বাড়িতে। এই গারস্টিন প্লেস হল এখনকার বিবাদী বাগ ছাড়িয়ে পশ্চিমদিকে যে ছোট আদালত—তার উল্টোদিকে দক্ষিণমুখো একটা রাস্তা। জর্জ চার্চের কবরখানার গা-লাগোয়া। এই রাস্তার উপর এক নম্বর বাড়িটার অবস্থান ছিল বেশ নির্জন একটা জায়গায়—পাশেই জর্জ চার্চের বিশাল বাগান। আশেপাশে দু-একটা বাড়ি ছিল বটে তবে সেখান থেকে খুব একটা গোলমাল-আওয়াজ আসত না। এই বাড়িটা ছিল বেশ পুরনো। সেখানে স্টুডিও বানাবার আগে তাকে বেশ করে সারিয়ে-সুরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তিনতলা বাড়ি—প্রথমে এটার একতলাটা ফিপসন অ্যাণ্ড কোম্পানির দখলে ছিল বলে দোতলা আর তিনতলাটাই ভাড়া নিয়েছিল ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি। দোতলায় বেশ বড়সড় স্টুডিওতে গানবাজনা আর নাটক প্রচারের ব্যবস্থা, তিনতলাতেও একটা স্টুডিও ছিল বটে—তবে বেশ ছোট ধরনের। এখান থেকে বাজানো হত রেকর্ডের গান, প্রচার করা হত সংবাদ আর বক্তৃতা। পরে গোটা বাড়িটাই বেতারের দখলে আসার পর কন্ট্রোল রুম তেতলা থেকে নিচে নামিয়ে আনা হয়। বেতার কেন্দ্রের প্রথম দায়িত্বে ছিলেন পি. সি. ওয়ানিলক সাহেব, পরে পুরো দায়িত্ব পান একসময়ের পার্ট-টাইমার স্টেপল্টন সাহেব।

কলকাতার ভুতুড়ে বাড়িগুলোর মধ্যে পয়লা নম্বর ছিল এই একনম্বর গারস্টিন প্লেসের বাড়িটা। এই নিয়ে অনেক কথা আমাদের শুনিয়ে গেছেন এখনকার আকাশবাণী, আগেকার ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানির প্রথম দিককার কর্মী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র—মহিষাসুরমর্দিনীর সেই বিশ্বখ্যাত প্রভাষক। তখন দায়িত্বে আছেন ওয়ালিক সাহেবই। তাঁর অফিসে তিনি চেয়ারে বসে কী সব যেন ভেবে চলেছেন। তাঁর সামনে জোড়হাতে দাঁড়িয়ে কোম্পানির অন্যতম কেয়ার টেকার, সাহেবের পেয়ারের জগমোহন। বিহার থেকে এখানে এসেছে। চেহারা বেঁটে, কিন্তু দেখলেই

বোঝা যায় তাকত আছে লোকটার। কী হয়েছে এমন যে সাহেবের সামনে এমন জোড়হাতে দাঁড়িয়ে জগমোহন। সাহেবদের কুর্নিশ করা নতুন ব্যাপার নয়। কিন্তু জোড়হাতের ভঙ্গিমায় কেমন যেন একটা মিনতি—যা চাইছে সে তা যেন চাইবার নয়। কথা বলতে বলতে চোখ দুটো যেন মাঝে মাঝে ঠেলে বাইরে আসতে চাইছে। ইনিয়ে বিনিয়ে কী সব ভয়তরাসে কথা সে বলছিল।

বলেছিল—সে রাতে সে উপরের সব ঘরে চাবি লাগিয়ে একেবারে নিচের তলায় সিঁড়ির নিচে রাখা চৌপায়াতে শুয়ে গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিল আর পাঁচটা রাতের মতোই। কিন্তু সে রাতেই প্রথম সে শুনতে পেয়েছিল তিনতলার কাঠের সিঁড়ি দিয়ে বুটপরা পায়ে ভারি কদমে কে যেন নেমে আসছিলেন—আওয়াজ উঠছিল খট্ খট্ খট্। আচমকা ঘুম ভাঙতেই সে রাম রাম বলে খাটিয়া থেকে উঠে গায়ে গামছাটা জড়িয়ে নিয়েছিল। অনেকদিন থেকেই তার দেশোয়ালি ভাইদের কেউ কেউ জিগ্যেস করেই যেত—ও কোঠিটাতে তুই কি জিনপরি কিছু দেখতে পাস্‌নি? রাম, রাম—ওরা খুব খতরনাক আছে, গর্দান মট্‌কিয়ে একেবারে সব খুন পিয়ে লেবে!

জগমোহন হাতের গুলিতে হাত দিয়ে বলত—জগমোহন ওদের একেবারে দেখে লিবে। কিন্তু আজ তো নিজের কানে শুনতে পাচ্ছে খট্-খট্, খট্-খট্! তবে কি কোনো চোর বদমাশ কোঠিতে ঢুকে পড়েছে। পড়তেই পারে। এখানে কত কত দামি দামি যন্তরপাতি আছে। এত বড় তিনতলা বাড়িতে আর একটাও আদমি নেই। আলোটা জ্বেলে রাম নাম উচ্চারণ করতে করতে সাহসে ভর করে জগমোহন সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল লাঠিটা ঠুকতে ঠুকতে। ওদিকের বুটের আওয়াজটা থেমে গেছে ততক্ষণে। যতদূর চোখ চলে কাউকে দেখতে পেলে না সে।

কিন্তু তেতলা থেকে কাঠের ঘোরানো সিঁড়িটা বেয়ে নামতে নামতেই—জগমোহন বলছিল ওয়ালিক সাহেবকে—তার পেটের নাড়িভুঁড়ি একদম পত্থরকা মাফিক হয়ে গেছিল। একতলার কাছাকাছি, সে একটুও গল্‌তি করেনি, নিজের আঁখসে সে দেখতে পেয়েছিল একটা অদ্ভুত দৃশ্য। যে খাটিয়াতে সে শুয়েছিল, সেটা যেন সিঁড়ির নিচের মেঝেটা থেকে শূন্যে দুলতে দুলতে চলেছে। যেমন করে মৃতদেহ খাটিয়াতে চড়িয়ে শ্মশানে নিয়ে যায় মড়া-পোড়ানো শববাহকদের দল, তেমনি করে অদৃশ্য হাতে ক'জন যেন তার খাটিয়াকে ধরে নিয়ে উপরের দিকে উঠে যেতে চাইছে। বাড়িটার বাইরে ক'জন পাহারাদার আছে তা জগমোহন জানতো। সে স্পষ্ট দেখতে পেল খাটিয়াতে যেন একটা আবছা ছায়ামূর্তি শুয়ে। কোনক্রমে সিঁড়ির নিচের বড় দরজার আগলটা খুলে জগমোহন রাম নাম জপ করতে করতে বাইরে এসে চিৎকার করে উঠল—এ ধোনিয়া রে....ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ, গলা দিয়ে যেন আওয়াজ বের হতে চাইছে না। হাতের লাঠিটা পাশের দেওয়ালে আঘাত করে সে রাম ধোনিয়াদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইল।

কিন্তু কিছু হবার আগেই সে দরজার সামনের বাঁধানো চাতালটায় চেতনা হারিয়ে পড়ে গেল। তারপরে তার আর কিছু মনে নেই। ধোনিয়ারা লোটা করে জল নিয়ে এসে তার চেতনা ফিরিয়ে তাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে এসে তার খাটিয়াতে শুইয়ে দিতেই আবার সে চেতনা হারিয়ে ফেলেছিল।

আরও কত কী সব সে বলেছিল। ওয়ালিক সাহেবের পাশে বসেছিলেন ইউরোপিয়ান প্রোগ্রামের বাঙালি ইনচার্জ মিঃ ব্যানার্জি। তিনিও যেন গোগ্রাসে জগমোহনের মনোহর কহানিয়া শুনছিলেন। কহানি শেষ হতেই ওয়ালিক সাহেবের দিকে ফিরে চোস্ত ইংরেজিতে বললেন— ইফ ইউ ডোন্ট মাইণ্ড স্যার, জগমোহন নিশ্চয়ই সে রাতে গাঁজাতে একটু বেশি পরিমাণে টান দিয়েছিল—তাতেই—।

ওয়ালিক সাহেব এত সহজে জগমোহনের কথা উড়িয়ে দিতে পারেননি। এই এক নম্বরের বাড়িটাতে ভূতের উপদ্রব নিয়ে কানাঘুঁষো তিনি অনেকদিন ধরেই শুনে আসছিলেন। জগমোহনের কথায় সে সব কথাই তাঁর স্মৃতিতে ভেসে উঠেছে—নো, নো, মিঃ ব্যানার্জি— এই বাড়িটা তো গড়ে উঠেছে একটা সিমেট্রি। একটা কবরখানার ওপরেই, সে কথা আমি আগেই শুনেছি। এ দেশের ঐতিহাসিক হরিহর শেঠ তো পরে তাঁর 'কলিকাতা পরিচয়' বইতে স্পষ্টই লিখে গেছেন—'জব চার্নকের কলিকাতা প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বে বর্তমান সেন্ট জন গির্জার পার্শ্ববর্তী স্থানে সাহেবদের একটি গোরস্থান ছিল।' ওয়ালিক সাহেব এই তথ্য শুনেছিলেন কারো কাছে। তাই উড়িয়ে দিতে পারলেন না। জগমোহনকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন— তুমি নোকরি ছেড়ে দিও না জগমোহন—আমি আরও একজন কেয়ার টেকার দিচ্ছি তোমার সঙ্গে।...

ভূতের সঙ্গে ঠাট্টা করেছিলেন আর জগমোহনকে গাঁজাখোর বলে তার গাঁজাখুরি গল্পকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন ইউরোপিয়ান প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ মিঃ ব্যানার্জি—আমরা তা শুনে এসেছি। তার ফল তিনি প্রায় হাতে হাতেই ভোগ করেছিলেন এই এক নম্বর গারস্টিন প্লেসের বাড়িটাতে। সেদিন তার প্রাণপাখি খাঁচা ছেড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল।

তখনও দেশ স্বাধীন হতে বছর দু'য়েক বাকি। ডিসেম্বরে হাড়কাঁপানো শীত পড়েছিল সেবার। সারা গারস্টিন প্লেসের অঞ্চলটা শীতের ঘন কুয়াশায় একেবারে ছেয়ে গেছিল—কাছের লোককে ঠাহর করা যাচ্ছিল না। দোতলার পাঁচ নম্বর স্টুডিওর সামনের জোরালো আলোটাকে পর্যন্ত টিমটিমে পনেরো ওয়াটের আলো বলে মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সাদা চাদরে মোড়া একটা প্রেতের চোখটা জ্বলছে। একটু আগে ইউরোপিয়ান প্রোগ্রামের শেষ অধিবেশনের রেকর্ড বাজিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করে ব্যানার্জি সাহেব স্টুডিও থেকে বের হয়ে আসছিলেন। হয়তো অনেকক্ষণ ধরে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকায় তাঁর মাথাটা ভারি ভারি লাগছিল। করিডরের দেওয়ালটা আঁকড়ে ধরে দাঁড়াতেই বাইরের হিমেল হাওয়ার ঝলক

লেগে তার শরীরটা যেন চমমনে হয়ে উঠল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই একটা দামি সিগার দেশলাই দিয়ে জ্বালিয়ে তিনি সুখটান দিতে দিতে করিডর পার হয়ে লাউঞ্জে এসে দাঁড়ালেন। আর দাঁড়াতেই অদূরে জর্জ চার্চের বাগানের বড় পাম গাছটার নিচের সমাধি ফলকটা তাঁর চোখের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। তিনি দেখলেন সেই কুয়াশার মধ্যেই একটা ছায়ামূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সেটাকে ঠাহর করে দেখবার আগেই তিনি দেখলেন লাউঞ্জের গোল টেবিলটার চারদিকে রাখা চেয়ারগুলোর মধ্যে একটা চেয়ার হঠাৎ করে ছিটকে বেরিয়ে এসে নাচতে নাচতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে একটা ল্যান্ডিং-এ গিয়ে ঠোক্কর খেয়ে থেমে গেল কাত হয়ে। দুঃসাহসী ব্যানার্জি সাহেবের চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে, গলা শুকিয়ে কাঠ, হাঁটু দুটো পরস্পর ঠোকাঠুকি করতে লেগেছে —ধপাস্ করে লাউঞ্জেই বসে পড়লেন তিনি। কোনক্রমে গোল টেবিলটার ওপরে রাখা টেলিফোনটার কাছে পৌঁছে নিচের ডিউটি অফিসারকে জানাতে পারলেন— আ-আ-মি অসুস্থ...শি-গ্-গির আসুন। তাঁরা সিঁড়ি দিয়ে ছুটে আসতে গিয়ে দেখলেন সিঁড়িতে একটা চেয়ার কাত হয়ে পড়ে আছে।

সেই রাতটা কেটে গেল। পরের দিন রেডিও অফিসের অফিসার কর্মীরা এক জায়গায় বসে ঠিক করলেন—রাত আটটার পর তাঁরা কিছুতেই ডিউটি করবেন না। সেই নিয়ে ইংরেজি খবরের কাগজে সংবাদও প্রকাশিত হল—'A. I. R.–Spook frightens employees' (Statesman, Monday, 4th Aug. 1958). পত্রিকার রিপোর্টার যা লিখেছিলেন— হুবহু সেটার অংশবিশেষ এখানে আমরা তুলে দিচ্ছি ঃ

Is the All India Radio building at Garstin Place, Calcutta, haunted ?

Recently, an announcer of AIR's Calcutta centre complained to the authorities that he had seen a ghost while on duty at night and appealed for a second employee to be posted along with him on night duty.

This is recently the most discussed topic among AIR employees and a section of the radio artistes. I (a Statesman staff reporter) saw a senior employees demonstrating on Saturday evening the posture and manner of the alleged ghost's movements. He had not seen in himself but heard stories from people who had faced it and whom he could not disbelive.

"A grey-haired six-feet figure smartly dressed in a grey suit has been seen by many at odd hours of the night strolling along lonely

corridors with the head bent. If he meets a chance visitor, he casts him a furtive look and disappears. He sits in empty office rooms and inspects files. He paces up and down."

I was told another interesting story by Birendra Krishna Bhadra, a senior officer of AIR who has been in service since 1927.

...The first incident in his career in AIR happened about 20 years ago when he was a duty officer.

At about 10.20 pm, a European woman announcer ran down the staircase from the second floor studio to inquire if the duty officer had allowed a foreign gentlemen to go up. She had seen him in an adjoining studio through the glass window in her chamber. She called the orderly and asked him if any outsider had escaped his notice and entered the studio. The orderly said 'no' and went to inspect the studio. He found it empty.

The announcer returned to her room. But a few minutes later, white as a sheet, she dashed past the duty officer screaming "I have seen him again." It was the last that AIR heard of that woman announcer. Next morning she sent in her resignation.

এই দ্বিতীয়-তৃতীয় গল্পটা আরও উদ্বেগজনক। কারণ সংবাদপত্রের এই প্রতিবেদক যখন রেডিওর কর্মীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন তখন তাঁরা আরও একটি লোমহর্ষক কাহিনি তাঁকে শুনিয়েছিলেন। শ্রদ্ধেয় সুভাষ সমাজদার মশায় গল্পটিকে যে ভাষায় বর্ণনা করেছিলেন—একালের পাঠকের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবেই। তিনি লিখেছেন ঃ

"এক ইংরেজ মহিলা 'অ্যানাউন্সার' তিনতলার চেম্বারে বসে কাজ করছিল। হঠাৎ নজরে পড়ল তার চেম্বারের পুরু কাঁচের জানলার পাশেই ফাঁকা স্টুডিওতে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে এক বিদেশী ভদ্রলোক। কাঁচের আড়াল থেকে তার দীর্ঘ বলিষ্ঠ মূর্তি কেমন ঘষা ঘষা ছবির মত মনে হলো। মনে মনে খুব বিরক্ত হলো ডিউটি অফিসারের ওপরে। কেন যে যখন-তখন ওপরে ভিজিটরকে 'অ্যালাউ' করে! একটা গ্রামোফোন রেকর্ড চালিয়ে সোজা নিচে নেমে এসে ডিউটি-অফিসারকে বলল, আপনি কি কোন ফরেনারকে ওপরে যেতে পারমিশান দিয়েছেন?

—না ম্যাডাম।

—স্ট্রেঞ্জ! আমি নিজের চোখে দেখলাম, ফাঁকা ড্রামা-স্টুডিওর ফ্লোরে দাঁড়িয়ে আছেন ভদ্রলোক—

—আপনি একবার দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করুন তো ম্যাডাম—যদি সে কিছু বলতে পারে।

দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বলল—না মেমসাহেব, কোন সাহেব তো ওপরে যায়নি!

অবাক হয়ে গেল সেই বিদেশিনী ঘোষিকা। শুধু নিজের মনে অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করে বলল, তাহলে কি তারই চোখের ভুল—কিন্তু স্পষ্ট দেখলাম মানুষটাকে!

কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। নেটিভ এমপ্লয়িরা যে বলে—এই বাড়িটা গোস্ট-হন্টেড হাউস—তাহলে—তাদের কথাটাই ঠিক! আবার মনটাকে শক্ত করতে চেষ্টা করে ভাবল, না—গোস্ট-টোস্ট নেটিভদের সুপারস্টিশান—সে ওসব 'বিলিভ' করে না।

আবার চেম্বারে ফিরে এল। স্টুডিওর ঘড়ির দিকে তাকালো—রাত দশটা পনেরো। আরও পনেরো মিনিট তার ডিউটি। তার গা-টা কেমন ছমছম করতে লাগল। রেকর্ড চালিয়ে দিয়ে মাথা নিচু করে বসে রইল। কিন্তু আশ্চর্য, তাকাবে না তাকাবে না করেও যেই স্টুডিওর দিকে তাকাল তার কিউবিকলসের কাঁচের জানলার ওপারে—দেখল—সেই ইউরোপিয়ান ভদ্রলোক পাথুরে একটা মূর্তির মত আবার দাঁড়িয়ে আছে। তার মনে হলো লোকটার চোখের কোটরে যেন মণি দুটো নেই, সেখানে বাইরের রাতের অন্ধকার পাথরের মত চেপে বসে রয়েছে। তীব্র ভয়ে তার হৃৎপিণ্ডটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। সে চিৎকার করে বলল, হু-জ দে-য়া-র?

রহস্যময় সেই মূর্তির ভেতর কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না। যেমন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু সে আর থাকতে পারল না। ঝড়ের গতিতে নিচে নেমে এল সে। ভয়ে উত্তেজনায় কাগজের মত সাদা হয়ে গিয়েছে তার মুখখানা। তীব্র আতঙ্কের যন্ত্রণায় থরথর কাঁপতে কাঁপতে কাঁদো কাঁদো গলায় ডিউটি অফিসারকে বলল—আবার—আবার দেখলাম সেই লোকটাকে—আমি আর ওপরে যেতে পারবো না—বলেই সেই যে রেডিও স্টেশন থেকে সে বেরিয়ে গেল আর এল না।

এল না তার পরের দিনও। কয়েকদিন পর এল তার রেজিগনেশান লেটার।

মেহেরবানের এবং মেমসাহেবের সেই বিদেশী ভদ্রলোকের প্রেতচ্ছায়া দেখা কিম্বা লাউঞ্জের সেই চেয়ারটার নাচতে নাচতে ঘুরপাক খেয়ে চলে যাওয়া ইত্যাদি বিস্ময়কর ঘটনাগুলোকে রেডিও-কর্মীদের গালগল্প বলে মনে হতে পারে।" আসলে এইসব ভৌতিক উপস্থাপনের কাহিনি বলে গেছেন 'বিশ্বাসযোগ্য' ভাবেই রেডিওর প্রথম যুগের ব্যবস্থাপক কর্মী সুখ্যাত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মশায়।

১৯০৮ সালে ১নং গারস্টিন প্লেসের বাড়ির মায়া ছেড়ে আকাশবাণী উঠে চলে

এসেছিল ইডেন গার্ডেন্স-এর এক প্রান্তে। ভূতেরা সম্ভবত তাঁদের আদি বাসস্থান পরিত্যাগ করেন না এমনই তাঁদের পার্থিব জগতের প্রতি মমতা। সম্ভবত সে কারণেই ইডেন উদ্যানের প্রশস্ত আঙ্গিনায় তাঁরা আর বাসা বাঁধতে চাননি। হয়তো কাছেই গঙ্গার ঘাটে নিরন্তর রাম নাম তাঁদের শান্তিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারত।

কিন্তু গারস্টিন প্লেসেও এখনও তাঁদের স্থায়ী ঠিকানায় তাঁরা আছেন কিনা, অথবা স্বদেশীদের গুলি-গোলার ভয়ে তাঁরা 'প্রাণ' ত্যাগ করেছেন কিনা এ বিষয়ে সংবাদপত্রের কোনও রিপোর্টারকে তৎপর হতে দেখেনি। আপন প্রাণের প্রতি অজস্র মায়াবশে বর্তমান লেখকও এর ধারে-পাশে রাত্রিবাসের পরিকল্পনা মাথায় আনতে পারেননি।

মহর্ষি ও কবির 'ছায়া' দেখা গেল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে তো রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব অথবা নানান অনুষ্ঠানের সুবাদে অনেকেই যান, তাঁদের কারও মুখে এই বাড়িতে ভূত দেখার কথা আমরা শুনিনি। অথচ এখানে নাকি ভূত ছিল এবং সে ভূত নাকি স্বয়ং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। কথাটা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, কিন্তু সেকেলে ঠাকুরবাড়ির কোন কোন বাসিন্দা তাঁদের ভূত দেখার কথা বলে গেছেন বলে জানতে পারা গেছে (Telegraph, 18 April 1992)। আসলে বড় বাড়িতে এক একটা নির্জন জায়গা থেকেই থাকে, আর তা যদি পোড়ো অবস্থায় পড়ে থাকে—তাহলে আচ্ছা ভূতের কায়া সেখানে দেখা যায়ই। হয়তো জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এমন একটা ব্যাপার ছিল। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার তেতলার ঘরটাকে ঘিরে একটা রহস্যময়তার ইঙ্গিত যেন দিয়ে গেছেন।

দেবেন্দ্রনাথের বিয়ে হলো যখন, স্ত্রী সারদা দেবী যখন ঘরে এলেন (তারপরে কোনও দিন আর বাপের বাড়ি যাননি আমৃত্যু) তখন বাড়ির মধ্যেই একটা পুকুর ছিল। তার কথাও রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন আত্মজীবনীতে। একসময় সেটা ভরাটও হয়ে যায়। এই ভরাট করা জায়গাটাতে একটা নির্জনতা ফিসফিসিয়ে উঠত। শোনা যায় সারদাদেবী সাঁঝবেলায় আলো-আঁধারিতে এই বিজনতলায় শুনতে পেতেন—কখনও কেউ যেন হাসছে খিলখিলিয়ে, কেউ বা চাপা গলায় গুমরে গুমরে কেঁদে চলেছে একটানা, কেউবা কাউকে তর্জন গর্জন করছে। ১৯০৫ সালে দেবেন্দ্রনাথ মারা গেলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেই। তাঁর দেহ দাহ করে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছিল কিছুটা ভস্ম। ভস্মাধারটি নাকি ঠাকুরবাড়ির সেই নির্জনতায় পুঁতে রাখা হয়েছিল। ঠাকুরবাড়ির বড় ছেলে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলে দ্বিপেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল হেমলতা দেবীর। মহর্ষি তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন—নাতবৌ বলে কথা। হেমলতা দেবী নাকি ঠাকুরবাড়িতে সেই দাদা-শ্বশুরের 'প্রেত' স্বচক্ষে দেখেছিলেন।

হেমলতাদেবী 'বড়মা' নামেই পরিচিত ছিলেন সবার কাছে। তিনি মারা যান ১৯৬৭ সালে। ১৯৫২ সাল নাগাদ তিনি এই 'অশরীরী' দেবেন্দ্রনাথকে দেখেছিলেন। জোড়াসাঁকোর এই বাড়িতে পরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মিউজিয়ামের কিউরেটর ছিলেন শিলা বিশেষজ্ঞ সমর ভৌমিক। ১৯৬২ সালে তিনি এই বাড়ির নৈশ প্রহরী দুর্যোধন ঢালের কাছ থেকে বিচিত্র সব সংবাদ

সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির অন্যতম মোটর চালক মিশরিও অনেক ভৌতিক ব্যাপার শুনিয়েছিলেন। এই বাড়িতেই ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথ দেহ রেখেছিলেন। এঁরা দু'জনে নাকি অশরীরী রবীন্দ্রনাথকে 'স্বচক্ষে' প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শুধু রবীন্দ্রনাথকে একা নয়, দেবেন্দ্রনাথের অপচ্ছায়াও। তাঁদের মতে রবীন্দ্রনাথের আত্মা সেখানে অপেক্ষা করেছিল তাঁর পিতৃদেবের উপচ্ছায়ার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। মহর্ষির 'প্রেতাত্মা' নাকি এঁদের দু'জনকে জিগ্যেস করেছিল—'ও আসেনি'?—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের প্রেতাত্মা!

পরে নাকি এখান থেকে বেশ কয়েকটা কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছিল খোঁড়াখুঁড়ির সময়। পঞ্চাশ বছর তো পার হয়ে গেল তারপর। আমরা যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে দেখিনি —তাঁরা কি তাঁর 'প্রেতাত্মা'ও আর দেখতে পাবো না কোনওদিন? গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে 'তাঁদের' তো আর দেখা যায়নি। অন্তত কেউ দেখেছেন বলে আর শোনা যায়নি।

ভূতের কবলে রাইটার্স

'কোম্পানিকা কেরানি কা বাড়ি কা উত্তর রাস্তা'—এমনিভাবেই একটি গেজেটিয়ারে 'লায়ন্স রেঞ্জ' নামে বিবাদীবাগে যে রাস্তাটি আছে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। সেটা ছিল ১৮৪১ সাল। অর্থাৎ রাস্তাটি কোম্পানির কেরানিদের বাড়ির উত্তরে। কোম্পানির কেরানিদের জন্যে নির্দিষ্ট এই বাড়িটিই হল 'রাইটার্স বিল্ডিংস'। কেরানিদের কোম্পানির আমলে বলা হত Writer বা জুনিয়ার সার্ভেন্টস। কোম্পানি বলতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। যে বাড়িগুচ্ছে এই রাইটার্সরা বসতেন—তারই নাম হয়ে গেল রাইটার্স বিল্ডিংস। এখন শুধু কেরানিরাই থাকেন, তাঁদের মনিবেরাও থাকেন—তবুও কেরানিদের নামেই বাড়ির নামটা বজায় আছে। তালপুকুরের পাড়ে তালগাছ না থাকলেও পুকুরের নামটা তালপুকুরই থেকে যায়।

তবে আজকে যে 'রাইটার্স' বাড়ি দেখছি, সেটা কিন্তু আদি বাড়ি নয়। একেবারে আদি বাড়িটার অস্তিত্ব বোঝা মুস্কিল, আমরা তার একটা ছবি অবশ্য দিয়ে দিলাম। ১৬৯৫ সালের ২৫ জুন তারিখের প্রচণ্ড ঝড়ে আদিবাড়ি প্রায় ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ১৭০৬ সালে পুরনো কুঠিবাড়িটা ভেঙে ফেলে নতুন একতলা বাড়ি তৈরি হয় এই কেরানিদের জন্যে। এই একতলা নতুন বাড়িটিই দ্বিতীয় রাইটার্স বাড়ি। এটা একটা নিজস্ব জায়গায় বাড়ি ছিল না, পুরনো কেল্লার সীমানার মধ্যেই এই আদি এবং নতুন বাড়ি অবস্থিত ছিল। নতুন বাড়ি বলছি বলে ভেবে নেবেন না, যে বাড়িটি আজকাল দেখছি—সেটিই নতুন বাড়ি। এই বাড়িটি এখন যেখানে, আদি ও মধ্য পর্বের রাইটার্স বিল্ডিংস ছিল এখনকার বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। তখন এই অংশ ফাঁকা জমি ছিল। পরে এই ফাঁকা জায়গাটিতেই 'কোম্পানিকা কেরানি কা বাড়ি' তৈরি হল উনিশটি আলাদা আলাদা অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে। তখনই এটি 'বিল্ডিং' থেকে 'বিল্ডিংস' হতে লাগল। আঠারো শতকের শেষে এই রাইটার্স বিল্ডিংস দেখতে ছিল সারি-বাঁধা কতকগুলো দোকানঘরের মতো। আজকের যে সজ্জিত রাইটার্স বাড়ি দেখতে পাই, তার পত্তন শুরু হয় ১৮২০-২১ সাল থেকে। Calcutta : Past and Present গ্রন্থে শ্রীমতী ব্রেসিনডেন এ সম্পর্কে লিখে গেছেন ঃ

> The costly champagne suppers of Writers' Buildings were famous, and long did the walls echo to the 'joyous song and loud rehearsing tallyholes' of many generations of writers. Gradually, however, there came a change; the age of entering the Company's Civil Service

was raised, the period of a writer's stay in Calcutta was reduced, and, at last, writers were no longer provided with quarters, but lived with friends or in lodgings at their own expense. For some years Writers' Buildings remained deserted; then the sets of apartments were let to private individuals or for offices. The next change saw then occupied as Government offices, and lastly came alterations and additions which crowned the old bare range with domes, and masked it with a stately facade, the Writers', Buildings were lost in the Bengal Secretariat.

একদা এখানে কেরানিদের নানোন্মত্ত উল্লাসে দেওয়ালে দেওয়ালে ধ্বনিত রভসানন্দ অবসিত হয়েছিল পরে। কিন্তু এখানে কখনও কখনও শোনা যেত অশরীরী আত্মার হাড়-হিমকরা উল্লসিত হাস্য অথবা জিঘাংসার সক্রোধ সুতীব্র ধ্বনি। এখানেই যখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হল উনিশ শতকের একেবারে সূচনায় তখনই কী বিদেশী আত্মাদের ঘোরাফেরা শুরু হয়েছিল? মনে হয় কিছু পরে। একটা কথা এই প্রসঙ্গে জানানো ভাল যে এই কলেজের লাইব্রেরির প্রায় সাত হাজার বই নিয়েই ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি গড়ে ওঠে—যার পরিণত রূপই আজকের জাতীয় গ্রন্থাগার।

রাইটার্স বিল্ডিং নয় বিল্ডিংস। এর প্রধান বাড়ি চারতলা। ছ-তলা বাড়ির সংখ্যা চার। অনেকগুলো বাড়ি নিয়ে গড়া বলে এই বাড়ি বহুবচনে বিল্ডিংস। চারতলা বাড়ি ন'টি। সব মিলিয়ে ঘরের সংখ্যা ১৪২৪। হলঘর আছে তেতাল্লিশটা। বাথরুম ছিল ১৬০—এখন সংখ্যা বেড়েছে। পঁচিশটা সিঁড়ি আর ছ'টি লিফট উপরে ওঠানামার জন্যে তৈরি। সব জাতের উপাসনালয়, ক্যান্টিন, ডাকঘর কী নেই এই বাড়িতে। দিনের বেলায় এর কর্মচাঞ্চল্য একটা মানুষের পক্ষে ধারণা করে ওঠা দুঃসাধ্য। কিন্তু রাতের বেলা?

পুরনো অনেক কর্মী রাতের রাইটার্সকে এক রহস্যালয় বলে ভাবতেন অনেক সময়। তখন এই নিঝুমপুরীতে এক ঝুমঝুম ফিসফিসানি। নাইটগার্ডরা রাতের রাইটার্সে দখল নিয়ে বসেন। এই নাইটগার্ডরা এই নৈশ প্রহরীরাই রাতের রাইটার্সে কতবার অশরীরী পদচারণা শুনেছেন, আবছা আলোয় দেখছেন আরও আবছা আত্মারা ঘোরাফেরা করছেন। এঁদেরই একজন মুন্‌শিরাম নৈশরক্ষীর চাকরিতে এখানে যোগ দিয়েছিলেন স্বাধীনতা পাবার তিন বছর আগে। এখনকার কোনও রক্ষী তাঁর মতো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেননি। অনেক প্রবীণ রক্ষীদের জিগ্যেস করেও কেউ এখানে ভূত দেখেছেন—এমন কথা শুনিনি। কিন্তু মুন্‌শিরাম অনেক

অনুরোধের পর বন্ধুবর সুভাষ সমাজদারকে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়ে গেছিলেন। তিনি ছাড়া এ-বিষয়ের সাক্ষ্য দেবার আর কেউ নেই। তাই বন্ধুবরের সেই সাক্ষাৎকারের অভিজ্ঞতাকেই আমাদের তুলে দিতে হবে এবং অবশ্য তা তাঁর ভাষাতেই। তাকে নিজের মতো করে বললে এই বর্ণনার সত্যতা ক্ষুণ্ণ হবে। সুভাষবাবু লিখে গেছেন—

সেদিন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছিল। সেই সঙ্গে ছিল ঝড়ো হাওয়া। মুন্‌শিরামের মনে হলো, সারা পৃথিবী জুড়ে যেন মহাপ্রলয় শুরু হয়েছে। এমনিই রাত্রে এই জিন-পরিকা কোঠিতে গার্ড দিতে গা-টা কেমন ছমছম করে। আর এই সব ঝড়-বাদলার রাতে তো কথাই নেই। নিদারুণ একটা ভয় বুকের ভেতরে ধুকপুক করে। কিন্তু উপায় কি?

চাকরি। টর্চ জ্বালিয়ে বুটজুতোয় খট্‌খট্ শব্দ তুলে মুন্‌শিরাম এল এক নম্বর ব্লকের দোতলায়। থেকে থেকে গুম গুম করে ডাকছে মেঘ। আকাশের বুক চিরে উগ্র আলোর ঝিলিকে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে।

দোতলার বারান্দা দিয়ে এগিয়ে চলেছে মুন্‌শিরাম। বাতাসের দাপটে জানলা-দরজার খড়খড়িগুলো থরথর করে কাঁপছে। কোথাও কোন খোলা দরজার পাল্লা দুটো ঠকাস ঠকাস আওয়াজ করছে! এই রকমই শব্দ করে কে যেন হাতুড়ি পিটছে মুন্‌শিরামের বুকের ভেতরেও। আজ কেন যেন বড় বেশি ভয় করছে। যেই সেন্ট্রাল ডেসপ্যাচ অফিসের সামনে এল অমনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। সে স্পষ্ট শুনতে পেল, সি. ডি. ও'র (সেন্ট্রাল ডেচপ্যাচ অফিস) ঘরটার ভেতর থেকে ভেসে আসছে একটা বুকচাপা গোঙানির আওয়াজ। দারুণ যন্ত্রণায় কে যেন আর্তনাদ করছে!

—কে—কে ওখানে? চিৎকার করে বলতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। কে যেন সজোরে তার গলা চেপে ধরেছে। আর ঠিক তখুনি—

তখুনি ঘটে গেল কাণ্ডটা।

দুম-দুম করে অনেকগুলো জোড়া পায়ের আওয়াজ হলো সেন্ট্রাল স্টেয়ার-কেসে। ভয়ে আতঙ্কে আধমরা হয়ে কোন রকমে যেই টর্চ জ্বালল মুন্‌শিরাম অমনি দেখল, টর্চের সাদা আলোর গোলাকার বৃত্তের মাঝখানে কোট-প্যান্টুলন-টাই পরা এক সাহেব। বুকের বাঁদিকটা চেপে ধরে যেন কোন কঠিন যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে ঝুঁকে পড়ে মাঝখানের সেই সিঁড়ি বেয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই জখমি সাহেবের ছায়াদেহের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাকে অনুসরণ করে আরও কয়েকটি ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে যেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে লাগল তখন মুন্‌শিরাম আর পারল না। শুধু এইটুকু মনে আছে, এক নম্বর ব্লকের সান্ত্রীকে চিৎকার করে ডেকেছিল। তারপরে আর সে কিছু বলতে পারে না।

—তুমি যে ইংরেজি গানের কথা বললে মুন্‌শিরাম!

কোন কথা বলল না মুন্‌শিরাম। কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মত দূরে অন্ধকার বারান্দাটার দিকে তাকিয়ে রইল। আমার মনে হলো—সেই দুর্যোগের রাতের দুঃসহ স্মৃতি যেন এখনো আচ্ছন্ন করে রেখেছে তার চেতনা।

বেশ কিছুক্ষণ পর খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে সে বলল, হুজুর সারি দু' তলাটা হলো উ লোগোঁ কা আস্তানা।

—কি রকম?

বহুদর্শী মুন্‌শিরাম হিন্দি বাংলা মিশিয়ে যে বিবরণ বলেছিল তার সারাংশ এখানে বলা হলো—

সেদিন তার ডিউটি ছিল দোতলার তিন নম্বর ব্লকের প্রোটেকটেড এরিয়ায়। রাউণ্ড দিতে দিতে হঠাৎ তার কানে এল ইংরেজি গানের সুর। শব্দটা আসছে দীর্ঘ সেই বারান্দার একেবারে পশ্চিম দিক থেকে। সেদিকটা ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে সেদিকে গিয়ে দেখল, এক মন্ত্রীর ঘরে নিওনের জোরালো আলো জ্বলছে!

কী ব্যাপার—কোন এমারজেন্সি মিটিং বসে গিয়েছে নাকি! আর তারা কেউ-ই জানতে পারল না!

দরজার কাঁচের শার্সি দিয়ে তাকিয়ে দেখল, আলোকোজ্জ্বল সেই ঘরে বেহেড মাতাল একদল সাহেব নেশার ঘোরে ধেই ধেই করে নাচছে। কেউ কেউ আবার টাল সামলাতে না পেরে এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ছে। আর জনাকয়েক হেঁড়ে গলায় গান জুড়ে দিয়েছে!

—পুলিস—পুলিস—নিদারুণ ভয়ে সে আর্তনাদ করে উঠল। ছুটে এল পুলিস, এল হেড নাইট-গার্ড। তারা এসে দেখল কোথাও কিছু নেই, নিশি রাত্রে মন্ত্রীর সেই ঘরের ভেতরটা যেমন জমাট অন্ধকার থাকে তেমনিই রয়েছে।

মুন্‌শিরাম থেমে গেল। কেয়ার-টেকারের অফিস-ঘরটায় অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা থমথম করতে লাগল। ফণীবাবু দূরে অন্ধকার টেলিফোন-ভবনের দিকে তাকিয়ে কেমন ছাড়া ছাড়া উদাস গলায় বললেন, ওদের স্টেটমেন্টে কিছু 'কালারিং' থাকতে পারে—কিন্তু রাত্রে এ-বাড়িতে এমন অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যার কোন 'এক্সপ্লানেশান' আমি আজও খুঁজে পাইনি।

আমি কোন কথা বললাম না। কী-ই বা বলার থাকতে পারে? ফণীবাবু জানেন না, পৃথিবীর কোন দেশেরই 'গোস্ট-হণ্টেড হাউসে'র নানা অলৌকিক কাণ্ড-কারখানার কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। কেন গভীর রাত্রে বার্কিংহাম প্যালেসের করোনেশান হলের তরল অন্ধকারের বুক চিরে একটা-তীক্ষ্ণ নীলচে আলোর রেখা আছড়ে পড়ে আর ঠিক ছায়াবাজির মতই দূরের কালো থকথকে অন্ধকার থেকে বর্ণাঢ্য পোশাকে সজ্জিত অতীত রাজপুরুষরা এক এক করে সারি

সারি বেরিয়ে এসে সেই নীল আলোর গোলক পেরিয়ে আবার কালি-ঢালা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়? কেনই বা আজও ভরদুপুরে ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসের বাগানের শাঁ শাঁ বাতাসের সওয়ার হয়ে ভেসে আসে দূরাগত ঘণ্টাধ্বনি—ডিং—ডং—ডিং—ডং?

—প্রেসিডেণ্ট আসছেন—এই প্রেসিডেণ্ট আসছেন—চাপরাশি-বাটলার-দারোয়ানদের ভেতরে চাপা ফিসফিসানির ঝড় ওঠে। আর তারপরেই দুপুরের খর রোদের ভেতরে ঝাপসা, ঘসা ঘসা ছবির মত ফুটে ওঠে দুই ঘোড়ায় টানা খোলা একটা গাড়ির ছবি। গাড়ির আরোহীর ছায়ামূর্তির ভেতরে অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনের চেহারার আভাস পাওয়া যায়। নানা বর্ণের ফুলের সমারোহে ভরা সেই বিশাল উদ্যানের ভেতরে গাড়ি চলার চক্রাকার পথটি পরিক্রমা করে এক্‌জিট গেটের দিকে যেতে না যেতেই যেন আকাশের আলোয়, হলুদ রোদে শিশির বিন্দুর মতই মিলিয়ে যায় সেই গাড়ি।

—এত কী ভাবছেন মশাই, ফণীবাবুর কথায় ধাক্কা খেয়ে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। ওই দেখুন আমার নন্দী-ভৃঙ্গীরা সব গুটিগুটি এসে দাঁড়িয়েছে তাদের এক্সপিরিয়েন্স বলবে বলে।

—আদাব হুজুর, আদাব—এক বৃদ্ধ মুসলমান সামনে এগিয়ে এল। পরণে চেক লুঙ্গি, গায়ে মিলিটারি খাকি শার্ট।

—এর নাম জমিরুদ্দিন, ফণীবাবু বললেন। রাইটার্সের হেডফরাশ। রাইটার্সের মন্ত্রী, সেক্রেটারি এবং অফিসারদের কার চেম্বারে কবে কার্পেট বিছানো হয়েছিল—কি ধরনের কার্পেট, এসব ওর নখদর্পণে।

—ডক্টর রায়—মানে বিধান রায়ের আমলের ঘটনা স্যার,—জমিরুদ্দিন বলতে শুরু করল। একদিন সন্ধ্যায় আমার ডাক পড়ল। সি. এম. (চিফ মিনিস্টার)-এর ঘরে নতুন গালিচা পেতে দিতে হবে। রাত আটটার সময় নাকি তাঁর ঘরে এমার্জেন্সি মিটিং বসবে। আমি আমার চ্যালা- চামুণ্ডাদের নিয়ে কাজে লেগে গেলাম। আমার কাজ শেষ হতে হতে সাড়ে সাতটা বেজে গেল। ফণীবাবুর দিকে ইঙ্গিত করে বলল—সাহেব বললেন, সি. এম. না আসা পর্যন্ত একটু থেকে যাও। কখন কি দরকার হবে বলা যায় না।

দোতলার দক্ষিণমুখো খোলা বারান্দায় একটা টুলের ওপরে বসে আছি। কিন্তু—আশ্চর্য— আটটা বেজে গেল। সি. এম. এলেন না—আর কোন মন্ত্রীও এলেন না! অফিসাররা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চলে গেলেন। কিন্তু হুকুম না পেলে আমি তো যেতে পারি না—এই পর্যন্ত বলে থামল জমিরুদ্দিন। কেন যেন অন্যমনস্ক হয়ে কাঁচাপাকা দাড়িতে হাত বুলোতে লাগল। আর কোঁচকানো চোখের দৃষ্টিটা কেমন সুদূর হয়ে উঠল।

—তারপরে কি হলো জমিরুদ্দিন?

—বলছি হুজুর—সব বলছি—কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবল সে। তারপরে আবার বলতে শুরু করল, দোতলার তিন নম্বর ব্লকের সিঁড়ির মুখে একটা কমজোরি আলো জ্বলছিল। সেই মরা আলো বারান্দার দু'দিকের অন্ধকারকে যেন আরও ঘন করে তুলেছিল।

আমি টুলের ওপরে বসে ঘুমের ভারে ঢুলে ঢুলে পড়ে যাচ্ছি। লালদীঘির ওপর দিয়ে বয়ে আসা ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় স্যার, কখন যে ভিজিটারদের বেঞ্চের ওপরে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তা বলতে পারবো না।

—খট্-খট্-খট্—খুব জোর আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। শব্দটা আসছে ওই সেই একেবারে শেষে পাঁচ নম্বর ব্লকের দিক থেকে। এখানকার সব কর্মচারীদের ভাষায়—পাঁচ নম্বর ব্লক হলো 'খারাপ জায়গা'! এই কথাটা শুনলেই আমার হাসি পায়। বর্ধমান জেলার গঙ্গাটিকুরি গ্রামে আমার বাড়ি স্যার—ছোটবেলা থেকে আর যাই থাক—ভূতপ্রেতের ভয় আমার কোনকালেই নেই। সারারাত একলা গোরস্থানে বসে কবর পাহারা দিয়েছি।

—কেন?

—আর বলেন কেন হুজুর, যুদ্ধের সময় কাপড় কন্ট্রোল হয়েছিল না? সে সময় মুর্দাকে (শবদেহ) গোসল করিয়ে যে নতুন কাপড়ে 'কাফন' করা হতো সেই কাপড় চুরি করতে আসতো। মুর্দাকে বেপর্দা করলে আর সে বেহস্তে যেতে পারে না—থাক সে সব কথা। কবর গার্ড করে থাকতে থাকতে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েছি নিশ্চিন্তে। জিন-পরির কথা একবারও মনে হয়নি।

—জমির সংক্ষেপে বলো, ফণীবাবু সতর্ক করে দিলেন।

—আচ্ছা স্যার, আচ্ছা। বয়স হয়েছে তো, তাই কথাবার্তা কেমন—জমিরুদ্দিন মাফ চেয়ে নিয়ে বেশ সংযত হয়ে আবার বলতে শুরু করল—

সেই খট্-খট্ শব্দ লক্ষ্য করে কোন কিছু না ভেবেই ছুটলাম। যেই চার নম্বর ব্লকের কাছাকাছি গিয়েছি, হঠাৎ দেখি অফিসারদের ল্যাভেটারিতে আলো জ্বলছে। আর তার সামনে—স্পষ্ট দেখলাম, হাতে রাইফেল নিয়ে এক আর্ম গার্ড দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি যেই তার ঠিক সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালাম অমনি সেই শান্ত্রী ল্যাভেটারির ভেতরে চলে গেল। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কই, কেউ তো বেরোয় না। হঠাৎ দেখলাম দপ্ করে নিভে গেল বাথরুমের আলো। দরজা ঠেলে ভেতরে গিয়ে দেখলাম—কেউ নেই কোথাও—আমার শরীরের ভেতরটা শিরশির করে উঠল। মন থেকে ঝেড়ে ফেললাম দুশ্চিন্তাটা—সারারাত জেগে যে গোরস্থানে একা থাকতে পারে সে এই নাইটগার্ড দিয়ে ঘেরা রাইটার্সে বসে করবে ভূতের ভয়! কিন্তু—

আশ্চর্য আমি যখন ভাবছি খোয়াব দেখেছি কি না, ঠিক তখুনি আবার দেখলাম,

সেই আর্ম গার্ডকে। রাইফেলের সঙ্গিনের নিচের দিকটা শব্দ করে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে—

কে—কে তুমি? আমি ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে সে এবার তিন নম্বর ব্লকের সিঁড়ির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আর অমনি সেই ভারি জুতোর খট্-খট্ আওয়াজটা আবার শুনতে পেলাম বারান্দার একেবারে পূর্বদিকে (এক নম্বর ব্লক)। আমি ছুটলাম সেদিকে। তখন সেই শব্দটা দ্রুত চলে গেল পশ্চিমদিকে (পাঁচ নম্বর ব্লকে)। আমার মনে হলো—মনে হলো স্যার, সারা বারান্দা জুড়ে—সারা দালান জুড়ে নানা করিডরে বারান্দায় অনেক—অনেক লোক একসঙ্গে ছুটোছুটি, দৌড়াদৌড়ি করছে। তাদের দাপাদাপির আওয়াজে গোটা রাইটার্স বিল্ডিং যেন ভেঙে পড়ছে। সেই মাঝরাতে সেই দারুণ শব্দের ভেতরে দিশেহারা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার মাথার ভেতরটা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল। মনে হল, সারা শরীর টলছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। মনে হয় দারুণ ভয়ে ডুকরে আর্তনাদ করে উঠেছিলাম—থামল জমিরুদ্দিন। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। একসঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলার পরিশ্রমে রীতিমতো হাঁপাচ্ছে। মাথাটা নিচু করে বলল, জিন পরি ভূত প্রেতকে ভয় পাই না,—এমন কথা দমফাই করে আর বলি না—বলতে পারি না হুজুর।

—জমিরুদ্দিন মিঞার কলিজার জোর আছে স্যার, আর একজন প্রবীণ নাইট-গার্ড মেহবুব এগিয়ে এসে বলল, তাই ও বেঁচে গিয়েছে—তা না হলে তো তেওয়ারিজির মত কাণ্ড বাধিয়ে ফেলত—বলেই সে সাইকেলের হ্যান্ডেলের মত দু'দিকে ঝুলে পড়া গোঁফ দুটো আলতো করে পাকিয়ে নিল।

—তেওয়ারি কে? তার কি হয়েছিল?

—আরে না না, সে কিছু নয়, ফণীবাবু যেন প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাওয়ার জন্যেই তাড়াতাড়ি বললেন, মেহবুবের কথা ছাড়ুন তো আপনি।

কয়েক মুহূর্ত পরে ফণীবাবু বললেন, তেওয়ারি ছিল সিনিয়র-মোস্ট দারোয়ান। রিটায়ার করতে আর মাত্র ছ'মাস বাকি ছিল। হার্টের দোষও ছিল তার। একদিন শেষরাত্রে দেখা গেল, গেজেটেড অফিসারদের ল্যাভেটারিতে তার ডেড-বডি পড়ে রয়েছে—Plain and simple heart failure! কিন্তু যেহেতু পাঁচ নম্বর ব্লকের বাথরুম, অতএব মেহবুবদের ধারণা—

—ও বুঝতে পেরেছি—আমি বললাম। এবার মেহবুব কি দেখতে পেয়েছিল সেটা বলতে বলুন না ফণীবাবু!

ফণীবাবু মেহবুবকে ইঙ্গিত করলেন। মেহবুবের ভারি মাংসল মুখখানা হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল। মনের ভেতরে কিসের যেন নড়াচড়া চলছে। আস্তে আস্তে বলল, —হুজুর, রাত্রে এ মোকানমে যো ধুপধাপ শব্দ, দরোয়োজা জানালা খোলাকি আওয়াজ—উসব হামরা পাত্তা দেই না—লেকিন—হঠাৎ থেমে গেল মেহবুব। দাঁত

দিয়ে নিচের ঠোঁট দুটো শক্ত করে চেপে ধরে যেন কোন কঠিন যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে বলল, রাতমে কোভি কোভি এইসা আজিব চিজ দেখা যায় যে খুন একেবারে শুখে যায় হুজুর!

মেহবুবের গায়ের রক্ত হিম হয়ে যাওয়ার ঘটনা বিস্তারিত শুনে আমার শুধু মনে হয়েছিল, রাইটার্সের দোতলার বারান্দাতেই প্রেতের আনাগোনা সবচেয়ে বেশি কেন? কেন ফার্স্ট ফ্লোরেরই বিভিন্ন ব্লকের তরল অন্ধকারে রহস্যময় ছায়াদেহ দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়? আর সবশেষে ফণীবাবুর সেই থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স শুনেও আমার পড়ে গিয়েছিল ইলিয়ট ওডোনেলের (Elliot O'donnell)-এর লেখা সেই Ghost Books : Strange hauntings in Britain বইটির বিচিত্র এক-একটি ঘটনা।

এই গ্রন্থের প্রতিটি সত্যি ঘটনার ভেতরে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে প্রেত অধ্যুষিত কোন সাহেব কালের বাড়ি, সবুজ শেওলার পলেস্তারা পড়া কোন ঘাট কিংবা প্রাচীন কোন গাছ সম্বন্ধে সেই অমোঘ সত্য—প্রেতলোকের অভিশপ্ত আত্মাদের বিচরণ ক্ষেত্রের আড়ালে থাকে হয় নিষ্ঠুর কোন বঞ্চনা, না হয় তীব্র কোন প্রতিহিংসার ইতিহাস কিংবা শোচনীয় অপঘাত মৃত্যুর কোন বেদনাদায়ক দুর্ঘটনা। কিন্তু আজ যা ঘটনা, কাল তা স্মৃতি হয়ে যায়। কালে কালে সে স্মৃতিও মানুষের মন থেকে কুয়াশার মত বিলীন হয়ে যায়। শুধু সেই অপ্রীতিকর ঘটনার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সেই জায়গাটা। এইখানেই নিশীথ রাত্রির স্তব্ধতায়, দুপুরের নির্জনতায় মৃত্যুলোকের পরপার থেকে ঘটনার কুশীলবদের বিদেহী আত্মা তাদের প্রিয়জনদের আকর্ষণে, তাদের কত রঙিন সুখ আর দুঃখের স্মৃতি জড়ানো জায়গায় বারে বারে আসে।

তাই তো ওডোনেল-বর্ণিত লণ্ডনের উপকণ্ঠে সেন্ট জনস উডের আরণ্যক পরিবেশে টিপক্রেগি হাউসের অলৌকিক এবং রোমাঞ্চকর ঘটনার সঙ্গে রাইটার্সের ফণীবাবুর থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স, মেহবুবের রক্ত শুকিয়ে যাওয়া এবং অন্যান্য ঘটনারও আশ্চর্য সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

১৯০৯ সালে ওডোনেল তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও'নিলের কাছ থেকে একটা চিঠি পেল। সে জানিয়েছে, দূর সম্পর্কের এক পিসিমার ওয়ারিশ সূত্রে একটা বিশাল বাড়ি পেয়েছে সে। ওডোনেল যদি কয়েকদিনের জন্য এখানে এসে বেরিয়ে যায় তাহলে সে অত্যন্ত খুশি হবে। ওডোনেল বেকার মানুষ। আউটিং-এর জন্য মনটা চঞ্চল হয়েই ছিল। অতএব সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলো।

আশ্চর্য সুন্দর আর মনোরম এক প্রাসাদ। তার চারদিকের বাগানে ঘনসন্নিবদ্ধ পাম-বীথির নীলাভ ছায়ায় ছুটোছুটি করে খেলা করছে কাঠবেড়ালির দল। বাগান আলো করে ফুটে রয়েছে রাশি রাশি ড্যাফোডিল। শেষপ্রান্তে এক বর্ষীয়ান ওক গাছের নীচে স্যাঁতসেঁতে ছায়ায় বিশ্রামের জন্য শ্বেতপাথরের একটা বেদী।

ওডোনেলের মনে হলো কুয়াশা আর কয়লার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন লণ্ডনের ঘিঞ্জি থেকে সে যেন এক মধুর স্বপ্নের পরিবেশে এসে পড়েছে।

সারাদিন দুই বন্ধুতে গল্পগুজব ও হৈ-হল্লা করে কাটিয়ে দিল। কিন্তু যেই গুঁড়ি গুঁড়ি কুয়াশার মত সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে লাগল অমনি সেই অন্ধকারটাই যেন চেপে এল ও'নীলের হাসি-হাসি মুখে।

—কী ব্যাপার রে—গম্ভীর হয়ে গেলি যে? ব্র্যান্ডি ফুরিয়ে গিয়েছে?

কোন কথা বলল না ও'নিল। শুধু তার বড় বড় দুটো নীলচোখে ব্যথার ছায়া ফুটে উঠল। দুঃস্বপ্নের ঘোরে যেন বিড়বিড় করে বলল, এত সুন্দর বাড়িটা বুঝি ছেড়েই দিতে হবে।

—কেন—কেন—কি হয়েছে?

—আর একটু রাত হোক, সব বুঝতে পারবি।

ধীরে ধীরে রাত বাড়ল। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠল। হঠাৎ বাগানের একেবারে শেষে সেই ওক গাছটার নিচ থেকে শোনা গেল—করুণ আর বুকফাটা একটা আর্তনাদের শব্দ! সঙ্গে সঙ্গে তারা ছুটে গেল সেদিকে। আর থমকে দাঁড়ালো তাদের হৃৎস্পন্দন। চারদিকে চাঁদের মেটে-মেটে আলোয় ভরা বাগানের শেষপ্রান্তে সেই ওক গাছের নিচে ঝুপসি অন্ধকারে দীর্ঘদেহী এক ভদ্রলোকের ছায়ামূর্তি। আর সেই ছায়াদেহের মাথায় সাবেক কালের রুপোর চুমকি বসানো টুপি। ভদ্রলোক বাঁদিকের বুকটা চেপে ধরে নিদারুণ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

—কে—কে আপনি? চিৎকার করে তারা যেই ছুটে গেল ওক-গাছের দিকে অমনি মিলিয়ে গেল সেই রহস্যময় ছায়াদেহ। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেই ড্যাফোডিলের ঝাড়ের আড়াল থেকে কে যেন খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। তারা স্পষ্ট দেখল, অপূর্ব সুন্দরী তন্বী এক রমণী মূর্তি। জ্যোৎস্না আর কুয়াশা দিয়ে গড়া যেন তার অপরূপ অঙ্গসৌষ্ঠব। তারা সামনে যেতেই ঠিক রঙিন প্রজাপতির মতই যেন হাওয়ার ওপর পা ফেলে সে চলে গেল ফার্নগাছের আড়ালে। আবার চারদিক সচকিত করে সে হেসে উঠল। অভিভূত একটা আচ্ছন্নতার ঘোর কাটিয়ে তারা যে মুহূর্তে তার দিকে অগ্রসর হলো অমনি ফিরে জ্যোৎস্নার ছায়া-ছায়া অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

পরদিন চায়ের টেবিলে বসে ও'নিল বলল, এবার বুঝলি তো, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেই কেন গম্ভীর হয়ে যাই!

—কিন্তু—কেন এসব দেখা যায়?

—যতদূর সম্ভব খোঁজখবর করে জেনেছি, পিসেমশায় এ বাড়িটা কিনেছিলেন এক ব্যারনের কাছ থেকে। সেই ব্যারনের স্ত্রী ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী। তাদের স্বামী-স্ত্রীর ভেতর বয়সের পার্থক্য ছিল অনেক। ভদ্রমহিলা কোন এক সম্ভ্রান্ত যুবকের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হয়েছিল—হঠাৎ চুপ করে গেল ও'নিল। আবার

দূরে জানলার বাইরে সেই ঝাপড়া ওক গাছের নিচে বেদীর দিকে চোখ দুটো ছড়িয়ে দিয়ে বলল, একদিন নাকি জ্যোৎস্না রাত্রে যখন ব্যারনের স্ত্রী তার প্রেমিকের সঙ্গে ওই বেদীতে বসে কূজন করছিল এমন সময়ে সামনে এসে দাঁড়ালো ব্যারন। তার হাতে রিভলবার। তারপরে আর কি—যা হওয়ার, যা হয়ে থাকে—তাই হলো। সেই ওক গাছের নিচে আদিম অন্ধকারে এক নারীকে কেন্দ্র করে দুটি পুরুষের অন্তরে জেগে উঠল জিঘাংসা। শুরু হলো দ্বন্দ্বযুদ্ধ। দুই পক্ষই সমানে গুলি ছুঁড়তে লাগল। ব্যারনেসের প্রণয়ী সেই সুদর্শন যুবকের পিস্তলের গুলি এসে ব্যারনের বুকের বাঁ দিকে!

হতভাগ্য ব্যারন মারা গিয়েছিল। ব্যারনেস তার প্রেমাস্পদের সঙ্গে কোথায় চলে গিয়েছিল কেউ জানে না—কেমন করুণ তার হতাশ চোখে সুন্দর বাড়িটার দিকে তাকিয়ে নিভু নিভু গলায় বলল ও'নিল, এ অঞ্চলের লোকের বিশ্বাস সেই ব্যারন আর তার সেই ককেটিশ ওয়াইফের স্পিরিট এই বাগানে দুর্ঘটনার জায়গায় আনাগোনা করে।

রাইটার্সের আর এক নৈশপ্রহরী মেহবুবও তার অভিজ্ঞতার কথা অতি সংক্ষেপে জানিয়ে গেছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল এই রকমের—

মেহবুবের সেদিন ডিউটি ছিল দোতলার চার নম্বর ব্লকে। একটানা পায়চারি করতে করতে পা দুটো ধরে গিয়েছিল। বেয়ারাদের টুলে বসতে না বসতে চোখ দুটো জড়িয়ে এসেছিল।

ধপ্—হঠাৎ ভারী কিছু পড়ার শব্দ হলো। ছুটে বারান্দায় গিয়েই আঁতকে উঠল—লিনোলিয়াম মোড়া প্রোটেকটেড এরিয়ার অলিন্দে আড়াআড়িভাবে পড়ে রয়েছে একটা লাশ। তার পরনে খুব দামি স্যুট। সে ভয়ে চিৎকার করে উঠল। এসে পড়ল পুলিস, নাইট-গার্ড দারোয়ান, এল নাইট-ডিউটির প্রায় সব স্টাফ। তারা সামনে গিয়ে দেখল সেই বারান্দার ডেড-বডির কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই। শুধু বিভিন্ন ব্লকের মুখে করিডরের ঘোলাটে আলো বুকে নিয়ে দীর্ঘ বারান্দাটা যেমন গা এলিয়ে পড়ে থাকে তেমনি পড়ে রয়েছে।"

চিঠিবাড়িতে ভূতের সংসার

ভূতেরা সংসারে মানুষদের উপর নানা অত্যাচার করে, ভয় দেখায়, ঘাড় মটকে রক্তও খায় নাকি? (তাদের কি পরিপাক যন্ত্র থাকে, শিরা-উপশিরা থাকে, তারা কি মলমূত্রাদি ত্যাগ করে?—এসব কথা কোনও ভূতবিশেষজ্ঞও আমাদের জানিয়ে যাননি। কেবল তারা হি-হি-হি করে হাসে, কাঁদেও নাকি, তবে তা নাকি কান্না কিনা বলা মুশকিল—তাদের অস্তিত্ব আছে—চিত্রকরগণ এমন কোনও প্রতিকৃতি আমাদের উপহার দিতে পারেননি।) কিন্তু ভূতেরা চিঠি লিখে মানুষকে ভয়-ডর দেখাচ্ছে—এমন সংবাদ এখনও পর্যন্ত আমরা পাইনি। তাদের নগদ টাকাকড়ি থাকে না বলেই জানি, সেজন্যে ডাকটিকিট কিনে চিঠি ডাকে ফেলা সম্ভবপর নয়। বেয়ারিং চিঠি দেবার পদ্ধতি সম্ভবত তাদের জানা ছিল না। হাড়সর্বস্ব হাতে কলম-ধরাও মুশকিল।

অথচ দেখছি কলকাতায় চিঠির আদতবাড়ি জি.পি.ও.—গোটা নাম জেনারেল পোস্ট অফিস-এ একসময় তারা বাসা বেঁধেছিল। মনে হয় গোটা কলকাতার মধ্যে এই বিবাদীবাগ চত্বরটাই ছিল ভূতেদের ওঠা-বসা-শোয়ার আদত জায়গা। রাইটার্সে তাদের বাসা বেশ পোক্ত ছিল। এই বইতে তার কথা লেখা হয়েছে। গারস্টিন প্লেসে আকাশবাণীতে তাদের আড্ডা জমজমাটই ছিল। সেই সুবাদে জিপিওতে তাদের বাসা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। আমরা যেসব চিঠিপত্রে ঠিকানায় গলদ থাকে সেগুলোকে সাধারণত বলে থাকি ঘোস্ট লেটারস—ভুতুড়ে চিঠি। সেগুলো যে ভূতে লেখে না—তা আমরা বলতেই পারি।

১৮৬৮ সালে কলকাতার প্রধান ডাকঘর জিপিও-র বাড়ি তৈরি শুরু হয়। এটি চালু হয় ১৮৭০ সালে। আজকে জিপিও'র মাথায় যে বিশাল ঘড়িটি দেখি—সেই ঘড়ি বসানোর ব্যবস্থা চালু হয় ১৮৯৬ সালে—বিলাতের 'বিগ বেন' কোম্পানি থেকে তিন ডায়ালের বিশাল ঘড়িটি কেনা হয় সে সময়েই সাত হাজার টাকা দিয়ে। ঘড়ির বিকট আওয়াজে আশপাশের সাহেবদের রাতের ঘুম যেত ভেঙে। তাঁরা রেগে গিয়ে প্রবল আপত্তি জানালেন। এর ফলেই ঘড়িটার আওয়াজ কমিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু এই আওয়াজে জিপিওর খাস বাসিন্দা ভূত-পরিবারের খুব একটা অসুবিধে হয়েছিল কিনা তা কোনও সংবাদপত্রে ছাপা হয়নি। আসলে তারা তো রাতে ঘুমোয় না কখনও। কাজেই অসুবিধে হবার কথা ছিল না।

জিপিও বাড়ির একটা সম্ভ্রম আছে। দুটো রাস্তার কোণে অবস্থিত এই বাড়িতে পৌঁছতে গেলে মন্দিরের পৈঠার মতো অনেকগুলো সিঁড়ির ধাপ পার হয়ে যেতে

হবে। তারপরে যেন একটা গোলাকৃতি মেঝের সব পাশ ঘিরে ঘরের পর ঘরের সারি। উপরের গম্বুজটাও অমনি মর্যাদা আর সম্ভ্রম নিয়ে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—মাথায় তাজের মহিমা বহন করে। এমন একটা বাড়িতে সম্ভবত সম্ভ্রান্ত ভূতেরাই বাসা নিয়ে থাকবে—এটাই স্বাভাবিক। অনতিদূরে প্রবহমান গঙ্গার শীতল হাওয়া তাদের হাড়ে কতখানি কাঁপন লাগাতো বলতে পারি না—কিন্তু তাদের উপস্থিতি সেকালের বহু কর্মচারীর হাড়ে কাঁপন লাগিয়ে হৃৎপিণ্ডকে স্তব্ধ করে দিতে পারত।

চব্বিশ ঘণ্টা ধরে কাজ চলে এই বাড়িটাতে। আগের কলকাতায় নিশুতি রাতকে বোঝা যেত, জানা যেত। সেই ঘুমিয়ে-পড়া রাতের কলকাতায় জেগে থাকতো জিপিও তার বিচিত্র কর্মকাণ্ড নিয়ে। বড় বড় ঘরগুলোতে কেউ বেছে চলেছেন চিঠি, কেউ দিচ্ছেন তাতে মোহরের ছাপ। নিশুতি রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে শোনা যেত সিলমোহরের ঠক-ঠকা-ঠক আওয়াজ। চলতো রাতভর টরে টক্কার আওয়াজ। এইসব কর্মচারীরা মাঝে মাঝে ভৌতিক চেহারার নিশিকুটুম্বদের এক একটা দীর্ঘ আবছা ছায়া তাদের টেবিলের পাশ দিয়ে সাঁ-করে চলে যেতে দেখতে পেতেন। শিউরে উঠতেন তাঁরা প্রথম প্রথম। তাদের কোনও ক্ষতি করে না তারা—এই ভেবে এনিয়ে মাথা ব্যথাও শেষ পর্যন্ত তাঁরা করতেন না। এমনিতেই তো ওই বড় বড় খোলা জানলা দিয়ে হু হু করে বাতাসের শনশনানিতে একটা হাহাকার, একটা বুকভাঙা নিশ্বাসের দীনতা পরিবেশটাকে ভয়াবহ রাখতোই। শীতের দিনে বন্ধ জানলার কোনও একটা ভাঙা খড়খড়ি দিয়ে হাওয়া ঢুকে মনে হতো কে যেন একটা অশরীরী ছায়াকায়া শিস্ দিয়ে ডাকছে। নিজের কাজের টেবিল ছেড়ে দিয়ে তখন কয়েকজন একত্রিত হয়ে ধূমপান করতেন। চাকরি তো ছাড়া যাবে না এই অজুহাতে। অন্ন চিন্তাঃ চমৎকারাঃ। পেটের দায় তো বড় দায়।

তাঁদের কেউ কেউ বলতেন ওই কোণের ঘরটা থেকে তাঁরা কখনও কখনও শুনতে পান নূপুরের শিঞ্জন—কে যেন নিশাভিসারের শেষে চরণ দুটির শ্লথ পদক্ষেপে মঞ্জীরের নিক্কণে শ্রান্তক্লান্ত ধ্বনিতে একটা রহস্যের কুহেলি জাল বিস্তার করে চলেছে। কান পেতে শুনতে শুনতে আবিষ্ট কর্মচারীও বুঝি তন্দ্রালস্যে একটু ঘুমিয়ে পড়েন। কখনও শোনা যায় কে যেন আলতো পায়ে সিঁড়ি দিয়ে ক্রমাগত ওঠানামা করছে—একটা ছায়া ছায়া আবছায়ার পরশ সেখানে—আলগোছে সে আলগা পায়েই। উৎকর্ণ কর্মচারীর সম্বিৎ ফিরে আসে সহসা—তবে কি তিনি কিছু ভুল শুনেছেন, ভুল দেখেছেন! কিন্তু রাতের পর রাত কি একই ধরনের ভুল হতে পারে? শব্দ মিলিয়ে যায়, কর্মচারীরা আবার কাজে মন দেন। এমনি করেই জিপিও'র রাত কেটে ভোর হয়!

সেদিনটা বোধহয় আজ আর নেই। জিপিওর কোনও কর্মচারীকে এসব কথা বললে তিনি হয়তো হেসে উড়িয়ে দেবেন। প্রশ্নকর্তার মস্তিষ্কের সুস্থতা নিয়ে প্রশ্নও

তুলে বসবেন হয়তো। কেউ বা কপালে হাত ঠেকিয়ে বলবেন—ওদের ওসব কথা ছেড়ে দিন না দাদা। সেই কবে কোন কালে কী যে সব হত। শুনেছি বটে সিনিয়ারদের কাছে। এখন চারদিকে এত আলো, সারারাত ধরে গাড়ির ছুটোছুটি দাপাদাপিতে তেনারা বোধহয় অন্য পোড়োবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। রাম রাম বলুন দাদা! এসব কথা জিগ্যেস করে আমার রাতের ঘুমটা কেড়ে নিয়ে আপনার কী লাভ! আপনি তো দু' কলম লিখে দু'-পাঁচশো টাকা রোজগার করবেন। গরিবের চাকরিতে আপনার নজর কেন? এই কম্পিউটারের যুগে ভূতেরা সব ইন্টারনেটে চলে গেছেন। তাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস আমার জানা নেই। নইলে আলাপ করিয়ে দিতুম!

এসব কথা শুনতে শুনতে মনে হবে—তাহলে বুঝি একসময়ে তারা থাকতো। একটা মানুষ মরে গেলেই কি ভূত হয়! যারা আত্মার এই পৃথিবীর ওপর একটা মায়া থেকে যায়—তারই টানে তারা আসে। যার এই পৃথিবীর ওপর একটা প্রতিহিংসা নেবার ইচ্ছে হয়, সেও হয়তো আসে। ফলে যাদের মৃত্যু হয় অপঘাতে—কোনও অ্যাক্সিডেন্টে অথবা কেউ খুন করেছে তাকে—তারই বদলা নিতে তারা ওই অকুস্থলের কাছাকাছি থাকে। আর এই অঞ্চলটায় তো কত খুন-রাহাজানি-জখ্‌মির ব্যাপার ঘটে গেছে দীর্ঘকাল ধরে তার হিসেব-নিকেশ কে রাখে! হয়তো এই চকমিলানো সুন্দর বাড়িটার কোরিন্থিয়ান বিশাল থামগুলোর পাশ দিয়ে খিলান পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতালায় কোনও একটা ঘরে তারা ঘাপটি মেরে থাকে, বদলা নেবার সুযোগের অপেক্ষায়। তখন বাড়ির গোলগম্বুজের মাথায় থাকা আলোটার নিচে রাতের জিপিও যেন একটা অশরীরী অনঙ্গ আবহাওয়া নির্মাণ করত। সেই আলো আর নেই। এখন হাজার টাকার নিয়নবাতিতে ছায়া আর পড়তে পারে না। আর ছায়া না থাকলে উপচ্ছায়া থাকে কেমন করে?

অথচ এই অঞ্চলটার ইতিহাস তো মৃত্যুর উৎসবের ইতিহাস ছিল। এখানেই কি ঘটেছিল অন্ধকূপ হত্যার মতো ভয়াবহ ইতিহাস যেখানে মাত্র কয়েক বর্গফুট জায়গায় সিরাজ বন্দি ইংরেজ পুরুষ-স্ত্রীলোক-শিশুদের আবদ্ধ রেখে একেবারে ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত আর বায়ুহীন রেখে মেরে ফেলেছিলেন? যদি সত্যি হয়ে থাকে, তবে তো তারা এখানের বাতাসকে নিত্য নিশীথে ভারি করে রাখবেই। সুভাষচন্দ্র বসু সেই ইতিহাসকে মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন। সে ভিন্ন ইতিহাস। কিন্তু সেই ইতিহাসের কালি মোচন করতে পারলেও কালো কালো প্রেতেরা এই অঞ্চল থেকে মুছে যায়নি—এই পঞ্চাশ বছর আগেও জিপিও-তে তারা নিশিবিহার করে গেছে। একদিন আমার বন্ধুটিকে জিপিও'র কর্মচারী ইয়াসিন সাহেব সন্তর্পণে এক কাহিনী শুনিয়েছিলেন—তাঁর ভাষাতেই সেটা বলে নিতে পারি—

শুনিয়ে সাহেব—আমাকে হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে কেমন অস্পষ্ট আর ঝাপসা

গলায় বলল কোন জিন দেখিনি লেকিন এক বরষাৎ কি রাত—বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায় ইয়াসিন। তার গালে চোয়াল দুটো কেমন খিলের মত এঁটে বসে। বড় বড় দুটো চোখের শান্ত নরম দৃষ্টি কেমন কঠোর হয়ে ওঠে—

বর্ষার রাতে কি হয়েছিল?

কোন কথা বলল না ইয়াসিন। আদাবের ভঙ্গিতে হাত দুটোকে নাড়িয়ে নাড়িয়ে বার তিনেক বিড়বিড় করে বলল—আল্লা ইয়ে আল্লাহ্—তারপরেই দু'হাতে বুকটা চেপে ধরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আস্তে আস্তে যেন নিজেকেই শুনিয়ে শুনিয়ে অস্পষ্ট স্বরে বলল সামকো (সন্ধ্যায়) বেহেশতিদের (পরলোকের বাসিন্দা) নিয়ে কুনো কথা কি বাতচিৎ করতে হয় না সাহেব—

কেন তাহলে কি হবে?

ওঁরা গোঁসা করবে হুজুর। একটু থেমে আবার আল্লার উদ্দেশ্যে প্রণতি জানিয়ে চাপা গলায় বলল—জিন একবার ক্ষেপে গেলে যে কি করে আউর কি করতে না পারে তা হামি হামার গাঁয়ে দেখেছি স্যার—

কি রকম?

সেই বাড়ির মালিক ছিল হিন্দু। নিয়মিত পুজো আহ্নিক জপতপ করে তবে খানা খাইতো হুজুর—থামল ইয়াসিন। বুঝতে পারলাম মনের ভেতরে সাবেক ঘটনা নিয়ে নাড়াচাড়া চলছে।

লেকিন লোকটার লেড়কা ছিল বহুত বেতমিজ (বেয়াদপ) রায়বেরিলির কলেজে নাকি পড়তো—একটু থামল। তার রেখাজটিল কোঁচকানো মুখখানা ঘৃণায় ইনজিরি (ইংরেজি) পড়ে বাপের ঠাকুর দেবতা কিছু মানতো না—ঠাকুর ঘরে ঢুকতো না—কথায় কথায় একদিন বেমক্কা বলে বসল তার ভোলেভালা মা-বাজানকে হামি তুমাদের ঐ ঠাকুর দেওতা কি ভূত প্রেত কুছু মানি না—কুথাও দেওতা কি অপদেওতা বা প্রেত বলে কিছু নেই—থামল ইয়াসিন। অনেক কথা একসঙ্গে বলার ধকলে বড় বড় নিশ্বাস ফেলতে লাগল।

থাক থাক ইয়াসিন ভাই—আপনার বহুত পরিসান হচ্ছে—

তবুও ইয়াসিন তার সরল আদিম বিশ্বাসে যা বলেছিল তার সারসংক্ষেপ হলো—সেই ইংরাজি পড়া নাস্তিক তরুণটিকে এমন শিক্ষা দিয়েছিল অপদেবতারা, যে জীবনে আর কখনো বলবে না—বলতে পারবে না ভূতপ্রেত বলে কিছু নেই। কি ঘটেছিল তাহলে—

যেদিন বলেছিল ওই ছোকরা জিনপরি সম্বন্ধে সেই আনসান কথা, সেই রাত থেকে তাদের বাড়িতে বড় বড় ঢিল পড়তে শুরু করেছিল। যেখানেই ঢিল পড়ে সেইখানেই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। যেই ঢিল পড়া বন্ধ হয়, অমনি আগুন নিভে যায় আবার যেই ঢিল পড়ে অমনি দপ করে জ্বলে ওঠে আগুন।

ছেলেটির মা-বাবা ভয় পেয়ে গেল। বাড়ির ছাদে যদি ঢিল পড়ে তাহলে তো

বাড়িতে আগুন জ্বলে যাবে—পুড়ে ছাই হয়ে যাবে বাড়িঘর দামি দামি জিনিসপত্র। মা তাড়াতাড়ি ঠাকুরঘরে দড়াম করে খিল দিয়ে গৃহদেবতা রাধামাধবের পায়ে আছড়ে পড়লেন। বাবা ছুটলেন ওঝার কাছে।

এক মুসলমান ফকির এলেন। বহুদর্শী গুণীন। তিনি কি সব বয়েৎ আউড়ালেন। বাড়িটাকে ঘুরে ঘুরে তিন তিনবার প্রদক্ষিণ করে বললেন, আপনাদের বাড়ির পাশেই যে কামরাঙা গাছটি দেখছেন, তার নিচে উঁচু ঢিবিটা হলো এক মস্ত বড় সন্ত পীর ফকিরের কবর। ফকির বাবা আপনার কথা শুনে রুষ্ট হয়েছেন। আর ভূতপ্রেত পরকালকে অস্বীকার করার মানে তো ইহকালের এই সুখদুঃখ আনন্দ বিষাদ দিয়ে ঘেরা জীবনটাকেও অস্বীকার করা—একটাই তো চেন—এক সুতো দিয়েই বাঁধা আছে দুটো লোক—ইহলোক-পরলোক—আরও অনেক কথা বললেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন, জেনে রাখবেন, মানুষ মরে গেলেও তার আত্মা থাকে। তাঁরা আপনাদের সব কথা শুনতে পান। আপনার ছেলে যেন কখনো আর এরকম বেয়াদপি না করে। আর পর পর তিনদিন ফকির সাহেবের কবরে চেরাগ জ্বেলে আগরবাতি দিয়ে দেবেন—এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিল ইয়াসিন মিঞা। তারপর অস্ফুটস্বরে শুধু বলল, ভূতপ্রেত বা জিন পরিকে একবার বিগড়ে দিলে বহুত খতরনাক চীজ হোয়ে যায়—

বর্ষার রাতে জিপিও'র বাড়িতে কি হয়েছিল?

হামার হুজুর নাইট ডিউটি পড়েছিল। সেন্ট্রাল ডেসপ্যাচে কাম করতেছি—আউর তিন কেরাণীবাবু ভি ছিল—বহুত পার্সেল ছিল—একটু থামল ইয়াসিন। তার চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠল।

রাত তখন দুটো হবে, এই পর্যন্ত বলে প্রচণ্ড উত্তেজনায় আবেগে ভয়ে যেন তার চেতনা কেমন আড়ষ্ঠ হয়ে গেল। আর কোন কথাই বলতে পারল না।

তবে কখনো থেমে কখনো উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে সেই ঝড়জলের রাত্রের যে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছিল ইয়াসিন তা এখানে খুব সংক্ষেপে বলা হলো—

রাত দুটো নাগাদ সেন্ট্রাল ডেসপ্যাচ ছাড়িয়ে অনেক-অনেক ভেতরে চিঠি শর্টিং-এর লম্বা টেবিল পেরিয়ে একেবারে উত্তর-পশ্চিম কোণে করিডরের ঘন অন্ধকার আরও গাঢ় নিস্তব্ধতাকে শিউরে দিয়ে হঠাৎ আওয়াজ উঠল চিঁহি চিঁহি চিঁহি—একসঙ্গে যেন অনেকগুলো ঘোড়া ডাকছে—

কেরানিবাবুরা কেউ কাজ করে টেবিলেই ব্যাগ মাথায় দিয়ে ঘুমে কাদা হয়ে গিয়েছে, কেউ বসে বসেই ঢুলছে। তবুও তাদের বলল ইয়াসিন, স্যার কান খাড়া করে শুনুন—কোন আওয়াজ পাচ্ছেন?

ইয়াসিন ভাই তোমার বোধহয় গাঁজার মাত্রাটা একটু বেশি হয়েছে—বাবুরা হেসে উড়িয়ে দেন—

ইয়াসিন কিন্তু চুপ করে বাবুদের মত ঘুমের আমেজের ভেতরে তুলিয়ে বসে থাকতে পারল না। সে সেই ঘোড়ার ডাকের শব্দটাকে অনুসরণ করে ছুটতে লাগল। যত কাছে যায় ততই ঘোড়ার হ্রেষারব আরো জোর হয়ে কানে বাজে। ছুটতে ছুটতে ইয়াসিনের মনে হয়—ঠিক শুনছে তো! না—নেশাভাঙ জীবনে কখনো করে না। কোরানের হাদিসে আছে যারা মদ গেলে, তাড়ি খায় কি চুল্লু টানে তারা কখনো বেহেসতে যেতে পারে না।

চিঁহি—চিঁহি—চিঁহি—ই-ই-ই—শব্দটা যেন ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন আর নির্জন জনমানবহীন এক একটা ডিপার্টমেণ্টের শূন্য ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে আছড়ে পড়ছে কালেক্টরি বিল্ডিং ঘেঁষা জি.পি.ও'র বাউণ্ডারি ওয়ালে। দৌড়ে সেদিকে যেতেই এমন আশ্চর্য আর অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিল সে যে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল!

তারপরে কি হয়েছিল। কে বা কারা এসে তাকে তুলেছিল সেসব কিছু বলতে পারে না ইয়াসিন।

চোখ খুলে দেখেছিল কেয়ারটেকারের ঘরে একটা খাটিয়ায় শুয়ে আছে। কেয়ারটেকার এই বছরই রিটায়ার করবে। অনেক দেখেছে সে, হাসতে হাসতে তার পিঠ চাপড়ে বলেছিল—আরে মিঞা ভাই তুমি এই রাত্রে নবাবের ঘোড়ার আস্তাবলের দিকে মরতে এসেছিলে কি করতে।

ঘোড়ার আস্তাবল। কি বলছেন আপনি? ইয়াসিন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

কেয়ারটেকার সাহেব আরও কি বলেছিল সে সব পরের কথা। কিন্তু ইয়াসিন এমন কি দেখেছিল যাতে সে অজ্ঞান হয়ে যায়।

ইয়াসিন ঘোড়ার ডাক ফলো করে অন্ধকারে সাঁতরে সাঁতরে এসে দেখেছিল সারি সারি হৃষ্টপুষ্ট তেজীয়ান ঘোড়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা দোলাচ্ছে। সোনার জরির সুতো দিয়ে তাদের মাথায় গলায় পরানো ছোট ছোট ঘণ্টা বাজছে ঠুন-ঠুন-ঠুন—তাদের কারো পিঠে ঘন লাল টকটকে ভেলভেটের, কারো হলুদ বর্ণের, কারো বা নীল রঙের জামা পরানো—প্রতিটি আচ্ছাদনের নিচে সোনার জরির ঝালর ঝুলছে। অপরূপ সাজে সজ্জিত ঘোড়াগুলোকে যেন মনে হচ্ছে বেহেসতে থেকে নেমে এসেছে—এক একটা সুদূর আর রঙিন স্বপ্নের মত। কিন্তু যেই কেয়ারটেকার ছুটে এসেছিল অমনি ভোজবাজির মত মিলিয়ে গিয়েছিল ঘোড়াগুলো। আর তখুনি জ্ঞান হারিয়ে টলে পড়ে গিয়েছিল ইয়াসিন মিঞা।"

ওই যে ইয়াসিন মিঞা বলে ফেলেছিল সে একটা ঘোড়া-ভূত দেখতে পেয়েছিল—সেটা কি কথার কথা, নাকি তাকে ঘোড়া রোগে ধরেছিল? আসলে এমনতর অশ্বপ্রেত দেখার পিছনে ওই জায়গার ভূগোল আর মাটিটা চিনে নিতে হবে। সিরাজউদ্দৌল্লা, অন্ধকূপ হত্যা, খুন-জখম, আত্মহত্যা হাজার ব্যাপারের মতো এখানে যে একটা বিশাল আস্তাবল ছিল—সেটাও যে একটা ঐতিহাসিক সত্য

নইলে কলকাত্তাইয়া ইতিহাস লেখক এমন কথাটি লিখে বসবেন কেন—'G.P.O. especially of the site on which it stands is said to have served partly as stables of Sirajuddaula." তাহলে সিরাজের আস্তাবলের একটা অংশ নিয়েই জি.পি.ও. বাড়িটা গড়ে উঠেছিল বলতে হয়। পুরনো ফোর্ট উইলিয়াম (রাইটার্স-সংলগ্ন) বাড়িটা তো ঘোড়া-ঘরের উপরই গড়ে ওঠা একটা বাড়ি। এখানেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গড়ে উঠেছিল ১৮০০ সালের গোড়ায়। আমার কথায় প্রত্যয় না হলে জি.পি.ও বাড়ির গায়ে লাগানো পিতলের পাতের লিখন লিপিটা একবার পড়ে মিলিয়ে নেবেন।

আরও একটু কৌতূহলী হলে জানতে পারবেন শুধু এখানে ঘোড়ারাই নৃত্য করতো তা নয়, এখানে নাচতেন সিরাজের পছন্দ করা সুন্দরী নাচিয়েরা। এখানেই যে ছিল সিরাজের নাচমহল—dancing hall. সেই নাচিয়েরা নেই, হয়তো এখানেই তাদের কারো কারোর জীবনান্ত ঘনিয়ে এসেছিল। সিরাজ এবং সিরাজি ভুলে তাদের অতৃপ্ত আত্মা হয়তো এখানেই ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে গড়ে ওঠা জি.পি.ও. মহলে আস্তানা গেড়েছিল। তাদেরই নূপুর নিক্কণ কতদিন শুনতে পেয়েছেন এখানের সে যুগের কর্মচারীরা। এখানের নাচমহলের দুধমাজা কাঠের পাটাতনে পিছলে পড়েছে কত লীলায়িত চরণ, রিনিঝিনি করে বেজে উঠেছে মঞ্জীর নিক্কণ, আর বার বার তাদের যৌবনোচ্ছল পীনবক্ষে কতবার পিছলে পড়েছে সিরাজ আর তার মোসাহেবদের লালসাসিক্ত লোলুপ দৃষ্টি। সে সব দিন বিত গয়া—কবে তার অবসান ঘটেছে। কিন্তু অতৃপ্ত আত্মারা এই সেদিনও ঘুরে বেড়িয়েছে সেই সিরাজ আর সিরাজির খোঁজে। সুন্দরী নারীরা প্রেত হয়ে গেছে ভাবলে কেমন যেন একটা মন কেমন বুক ঠেলে উঠে আসে।

যেমন করে বিহ্বল হয়ে গেছিলেন এল ডি ক্লার্ক হরিচরণবাবু, একদিন তাঁর ষাট ছুঁই-ছুঁই বয়সে তাঁর অফিসের একটা টয়লেটে কম-পাওয়ারের আলোয় আবছায়া, আলো-আঁধারিতে। প্রস্রাবের কটু গন্ধ উপচে ফেলে সেদিন এখানেই তিনি পেয়েছিলেন এক মোহময়ী সুবাস—আতরের মনমাতানো তীব্র অথচ মুগ্ধকর সুগন্ধ। সমস্ত শরীর জুড়ে যেন একটা ঝিঁ-ঝিঁ-লাগা নেশা—মাথা পর্যন্ত তুলতে পারছিলেন না হরিচরণবাবু। সঙ্গে হাওয়ার নরম-গরম ঝাপটা। হরিচরণবাবু অনেকক্ষণ টয়লেটের দরজাটা আঁকড়ে ধরে গঙ্গার দিক থেকে বয়ে আসা হাওয়াটা বুক ভরে টানতে লাগলেন। সহসা তাঁর দু'-চোখে আবেশ ঝরিয়ে করিডরের শেষপ্রান্তের মৃদু আলোর আলো-আঁধারির ঝিলিমিলিতে তিনি স্পষ্ট করে দেখতে পেলেন আলোর কুয়াশাটা ক্রমশ একটা রমণীয়া রমণীর রূপ নিতে, অবয়ব পেতে শুরু করেছে। গোটা শরীর জুড়ে জরি আর কিংখাবের অঙ্গসজ্জা। ওড়নাতে ঝুলছে বাদলা আর অসংখ্য জরির পুঁতির কারুকার্য। শালোয়ারটাকে বিশেষ করে চেনা যাচ্ছে এই দূর থেকেও—সেটা একেবারে খুনখারাবি টকটকে লাল রঙের তৈরি—

কোমর থেকে ক্রমশঃ নিচের দিকে নেমে এসে সরু হতে হতে। সেটা যেখানে এসে পদলগ্ন হয়েছে সেখানেই সেই মৃদু আলোতেই একটা ঝকমকানি—অনেক তারার দেউটি—রুপোর তোড়ার দোলদোলানি-রুমঝুমুনি।

হরিচরণবাবু দেখতে দেখতে কাঠ হয়ে যাচ্ছেন—মূর্তিটি এগিয়ে আসছে ক্রমশ —দু' পায়ে রুপোর শিঞ্জন না নিক্কণ বোঝার মতো অবস্থা নেই তাঁর। এগিয়ে এগিয়ে এসে সে তাঁর একেবারে সামনে এসে না দাঁড়িয়ে চলতে লাগল বরাবর। হরিচরণবাবুর ইচ্ছে হল প্রাণ ছেড়ে ডুকরে কেঁদে ওঠেন—এই বুঝি তাঁর পৈতৃক প্রাণটা আজ অবধারিত থেমে যাবে। কিন্তু গলা দিয়ে তাঁর কান্না বেরিয়ে আসল না। পরিবর্তে একটা ভয়ঙ্কর রকমের গোঙানির আওয়াজ বের হল। সেই আওয়াজ পেয়ে অফিসের কাছাকাছি থাকা কর্মীরা ছুটে এলেন। তাঁরা আসবার আগেই সেই ছায়া শরীর যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

কী হয়েছে হরিবাবু, চোখমুখ এমন কেন? তেনারা কি এসেছিলেন? হরিচরণবাবু গম্ভীর—সব কিছুই কি এমনি করে মিলিয়ে যায়? কিছুতেই বাস্তব আর অবাস্তবটাকে তিনি মেলাতে পারছিলেন না। সে কি কারও চিঠির সন্ধানে এসেছিল?.

মাঝেরহাট ব্রিজের সেই বাড়িটাতে

সে রাতে অমাবস্যা ছিল কিনা জানি না, কিন্তু অন্ধকার ছিল জমাট আর নিশ্চিদ্র। তাকে ভেদ করে যেতে পারে এমন চোখের দৃষ্টি কারও ছিল না। হঠাৎ করে সেই অন্ধকারকে খান খান করে সে রাতে ঝলসে উঠেছিল একটা ধারালো আর নৃশংস ভোজালি—বাঁকানো আর তেরছা। তার হাতলটাকে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরেছিল সে হাতটাও ছিল বোধকরি তেমনিই ধারালো এবং রক্তলোভী।

হঠাৎ করেই সেটা নেমে এসেছিল একটা মানুষের গর্দান লক্ষ্য করে। আর অমনিই নিমেষে, পলক পড়ার আগেই সেটা সেই থরথরিয়ে কেঁপে ওঠা মানুষটার মুণ্ডুটাকে তার ধড় থেকে নামিয়ে ফেলেছিল আশ্চর্য নিপুণতায়। মুণ্ডুটা মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছিল রক্তের একটা উষ্ণ রেখা টানতে টানতে। তখনও তার চোখ দুটিতে কী এক পরম বিস্ময় আর ত্রাসের সম্মিলিত আয়ত ভয়াবহতা।

হঠাৎ করে সে বীভৎসতার পাশে একটা পাগলের বুকচেরা চিৎকার আর সঙ্গে সঙ্গে এক নারীর বুকফাটা আর্তনাদ। সবই ঘটে গেল মুহূর্তের মধ্যে। আর তারপরেই আবার যেন ঝুপ করে অন্ধকার জমাট হয়ে কঠিন হয়ে উঠল। এমন রাত্তির বুঝি ওই সেতুটার নিচে কখনও আবির্ভূত হয়নি।

মাঝেরহাট ব্রিজের কথা বলছি। যার তলা দিয়ে এঁকে বেঁকে এখন চলে গেছে রেলের অজস্র লাইন।

এখন কেউ বলে কিনা জানি না, কিন্তু তিন দশক আগেও এই ব্রিজের আশপাশের স্থানীয় বাসিন্দাদের জিগ্যেস করলেই তাঁরা সেই রাতের খুনি মানুষটার নাম অক্লেশে বলে দিতে পারতেন। এমন করে বলতেন যেন সেই রাতের এই নৃশংস হত্যাটা তাঁদের চোখের সামনেই ঘটেছিল—এমনিই সত্যি, এমনিই প্রত্যক্ষবৎ। এবং তাঁরা কোনও কুণ্ঠা না রেখেই খুনির নাম যে মানু পাল ছিল—তা প্রশ্নকর্তাকে বলে দিতেন। আর তারপরেই সেই খুনি মানুষটার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও বলতেন—'মানু পাল ছিল একটা ভারি রকমের ধনী লোক। তাও ধরুন দেখতে দেখতে এই কাহিনী প্রায় শতখানেক বছরের হতে চলল। আর যার মুণ্ডুটা গড়িয়ে গড়িয়ে এখানের ওইখানে যে বাড়িটা ছিল—তার চত্বরে পড়ে গেছিল—সেটা ছিল মানু পালের স্ত্রীর সুদর্শন এক নাগর, নাম—বিনোদানন্দ। ওই বউটার জন্যেই তো রক্তের এই ফোয়ারা বয়েছিল সেই রাতের ঘন তমিস্রায়।

মানু পালকে আপনাদের চেনার কথা নয়। কলকাতার হাজার বিলাসী বাবুদের তিনি একজন ছিলেন। দেদার পয়সা, উচ্ছল যৌবন, অপরিমিত ভোগাকাঙ্ক্ষা। ঘরে

চার-চারটে বউ থাকতেও ঘরে রাত কাটানোটা অভ্যাস তাঁর কখনই গড়ে ওঠেনি। রাত কাটতো তাঁর কোনও বাঈজীর মদালস বুকের মাঝখানে, সুরার অপরিমিত সৌজন্যে, নূপুর নিক্কণে। তাঁর চার স্ত্রীর মধ্যে যিনি ছোট সবার চেয়ে, সেই ছোট বউয়ের নাম ছিল কুসুমকুমারী।

একদিন কাশী থেকে মানু পালের বাড়িতে উঠেছিলেন সেখানের বিখ্যাত সিল্কের ব্যাপারী সুদর্শন বিনোদানন্দ। এসেই তিনি মানু পালকে এমন বশীভূত করে ফেললেন যে মানু পাল তাঁকে বললেন—বিনোদ তুমি কেন অন্য জায়গায় থাকবে আমার বাড়ি থাকতে। বিনোদানন্দ তো এই আনন্দটাই চাইছিলেন। ততদিনে যে কুসুমফুল ফুটতে আরম্ভ করেছে তাঁর মনে। মানু পাল তার থাকার যাবতীয় বিলাসবহুল ব্যবস্থা করে দিয়েছেন—অন্দরমহলে তাঁর অবাধ বিচরণ। যাকে বলে গেড়ে বসা—সেটাই করে বসেছেন বিনোদ। কুসুম সদ্য যৌবনবতী, কিন্তু মানু পাল তাঁর শরীরী চাহিদার দিকে ফিরেও তাকায় না। সুদর্শন বিনোদানন্দ এই শূন্য স্থানটি পূরণ করে বসলেন—মানু পাল জানতেও পারলেন না এই বিবাহবহির্ভূত মনোরম সম্পর্কটির কথা। প্রতি রজনীতে তাদের নিশাভিসার ঘটে। কুসুমকুমারী সকলের চোখ এড়িয়ে নিঃশব্দে বিনোদের কক্ষে প্রবেশ করেন। এভাবেই চলছিল।

কিন্তু চিরবসন্ত কোনকালেই থাকে না। একদিন রাতে মেঘ কালো করে এল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকানি আর বাজের নিপাতে সে রাত ফালা ফালা। চারদিকেই যেন একটা ঘনায়মান সর্বনাশের আবহাওয়া। ফিনফিনে ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি চড়িয়ে মানু পাল বাঈজির বাড়ি যেতে সাজগোজ করছেন—এহেন সময়ে কুসুম ছুটে এসে তাঁর বুকে আছড়ে পড়লেন। গাল দুটো ধরে চুমো খেয়ে বললেন—'তোমাকে এই সর্বনেশে রাতে কোথাও যেতে দেবো না, আজ তুমি আমার। আমার একটি দিনের কথা শোনো।' বেঁচে থাকুক চূড়াবাঁশি, রাই হেন কত মিলবে দাসী'। মানু পাল বউয়ের শাড়ির আঁচলে বাঁধা থাকার পাত্র নয়, তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

ছেনালি আর কাকে বলে—মানু পাল বের হতেই দরজা বন্ধ করে এক মুখ হেসে কুসুম বিনোদনের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

ঝড়-বৃষ্টির রাতে মানু পালেরও মনের মধ্যে একটা ঝড় এসে বার বার তাঁকে আনমনা করে দিচ্ছিল। কুসুম যেন তাঁকে সেদিন এমনি করে জড়িয়ে ধরে যেতে দিতে নারাজ হচ্ছিল— মনের মধ্যে তার জবাব খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি। বাঈজির নরম বুক আর শরীরী লোভ তাঁকে যেন ধরে রাখতে পারছিল না। তাছাড়া ক'দিন ধরেই তাঁর মেজ বউ কুসুমকুমারীর ব্যাভিচারের কথা আড়ে-ঠারে বলে চলেছিলেন। বাঈজির কাছে বিদায় নিয়ে ফিটনে চড়ে মাঝরাতেই বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন মানু পাল। দারোয়ান গেট খুলে দিতেই তিনি সোজা বিনোদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁক ডাক না করেই শরীরের প্রবল ধাক্কায় দরজার ভিতরের

ছিটকিনি ছিটকে ভেঙে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং হিমশীতল একটা হতবুদ্ধিতে যেন স্থানু হয়ে গেলেন—বিনোদানন্দ-কুসুমকুমারী শয্যায় একাকার।

মদমত্ত মানু পালের নেশা ছুটে গেল। নিজের ঘরে ছুটে গিয়ে বন্দুক এনে এখনই মোকাবিলা করতে হবে। কিন্তু সামনেই ছিল নেপালি কুকরিটা। সেটাই নিয়ে আবার ওই ব্যাভিচারের ঘরে ছুটে গেলেন। কুসুমকুমারী ভয়ে চিৎকার করে উঠে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। শেষবারের মতো তাঁর ওই আর্তনাদ পৃথিবী শুনতে পেয়েছিল। বিনোদলাল পোশাক সামলে পালাতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো তাঁকে ধরে সেই মোক্ষম কোপ।

তারপর থেকে মানু পালের প্রাসাদোপম বাড়ির চারপাশে একটা অন্ধকার সর্বদা জট বেঁধে থাকে। প্রতিবেশীরা কত রাতে দেখতে পেতেন একটা লাল কুর্তা-পরা লোক রাতের অন্ধকারে কাউকে যেন মাঝেরহাট সেতুর নিচে পর্যন্ত খুঁজে চলেছে। কেউ যদি সাহস করে বলে উঠতেন—কে আপনি, কী খুঁজছেন! শুনেই কাউকে যেন পেয়েছেন—এমনভাবে তাকিয়ে তিনি অদৃশ্য হয়ে যেতেন। আবার পরের রাতে এবং আরও আরও পরের রাতে ওই বাড়িতে কতবার দেখা গেছে লাল পাঞ্জাবি পরা একটা লোককে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে! এখনও কি ওই বাড়ির চৌহদ্দিতে সেই খোঁজাটা চলছেই?

কবি করুণানিধান ভূতের সঙ্গে মাংস খেলেন

কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়কে এখনকার পড়ুয়ারা কতখানি চেনেন-জানেন—বলা মুশকিল। অথচ তাঁর লেখা কবিতা একসময় লোকের মুখে মুখে ফিরতো। কিসা গৌতমীর সম্পর্কে লেখা তাঁর কবিতাটির কয়েক পংক্তি এখনও প্রবীণেরা হয়তো উচ্চারণ করতে পারবেন তাঁদের স্মৃতি থেকে—

'দুয়ারে দুয়ারে কাঁদিয়া ফিরি গো দুলালে আগলি বক্ষে'

সেই মৃত সন্তানকে বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টার উল্লেখ করে কবি আরও লিখেছিলেন—

শত ক্রন্দনে মেলে না নয়ন
চুরি গেছে মোর আঁচলের ধন
অভাগী বিহগী আজিকে যেন গো মরণ শ্যেনের পক্ষে।...

করুণানিধানের এক আত্মীয় হুগলি জেলার চুঁচুড়োর কালেক্টরি অফিসে চাকরি করতেন। তিনি বিয়ে-থা করেননি, আপন খেয়ালে চলতেন। সংসারে না ছিল তাঁর কোনও বাঁধন, না ছিল কোনও দায়িত্ব-ভার। দু-একটা সপ্তাহ বাদ গেলেও বেশিরভাগ শনিবার ও রবিবার অফিসের কাজ সেরে সোজা করুণানিধানদের কলকাতার বাড়িতে চলে আসতেন। এটাই তাঁর প্রায় রুটিনে দাঁড়িয়ে গেছিল। শনিবার অফিসের শেষে সকাল সকাল চলে এসে শনি আর রবিবারের রাত কাটিয়ে সোমবার সকালের ট্রেনে অফিস চলে যেতেন। চুঁচুড়োতে একটা থেকে পাঁচটা রাত কোনক্রমে কাটিয়ে সম্পর্কে দাদুর বাড়িতে শনিবারে চলে আসা। এটাই ছিল তাঁর সাপ্তাহিক নির্ঘণ্ট। কখনও কখনও শনিবারে অফিস কামাই করে শুক্রবার রাতেও চলে আসতেন। এজন্যে করুণানিধান তাঁকে কতদিন বকাবকি করেছেন—তার ইয়ত্তা নেই। তিনি প্রতিবাদ করতেন না, শুধু বলতেন—ভাল লাগছিল না, তাই চলে এলাম। একদিনের মাইনে কাটবে তো? তা কাটুক না। আমার অত টাকা দিয়ে কী হবে!

মাঝখানে তিনি দু-তিন সপ্তাহ এলেন না। তারপরে একদিন শুক্রবার সন্ধের পরে করুণানিধানের কলকাতার বাসায় এলেন। এসেই উপযাচক হয়ে করুণা-নিধানকে বললেন—কাল অফিসে ছুটি নিয়েছি, কামাই করছি না।' শনিবার দিনটা আড্ডায় ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়ে রবিবার সকাল হতেই বললেন—'আজ জমিয়ে মাংসভাত খেতে হবে।' এই বলেই চটি গলিয়ে বাজারে গিয়ে সেখান থেকে থলি ভর্তি করে মাংস নিয়ে এলেন। রান্না হলে সবাই মিলে বসে কব্জি ডুবিয়ে খাওয়া গেল। রাতে আর তেমন কিছু খেলেন না। সোমবার সকাল হতেই স্নান-টান সেরে

সাড়ে আটটা নাগাদ দুটি ঝোলভাত খেয়ে হাওড়া স্টেশনের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন—সোজা অফিস যাবেন বলে। তাঁকে ট্রামে উঠিয়ে দিয়ে করুণানিধান একটু এগিয়ে ছাতুবাবুর বাজারে গেলেন, সামান্য আনাজপত্র এটা-সেটা কিনে বাড়ি ফিরে এলেন তিনি।

এসেই দেখেন তাঁর জন্যে টেলিগ্রাফ-পিওন অপেক্ষা করছেন। তাঁর নামেই 'তার' এসেছে। সই করে টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে পড়তেই তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। টেলিগ্রামে স্পষ্ট লেখা রয়েছে—'আপনার আত্মীয়টি (অর্থাৎ যিনি হুগলি কালেক্টরেটে চাকরি করেন) গত শুক্রবার সন্ধ্যার পরে হাসপাতালে কলেরায় মারা গেছেন। সংবাদ দিতে দেরি হল, সেজন্যে মাপ চাইছি—জনৈক বন্ধু।'

টেলিগ্রাম পড়ে মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারলেন না। এ কেমন বদ রসিকতা? গত শুক্রবারই তিনি তাঁদের বাড়িতে এসেছিলেন। রবিবার নিজে মাংস কিনে এনে পেট ভরে খেয়েছেন। আজ সোমবারই একটু আগে তাঁকে ট্রামে উঠিয়ে দিয়ে এসেছেন —আর টেলিগ্রামে লেখা—শুক্রবার সন্ধেয় তিনি কলেরায় মারা গেছেন।

টেলিগ্রামটা হাতে নিয়ে আনমনা হয়ে বাড়িতে ঢুকে সবাইকে সেটা পড়ে শোনালেন। সবাই পরামর্শ দিলেন—ওটা কেউ মজা করেছে। ওটা ছিঁড়ে ফেলে উড়িয়ে দাও।

তাঁরও তাই মনে হল। আবার মনটা খচ্‌খচ্‌ করতেও লাগল। ব্যাপারটা সরেজমিন তদন্ত করার দরকার। আহারে বেচারার কেউ নেই, একবার খোঁজ নিয়ে দেখাটা উচিত। এই মনে করে করুণানিধান দুপুরে দুটি খেয়ে সোজা চুঁচুড়োর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তাঁর অফিসে গিয়ে হাজির হতেই তাঁর বন্ধুরা ৫/৭ জন এসে তাঁকে ঘিরে ধরলেন। একজন গিয়ে তাঁর চেয়ারটি নিয়ে এসে কবিকে বসতে দিলেন। তারপর তাঁরা যা বললেন, তা এইরকম ঃ

বৃহস্পতিবার রাতেই তাঁদের সহকর্মীর ভেদবমি শুরু হয়। শুক্রবার সকালে সকলে মিলে তাকে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে দেন। কিন্তু ডাক্তারদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে সে ওইদিন সন্ধ্যাতেই মারা যায়। রাতে আমরা অনেকে মিলে তার শবদেহ নিয়ে শ্মশানে যাই। দাহ করতে করতে ভোর হয়ে যায়, শনিবার সকালে যে যার বাড়িতে ফেরেন। ক্লান্ত ছিলেন বলে তাঁরা আর যোগাযোগ করতে পারেননি। রবিবারটাও নানা গোলমালে কেটে যায়। ওর কাছে আপনার কথা অনেকবার শুনেছি, তার কাছে আপনার ঠিকানাও জেনেছিলাম। আজ সকালেই আপনাকে টেলিগ্রাম করেছি। দেরি হওয়ার জন্যে মার্জনা চাইছি।

করুণানিধানের কানে যেন সেসব কথা গেল না। শুক্রবার থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত তিনি তাঁদের সঙ্গে কাটিয়ে গেলেন। তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। বাড়ি ফিরে এসে সব কথা জানাতে বাড়ির সবাই হতবাক।

করুণানিধান নিজের চোখে ভূত দেখার কথা নিজেই লিখে গেছেন তাঁর 'মৃত্যুর পরে' স্মৃতিকথায়।

জ্যান্ত মেমের ঘাড়ে মামদো আত্মা

শিয়ালদহ স্টেশন থেকে মৌলালির দিকে যাচ্ছেন—বাঁদিকে একটা রাস্তার মোড়ে দেখতে পাবেন একটা মিষ্টির দোকান—দ্বারিক ঘোষের মিষ্টির দোকান। আগে ওই দোকানের সাইনবোর্ডে জ্বলজ্বল করে লেখা থাকতো—'দ্বারিকই বাংলার প্রথম রসস্রষ্টা'—তার রসগোল্লার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমনই একটা রসালো মন্তব্য করেছিলেন। এখন দ্বারিক ঘোষ নেই, রবিঠাকুরও নেই, জানি না সেই রসগোল্লার স্বাদও তেমন আছে কিনা—কিন্তু বর্তমান মালিকের রবিঠাকুরের এই প্রশংসাপত্রে কোনও আস্থা নেই বলেই সম্ভবত নতুন সাইনবোর্ডে রবীন্দ্রনাথ নির্বাসিত।

এই দোকানটির গা-লাগাও রাস্তাটিই এখন এন্টালি বলে পরিচিত। আগে এই রাস্তার নামটি ছিল ইটালি। এটাকে হয়তো এদেশীয় কোনও সাহেবের পছন্দ হয়নি। তিনি বদলে করে দিয়েছিলেন এন্টালি—সেই নামেই এখন মহল্লাটি পরিচিত। এককালে এখানে বসবাস করতেন প্রচুর সংখ্যায় অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানেরা, বাস করতেন পালিত পরিবার, দেব পরিবারদের পাশাপাশি। এই অঞ্চলের একটি রাস্তার নাম হসপিটাল রোড।'এই রাস্তার ওপরেই একটা জীর্ণ বাড়ির কথা এখন পাঠকদের কাছে বলা যেতে পারে। বাড়িটা আর নেই। কিন্তু বাড়িটার সূত্রে একটি প্রেতের আবির্ভাব ও বসবাসের কথার স্মৃতি-মুদ্রণের প্রসঙ্গে এর কথাটি আমাদের মনে আছে।

মনে থাকার বিষয়টি বিশেষ করে মনে ছিল সেকালের এক মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ড. সুহৃদকৃষ্ণ বসুর। তাঁর কাছে চিকিৎসার কারণে এসেছিলেন এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক। নিজের চিকিৎসার জন্যে তিনি আসেননি, এসেছিলেন তাঁর মাঝবয়সী এক বোনের চিকিৎসার জন্যে। রোগীকেও নিয়ে আসেননি। এসে বলেছিলেন তাঁর বোনের এক অদ্ভুত মানসিক বিকারের কথা। এমনধারা অসুখ পৃথিবীতে ক'জনের যে হয়েছিল—তা আমাদের জানা নেই। ডা. বসুও কম অবাক হননি। কারণ জীবনে এমনতর রোগীর চিকিৎসা তিনি কখনও করেননি। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনাটি বহুজনকে জানানোর জন্যে তিনি 'ব্রহ্মবিদ্যা' নামে একটি পত্রিকায় তাঁর অভিজ্ঞতার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে যান।

বঙ্গীয় তত্ত্ব সভা নামে একটি সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মন্মথমোহন বসু। দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ প্রভৃতিরা তাঁর ঘনিষ্ঠজন ছিলেন। কর্নেল অল্‌কট্ এবং মাদাম ব্লাভাটস্কির থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রভাবে বসুমশায়

'ব্রহ্মবিদ্যা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন বাংলা ১৩১৯ সনের বৈশাখ মাসে। প্রেতচর্চা ছিল এই পত্রিকার অন্যতম আলোচ্য বিষয়। এর অষ্টাদশ বর্ষের মাস সংখ্যায় (বাং ১৩৪৭) ডা. সুহৃদকৃষ্ণ বসু তাঁর চিকিৎসা জীবনের এই বিরল অভিজ্ঞতা বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্য এখানে হুবহু তুলে দেওয়া হল। তবে তিনি লিখেছিলেন সাধু ভাষায়—একালের পাঠকদের জন্যে বন্ধুবর সুভাষ সমাজদারের কলমের সহযোগিতায় আমরা আমাদের মৌখিক ভাষায় ইতস্তত রদবদলসহ প্রকাশ করছি।

"১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাস।

কলকাতায় বেশ জাঁকিয়ে শীত পড়েছিল। সেদিন ছিল রবিবার। ছুটির দিন। গায়ে বেশ করে লেপ মুড়ি দিয়ে বিছানায় বসে যেই চায়ের কাপে চুমুক দিতে যাব এমন সময় পরিচারক এসে খবর দিল—এক সাহেব দেখা করতে এয়েছেন—

বাধ্য হয়ে এলাম ড্রইংরুমে। দেখলাম—মাঝবয়সী এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক মাথা নিচু করে বসে রয়েছেন। চোখের কোলে কোলে জমাট কালি পড়েছে। আমাকে দেখেই হাতজোড় করে বললেন, গুড মর্নিং স্যার—আমি খুব বিপদে পড়ে এসেছি। আমার একমাত্র বোনের ওপর কোন দুষ্টু প্রেতাত্মা ভর করেছে। দিন রাত শুধু ঘরের ভেতরে পায়চারি করছে রোজি। আর সবচেয়ে আশ্চর্য—উর্দু ভাষায় বিড় বিড় করে বকছে। অথচ আমার চোদ্দ পুরুষ ইংরেজি ছাড়া আর কোন ভাষা কস্মিনকালে জানেই না। যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই মারছে রোজি—একটু থামলেন তিনি। আবার কেমন ফ্যাসফেসে গলায় বললেন, ওর রাগটা যেন আমার ঠাকুমা, মাসিমা, মা—মানে এন্ডারলি মেয়েদের ওপরেই বড্ড বেশি।

—কিন্তু আমি তো ওঝা নই এবং কোন তুকতাকও জানি না—এক্ষেত্রে আমি আপনার জন্য কি করতে পারি বলুন তো?

—স্যার, আমি শুনেছি এইরকম বিপদে আপনি অনেককে সাহায্য করেছেন—লোকটি কেমন করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, চলুন না স্যার, রোজির অবস্থাটা নিজের চোখে দেখে অন্তত কোন সৎ পরামর্শ তো দিতে পারবেন!

এরপরে আর কিছু বলা যায় না। বাধ্য হয়ে যেতে হলো। এসব কেসে দেরি করতে নেই। তাতে অঘটন ঘটে—তখুনি তার সঙ্গে গেলাম।

রাস্তার ওপর থেকেই দোতলায় যাওয়ার সিঁড়ি। সিঁড়িটা কাঠের। তার এখানে-সেখানে ঘুণ ধরেছে। খুব সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম। নিচের তলায় ছোট ছোট অনেকগুলো ঘর। সেখানে—

সেখানে তাদের ভাড়াটেরা থাকেন। দোতলার মুখেই বিশাল একটা হলঘর। তার দু'পাশে দুটো দুটো করে মোট চারটে ছোট ছোট কামরা। তারপরেই

রেলিং-দেওয়া এক ফালি বারান্দা। বাড়িটার পিছনে দক্ষিণে এক টুকরো পতিত জমিও আছে বলে মনে হলো। তার একপাশে অষ্টাবক্র মুনির মতো একটা ন্যাড়া বেলগাছের নিচে কার একটা কবরের উঁচু ঢিপির ওপর কে যেন শ্বেতশুভ্র বেলীফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে রেখেছে। আশ্চর্য লাগল।

'গোস্ট-হণ্টেড' হাউসের আশপাশেও খুব ভালো করে 'ওয়াচ' করতে হয়। দিনের বেলাতেও অশরীরী আত্মার নানা অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের খোঁজ-খবর পাওয়া যায়। তাই চারদিকে দেখতে দেখতে ওপরে উঠছিলাম। কিন্তু সেই হলঘরে পা দিতেই বীভৎস আর করুণ একটা দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। ভেতরে যেতে আর পা উঠল না। থমকে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম।

বেশ মোটাসোটা চেহারার একটা মেয়ে। ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়স হবে। পরণে খাকি হাফপ্যাণ্ট। গায়ে গেঞ্জি। কালো কেউটের বাচ্চার মতো ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল দুলছে ঘাড়ের ওপরে। গায়ের গেঞ্জির ওপরে কোমরে দুই তিনটা বেল্ট দিয়ে শক্ত করে বাঁধা আছে তার প্যাণ্ট। তার সেই উদ্বেল যৌবনভরা দেহে সেই অপ্রতুল বেশবাস প্রায় নগ্নতারই সামিল বলা যায়। পাঁচ-ছ'জন শক্ত সমর্থ্য জওয়ান পুরুষও তাকে ধরে রাখতে পারছে না। তাদের কাউকে কনুইয়ের গুঁতো মেরে, কাউকে দু'হাতে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে ফেলে দিচ্ছে। মত্ত একটা হস্তিনীর মতো তার সে কী শক্তি! আর দু'হাতে বুক চেপে ধরে মর্মান্তিক আক্রোশে চিৎকার করে কাকে যেন গালাগাল করছে—বদ্‌তমিজ, উল্লু—কামিনা কাঁহাকা—হঠাৎ সিঁড়ির মুখে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে ছুটে এসে এমন করে আমাকে লাথি মেরে বসল যে আমি সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ে যেতাম। কিন্তু কোন রকমে রেলিং ধরে ফেলে নিজেকে সামনে নিলাম। রোজি খিলখিল করে হেসে বলল, রাইটলি সার্ভড—বলেই আবার দাঁতে দাঁত চেপে ধরে ফারসি ভাষায় গাল দিতে শুরু করল—গুরজকি বাচ্চা (শুয়োরের বাচ্চা), সাগিহার (কুকুর), বদজাত কাঁহাকা—

—এই রোজি, কাকে কি বলছিস এসব—চিৎকার করে বলল তার দাদা। রোজি তাকে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে মারতে ছুটল। পাড়া প্রতিবেশীরা পিছনে থেকে জাপটে ধরে তাকে কোনরকমে নিরস্ত করল। আমি আর তার সামনে যেতে সাহস করলাম না। রোজির দাদা কুণ্ঠিত হয়ে বলল, আপনি কিছু মনে করবেন না স্যার—

—না—না—ও কি আর ইচ্ছে করে করছে! শুনুন আমার কতকগুলো জিজ্ঞাস্য আছে।

—বলুন।

—আপনার বোনকে উর্দু কি ফারসি কখনো শিখিয়েছিলেন?

—না। এদেশী কোন ভাষাই আমরা শেখা প্রয়োজন মনে করিনি—আমাদের সোসাইটি—

—চুপ করুন—যা জিজ্ঞাসা করেছি তার বাইরে কোন বাড়তি কথা বলবেন না।

—সরি স্যার।

—উর্দু এবং ফারসি ভাষায় তাহলে কথা বলছে কবে থেকে?

—ওর এই অ্যাবনর্মাল অবস্থা হওয়ার পর থেকেই।

—কোন সময়ে সে একটু শান্ত থাকে?

—সন্ধ্যার ঠিক আগে।

—কাদের ওপরে ও বেশি অত্যাচার করে?

—বলেছি তো, বৃদ্ধাদের ওপর দারুণ আক্রোশ। সামনে পেলেই আঁচড়ে কামড়ে একেবারে রক্তারক্তি করে দেয়।

—আচ্ছা—এখন যাচ্ছি বুঝলেন, রোজির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললাম—সন্ধ্যার আগে আসবো।

রোজির কথাই ভাবতে ভাবতে বাড়িতে ফিরে এলাম। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়স। আনম্যারেড। সেক্স পারভারশান? কোন ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা? না—তাহলে তো ডিরেঞ্জমেণ্ট অফ ব্রেন হতে পারতো; হতে পারতো হিস্টিরিয়া, হতে পারতো আরও কত কি—কিন্তু যে ভাষা সে কোনদিন জানে না—সেই ভাষায় অনর্গল গালাগাল করছে কেমন করে! কেন বুড়িদের ওপরেই তার অত রাগ। সব মিলিয়ে কেমন দুর্বোধ্য হেঁয়ালির মতো মনে হতে লাগল আমার।

আমি সাইক্রিয়াট্রিস্ট। মনোবিজ্ঞানী। কোন মুসলমান দরবেশ কি ফকিরের আত্মা মেয়েটির ওপরে ভর করেছে এটা বিশ্বাস করতে মন চায় না। রোজির মতো বয়সের কি কি কারণে মানসিক বিপর্যয় হতে পারে তা নিয়ে একটু পড়াশুনাও করলাম। আকস্মিক কোন আঘাত, কোন হতাশা—সচরাচর যেসব কারণে মনের স্থিরতা নষ্ট হয়ে যায়, তাছাড়াও ডক্টর ক্যামিলে ফ্ল্যামারিয়ন (Dr. Camille Flammarion) সুবিখ্যাত এক স্পিরিচুয়্যালিস্ট বলেছেন*—যদি কোন বাড়িতে কোন ব্যক্তি অতৃপ্ত ভোগবাসনা নিয়ে মারা যায় তাহলে তার প্রেতাত্মা সেই বাড়ির বয়স্থা মেয়েকে নানাভাবে উৎপীড়ন করে থাকে—এই কথাটিরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়, আমাদের দেশের বিখ্যাত থিয়োসফিস্ট ডক্টর হীরেন্দ্রনাথ দত্তের* এই উক্তির ভেতরে—'তীব্র কামনা-বাসনা নিয়ে যদি কেউ মারা যায় তারা প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়। মাঝে মাঝে দেখা যায় সেই মৃত ব্যক্তির আত্মা কোন কুমারীর দেহে ভর করে তার কামনা চরিতার্থ করে থাকে'—

এসব পড়ে মনে হলো রোজির দাদার কাছে তাদের বাড়ির হিস্ট্রি নিতে হবে।

সন্ধ্যার কিছু আগে তাদের বাড়িতে গেলাম। দেখলাম খুব শান্ত আর লক্ষ্মী একটি মেয়ের মত রোজি সেই হলঘরের মেঝেতে একটি সুদৃশ্য গালিচা বিছিয়ে

• Haunted House, Camille Flammarion, p. 64

• বেদান্ত ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান, ড. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রহ্মবিদ্যা, চৈত্র, ১৩৪২, পৃঃ ৫৪৬।)

নিচ্ছে। তারপর পশ্চিমদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে এমন হাবভাব করতে লাগল যেন মনে হলো সে বুঝি নামাজ পড়বে। যা ভেবেছি ঠিক তাই। রোজি গম্ভীর কণ্ঠে নির্ভুল উচ্চারণে আজান দিতে লাগল—

আল্লাহু আকবর

আশহাদু আল্‌লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্

আমি ইশারায় রোজির অগ্রজকে ডাকলাম। বললাম—আচ্ছা এই বাড়ি কি আপনারা কিনেছেন?

—হ্যাঁ স্যার—এটা কেনা বাড়ি। বছর দশেক হলো আছি।

—এই বাড়িতে কেউ কি কখনো অপঘাতে মারা গিয়েছে?

—বলতে পারবো না স্যার—আমরা এখানে আসার আগে যদি কিছু হয়ে থাকে—

আশ্‌হাদু আল্‌লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্...

রোজি তন্ময় হয়ে ওস্তাদ মুয়াজ্জিনের মতই আজানের সুর গেয়ে চলেছে। —আমাকে এই মুহূর্তে একটা কোরান এনে দিতে পারেন? চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ করে বললাম তার দাদাকে। ভদ্রলোক ছুটল বাড়ির সামনে রাস্তার ওপারে এক মুসলমান দর্জির দোকানে। কয়েক মিনিট পরে মুখ ভার করে ফিরে এল সে। বলল, স্যার কোন হিন্দুর হাতে কোরান দেবে না দর্জি।

আমি মোটেই হতাশ হলাম না। সৌভাগ্যক্রমে কোরানের দু' একটা আয়াত্ (শ্লোক) আমার মুখস্থ ছিল। আমি স্থির দৃষ্টিতে রোজির দিকে তাকিয়ে সুর করে আবৃত্তি করতে শুরু করলাম—

আইন্না জাহান্নমা লামোহিতাতোম বেল কাফেরিন য়্যাওমা য়্যাগশা গলত্ হ্যায়—

মেয়েটি হঠাৎ চিৎকার করে উঠল—তল্‌ফুজ (উচ্চারণ) বিলকুল খারাব্।

—আপকা কহ্‌না সহি হ্যায় (অর্থাৎ আপনি ঠিকই বলেছেন), আমি হেসে বললাম।

—ফির বোলো ফির বোলো, মেয়েটির কণ্ঠে অনুনয় ফুটে উঠল। আমি আবার কোরানের আয়াত্ আওয়াতে শুরু করলাম—

হুমোল আজাবো মেন্

ফাওকেহিম অমেন তাহ্‌তে আর জোলহিম অয়্যাকুনো জুকু...

—সাবাস্ তুম্ হিন্দুকা লড়কা কোরান শরিফ পড়নে কা ভি সওক্ রাখতে হো—বলতে বলতে খুশিতে ভেঙে পড়ে এই প্রথম আমাকে বসার জন্য একটি চেয়ার এগিয়ে দিল আর নিজেও একটা চেয়ারে বসল। আমার মুখোমুখি বসে স্নিগ্ধ গলায় বলল, আয়াত্ বলিয়ে জি—

—কো-তেবা আলায়-কুমোল-কেতা লো-অহুঅ কোরহোল্লা-কম্—আমি বলে চলেছি আর সে ক্রমশ আমার কাছে একটু একটু করে সরে এসে একেবারে আমার

হাঁটুর সঙ্গে তার দুই হাঁটু লাগিয়ে এমন করে বসল যেন সে আমার কত কালের অন্তরঙ্গ—আপনজন। আমি একটার পর একটা আয়াত্ বলছি আর সে বাঁশির সুরে মুগ্ধ সাপিনীর মত ডাইনে বাঁয়ে দুলছে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, নিবিড় একটা অনুভবের সুখে সে যেন আবিষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমি এইবার কঠিন গলায় প্রশ্ন করলাম—আপনি এদের ওপর এত ক্রুদ্ধ হয়েছেন কেন?

—মেয়েটি একটি জঘন্য অন্যায় করেছে—তার উপযুক্ত শাস্তি না দিয়ে ওকে ছাড়বো না।

—কী অন্যায় জানতে পারি কি?

—আমি বারান্দার নিচ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন দোতলা থেকে অপবিত্র বস্ত্রখণ্ড (মেয়েদের গভীর লজ্জার যে জিনিস তারা সঙ্গোপনে লুকিয়ে রাখে) আমার মাথার ওপর ফেলেছে।

—নিশ্চয়ই গুরুতর অপরাধ। কঠিন শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু বৃদ্ধাদের ওপর আপনার এত আক্রোশ কেন?

—এই নোংরা জিনিস যেখানে-সেখানে ফেলতে নেই সেটা তো সাধারণত বর্ষীয়সী মেয়েরাই শেখায়—এই বাড়ির প্রাচীনারা ওকে তা শেখায়নি কেন?

—ঠিক কথা। এবারে আপনাকে একটা কথা বলবো?

—বোলো বেটা।

—আপনি জ্ঞানী ও মহৎ—আপনি অশরীরী—আপনাকে তো মেয়েটি দেখতে পায়নি!

কোন কথা বলল না সেই বিদেহী আত্মা। অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতায় থমথম করতে লাগল সেই হলঘর। শুধু আবছায়া অন্ধকারে আচ্ছন্ন সেই ঘরের দূর কোণ থেকে একটা পোকা ডেকে উঠল—চিপ্-চিপ্-চিপ্—

—হয়তো দেখতে পায়নি। কিন্তু এমন অপবিত্র জিনিস তো রাস্তাঘাটে ছুঁড়ে ফেলা দেওয়াও যে ঠিক নয় সেটা বোঝার মত বয়স নিশ্চয়ই মেয়েটির হয়েছে।

—আপনি ঠিকই বলেছেন। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি এদের দোতলার বারান্দার নিচ দিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন?

—ওদের বাড়ির পিছনে কবরখানাটা লক্ষ্য করছো—ওই সমাধিভূমির গেটের বাঁদিকে যে নতুন কবরটা দেখছো—ওইটিই আমার কবর। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ওই কবর থেকে বেরিয়ে আমি মসজিদে নামাজ পড়তে যেমন যাই তেমনি সেদিনও যাচ্ছিলাম।

—সত্যি স্বীকার করছি, খুবই অন্যায় করেছে মেয়েটি। আচ্ছা ওর এই অপরাধের কি ক্ষমা নেই?

—ক্ষমা? মেয়েটি যে 'গুনাহ' (দোষ) করেছে তাতে কোনদিনই ওকে মাফ করতাম না। কিন্তু আমি তোমার ওপর খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। তাই তোমার অনুরোধে

এবারের মত ওকে ক্ষমা করলাম। ভালো করে বলে দাও এইরকম অপকর্ম আর যেন না করে—হঠাৎ থেমে গেল সেই বিদেহী আত্মা। আবার বলল, আর শোনো, এই বাড়ির প্রত্যেকটি লোক সকলে মিলে যেন পর পর সাতদিন আমার সমাধিতে চেরাগ (প্রদীপ) জ্বালিয়ে দেয় এবং নতজানু হয়ে কুর্নিশ এবং ক্ষমা ভিক্ষা করে।

বলাবাহুল্য কোন অশরীরী আত্মা রোজির মুখ দিয়েই কথাগুলো বলছিল। তার শেষের দিকের কথাগুলো নিস্তব্ধ ঘরে কেমন গমগম করে উঠল আর যেন কঠোর আদেশেরও মত শোনাল। সে আবার যেন বহু—বহু দূর থেকে বলল, আমি এখন চললাম—আমার কথামত যদি কাজ না হয় তাহলে কিন্তু জেনে রাখবে দ্বিগুণ শাস্তি পাবে।

দমকা একটা ঠাণ্ডা বাতাস হু হু করে এল। দূরে সেই ন্যাড়া বেলগাছটার ডালগুলো থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। রোজি শান্ত আর পাথুরে একটা মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

সেদিন থেকে সাতদিন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পরিবারটি সেই প্রেতাত্মার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। রোজি সুস্থ আর স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল। আর ক্রুদ্ধ, বিক্ষুব্ধ সেই প্রেতাত্মার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিল এন্টালির পুলিস হসপিট্যাল রোডের সেই দোতলা বাড়ি।

রোজির দাদা এবং তাদের প্রতিবেশীদের কাছে খোঁজখবর নিয়ে জেনেছিলাম, পীর শাহ আতাউল্লা নামে এক ধার্মিক মুসলমান নাকি কিছুদিন আগে গত হয়েছেন। তিনি দীর্ঘকাল এই অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। এন্টালির পুলিস হসপিট্যাল রোডের শেষপ্রান্তে কবর-ভূমিতে যে নতুন সমাধিটি আছে সেটি সেই পীর ফকির শাহ আতাউল্লার। কে জানে হয়তো তাঁরই অশরীরী আত্মা রোজিদের দোতলার নিচ দিয়ে মসজিদের মধ্যে নমাজ পড়তে যেত।'

এত কথা, এমন অবিশ্বাস্য অথচ প্রায় বিশ্বাসনীয় বর্ণনাটি লেখার পরেও ডা. বসুর মনের সন্দেহ অপসারিত হয়নি। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন—কী করে একজন মৃত ব্যক্তির আত্মা একজন জীবিত ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে তাকে দিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করিয়ে নিতে পারে? এন্টালির এই দোতলা বাড়িটার বাসিন্দা রোজি কি এর একতম উদাহরণ হয়ে রইলেন? আসলে হয়তো ডা. বসু সে সময়ে জানতেন না প্রেততত্ত্বে এমনতর ব্যাপার অনেক আগে থেকেই মান্যতা পেয়ে এসেছে। স্বয়ং শ্রীমতী ব্লাভাটস্কি এ বিষয়ে তত্ত্ব খাড়া করে গেছেন এবং তার নাম দিয়ে গেছেন 'পরকায়াতত্ত্ব'। তবে পীর ফকিরের আত্মা কেন যে রোজির ওপরে ভর করে বসলো তার উপযুক্ত কারণ ব্যাখ্যা করা মুশকিল!

নিজের চোখে ভূত দেখা ঃ এদিক-সেদিক

১

কুকুর ভূতের কারসাজি

কলকাতায় শুধু পুরুষেরা ভূত দেখতেন না, মেয়েরাও দেখতেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো মহিলা সম্ভবত রাসসুন্দরী দাসী। ভদ্রমহিলার জন্ম ১৮০৯ সালে আর এই ভারতবর্ষ থেকে তিনি চিরবিদায় নেন ১৮৯৯ সালে ৯০ বছর বয়সে। ভদ্রমহিলা তাঁর জীবনের বিচিত্র সব কাহিনী নিয়ে একটি চমৎকার আত্মজীবনী লিখে গেছেন। সেটি বই আকারে প্রথম বের হয়। তারপর অনেকবার ছাপা হয়েছে। তাতেই তার ভূত দেখার কথা আমরা ছাপার অক্ষরে প্রথম পড়ার সুযোগ পেলাম। অনেকে আমরা যে আনন্দবাজার পত্রিকা পড়ি, একসময়ে তার সম্পাদক ছিলেন অশোককুমার সরকার। রাসসুন্দরী দেবী তাঁর দিদিমার মা।

রাসসুন্দরীর ভূত দেখার গল্পটা বলি। ছোট্ট থেকেই আর পাঁচটা ছোটদের মতো তিনিও বড়দের কাছে ভূতের কথা শুনতেন। হয়তো বা বড়রা ভূতের সঙ্গে তাদের প্রিয়তমা পত্নী শ্রীমতী পেত্নীসুন্দরীর কথা বলে ভয় দেখাতেন তাঁকে। তখন থেকেই ভূত আছে কিনা জানবার জন্যে তিনি পাগল। আবার একথাও তো আমরা শুনি যে একদল লোক বলেন ভূত নেই। সেই একদল লোক কথাটা বুক ঠুকে বলেন—না, মুখ ঢেকে বলেন বলতে পারবো না। যাঁরা বলে থাকেন ভাগ্যে আমি বিশ্বাস করি না, তাঁদেরই দেখেছি ফুটপাথে বসা জ্যোতিষীবাবাজির কাছে হাত পেতে বসে ভবিষ্যৎ জেনে নিচ্ছেন। ভূতে বিশ্বাস না-করা ব্যাপারটাও হল তেমনি একটা ছেঁদো কথা। তেমন অবস্থা হলে তাঁর কাপড়-চোপড় ঠিক থাকবে কিনা—এই গ্যারান্টি দেওয়া মুশকিল। রাসসুন্দরী এককালে 'ভূত নেই' যাঁরা বলতেন—তাঁদের দলেই ছিলেন। সেই রকমই ভাবতেন। কিন্তু পরে মত বদল ঘটে যায়। তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করেন—'যথার্থই ভূত আছে।' এবং একদিন তিনি নিজের চোখে ভূত দেখেও বসেন। 'যাকে তিনি স্বচক্ষে দেখেন'—তাঁর বিশ্বাস সেটা ভূতই ছিল।

একদিন রাসসুন্দরী দেবী একটু বেলা হলে স্নান করবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন। বাড়ির ডানদিকে একটা বড়-সড় বাগান। বাগানে বিশাল বিশাল পুরনো তেঁতুল-গাছের সারি। স্নান করার আগে কী মনে করে বাগানের ভেতর গিয়ে একটা বড় তেঁতুলগাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। তেঁতুল গাছটার গা লেগে একটা বাবলা গাছ। বাবলা গাছের একটা ডাল একদিকে একেবারে হেলে পড়েছে। যেদিকে হেলেছে ডালখানি সেদিকটা বেশ ফাঁকা, পাশে অন্য কোনো বড় গাছ নেই, ছোটখাটো দু-চারটে বুনোগাছ ছাড়া। তখন বেলা হয়েছে অনেকখানি, সূয্যিমামার

আলো গোটা জায়গাটা জুড়ে এসে বাগানটাকে আলোয় আলোয় আলো করে দিয়েছে। ওই ফটফটে আলোয় যেই হেলে-পড়া ডালটার দিকে তাঁর নজর পড়ল, অমনি তিনি দেখতে পেল ডালখানার ওপরে একটা কুকুর শুয়ে আছে। কিন্তু কুকুরটাকে দেখে তাঁর মনে হল ওটা যেন কুকুর নয়, একটা মানুষ। কুকুরটা—না, না মানুষটা—না, না, কুকুরটার পেটটা ডালে লেগে আছে আর সেটার মাথাটা সামনের দিকে আর পিছনের পা দুটো লেজটা পিছনের দিকে ঝুলে আছে। সামনের আর পিছনের পা গুলোতে লাল রঙের চারটে শাঁখা ঝলমল করছে। তবে কি ওটা কোনও সধবা মেয়ে। রাসসুন্দরীর বুকের রক্তটা একবার ঝল্‌কে-ছল্‌কে উঠল—চোখে আর তাঁর পলক পড়ে না, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন ঠায় দাঁড়িয়ে। দেখছেন আর ভাবছেন—কী এক অদ্ভুত আশ্চর্য কাণ্ড তিনি দেখছেন! গাছের ওপর কুকুর শুয়ে আছে এমনি করে! দেখতে দেখতে পুরো একটা ঘণ্টা কেটে গেছে—কুকুরটা সেই একই রকম ভঙ্গিতে শুয়ে আছে—তার হাত-পায়ে ঝলমলে শাঁখা—এমনটা কী কখনও হতে পারে! দিনদুপুর বলে কথা—রাতের আবছা অন্ধকারে দেখা নয় যে তিনি ভুল দেখছেন! তাই অম্‌নি স্পষ্ট আলোয় কুকুরটা খুব ঠাহর করে দেখতে লাগলেন। দেখতে দেখতে মনে হল—সকাল থেকে কত লোকই তো বাগান দিয়ে এসেছে গেছে—কারও কি নজরে পড়েনি কুকুরটাকে?

মনে হতেই পিছনে আর কেউ আসছেন কিনা, কিংবা তাঁর এত দেরি দেখে কেউ খোঁজ নিতে আসছেন কিনা দেখবার জন্যে পিছন ফিরে দেখতে লাগলেন। যেই পিছন-ফেরা অমনি একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল। পিছন ঘুরে দেখার পর যেই আবার ডালটার দিকে তাকিয়ে দেখতে গেলেন—দেখলেন কুকুরটা আর ডালে নেই, কোন্ জাদুমন্ত্রে যেন উবে গেছে কুকুরটা। ছোট থেকেই একটু ডাকাবুকো। এবারে সাহস করে এক-পা, এক-পা করে ডালটার কাছেই এগিয়ে গেলেন সাহস ভরে। গাছের ডালটার কাছে গিয়ে উপর-নিচে আঁতি-পাঁতি করে সব খুঁজতে লাগলেন—কাকস্য পরিবেদনা। কুকুরের লেজটুকুও দেখতে পেলেন না। কুকুর তো দূরের কথা—একটাও পাখি, কি কোনও জন্তু-জানোয়ারও চোখে পড়ল না। বাড়ির ভিতরে যেতে যেতে আবার ফিরে এলেন বাবলা গাছটার কাছে। আবার এ-পাশ ও-পাশ নজর করে দেখলেন—আর কিছুই অস্বাভাবিক দেখতে পেলেন না। অবিশ্বাস্য ব্যাপারটার কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন অনেকটা আনমনা পায়েই।

বাড়ি ফিরতেই সবাই তাঁকে দেখে অবাক। বাগানের পুকুরে স্নান করতে গিয়েও স্নান না করেই এতক্ষণ বাদে তাঁকে ফিরে আসতে দেখে সবারই চোখে আশ্চর্য কৌতূহল—কী হয়েছে তাঁর! সবাইকে উঠোনের একপাশে জড়ো করে কুকুর-দেখার কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে লাগলেন প্রবীণা গিন্নি। সবাই শুনলেন মন দিয়ে। কারো চোখ ছানাবড়ার আকার ধারণ করলে, কেউ অবিশ্বাসের হাসি

হেসে কাপড় দিয়ে হাসিটা মুছে নিলেন, কেউ বললেন বানিয়ে বানিয়ে বেশ মিছে কথা বলতে শিখেছে গিন্নিটা। সাতকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে তবুও মিছে কথা বলতে ছাড়ছে না। কেউবা বলতে লাগলেন—এসব তেনাদের মায়া গো মায়া; দু-চোখে একেবারে ধাঁধা লাগিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। নইলে এমন ভুল-ভালটা কেউ বলেন! তবে একদল বেশ জোরগলায় বলতে লাগলেন—এই দেখাটা কখনও মিথ্যে হতে পারে না। এ এক্কেবারে ডাঁহা ভূত। এখনই একটা পেরাশচিত্তির করাটা দরকার।

লোকে কী বলছে না বলছে, তাতে তাঁর তখন কান দেবার ফুরসৎ ছিল না। তিনি যে একটা ডাঁহা ভূত, একটা আস্ত ভূত দেখতে পেয়েছেন—সে বিষয়ে রাসসুন্দরীর মনে এতটুকু সন্দেহের ছায়া নেই। কিন্তু অমনি ভরদুপুরে ভূতটা এসে দেখা দিলে—তাও কুকুরের ছদ্মবেশে। সধবা ভূত সন্দেহ নেই। নইলে হাতে শাঁখা কেন? এই বলে সাতবার রাম নাম উচ্চারণ করলেন—

ভূত আমার পুত পেত্নী আমার ঝি
রামলক্ষ্মণ বুকে আছে করবে আমার কি!

তখন তাঁর বয়স ষাট বছর পার হয়েছে। চোখে ছানি পড়েছে বলে মনে হয় না।

২

ভূতেও পায়েস খেলেন

কেষ্টনগরের কার্তিকেয় চন্দ্র রায়ের নাম জানেন না এমন বাঙালি ভূ-ভারতে আছেন বলে জানি না। রাজা শ্রীশচন্দ্রের প্রাইভেট সেক্রেটারি, পরে তাঁর দেওয়ান হিসেবে বিখ্যাত কার্তিকেয়চন্দ্র তাঁর আমলে (১৮২০-১৮৮৫) গানের জগতের এক বিখ্যাত মানুষ ছিলেন। তাঁর আর একটা বড় পরিচয় তিনি সুখ্যাত কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বাবা।

কার্তিকেয়চন্দ্র ছোটবেলায় থাকতেন মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজারে। ছোট থেকেই বাড়ির মা-ঠাকুমা আত্মীয়-স্বজনের কাছে কতরকম ভূতের কতরকম গলা যে শুনেছিলেন তার হিসেব নিকেশ নেই। সে সব ভূতেদের ঠিকানাও ছিল কাশিম-বাজার। এই কাশিমবাজারে বেড়াতে গেছেন আর ভূতের গল্প শুনে আসেননি—সেকালে এমন লোকের সংখ্যা হাতে গোনা যেত মাত্র। তাঁরা ফিরে এসে আবার নিজেদের লোকেদের কাছে সে সব গল্প রসিয়ে রসিয়ে জমিয়ে জমিয়ে করতেন। যেন কাশিমবাজারের ভূত একেবারে আই.এস.আই. মার্কা ছিল—একেবারে যাকে বলে অরিজিনাল। কার্তিকেয় চন্দ্রেরও ছোট থেকেই একেবারে সত্যিকারের ভূত দেখে দেখে চোখে ছানি পড়ার জোগাড়। তিনিও অন্যদের কাছ থেকে জলজ্যান্ত টাটকা ভূতের গল্প শুনতেন। এক ভদ্রলোক তাঁকে একটি ভূতের কথা শোনান এবং

মায়ের নামে দিব্যি কেটে সেটা যে একেবারে পয়লা নম্বরের সত্যি ঘটনা তাও জানান। রায়মশায় গল্পটি তাঁর বিখ্যাত বই 'দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনী'তে লিখে গেছেন। সেই বিখ্যাত ভূত-বক্তার ভূতদর্শনের কাহিনীটি এখন এখানে বলছি—

একদিন তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে কাশিমবাজারে এসেছেন ব্যক্তিগত একটা কাজের জন্যে। কাশিমবাজারে যখন এসে পৌঁছলেন তখন সূয্যিমামা পাটে বসেছেন। সন্ধের অন্ধকারে চারপাশ একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছে। তখনও কাশিমবাজার একটা তেমন গঞ্জ জায়গার মতো গড়ে ওঠেনি। হোটেল-টোটেল পাওয়া যেত না। ভূত-বক্তা কোথায় আশ্রয় পাবেন ভেবে একটা-দুটো বাড়িতে টুঁ মারতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও কেউ একটু মাথা গোঁজবার জায়গা দিলেন না। রাত বাড়তে লাগল যত, তত তিনি যেন ঘামতে লাগলেন—এই বুঝি কাশিম-বাজারের ভূতেরা রাস্তায় বের হয়ে পড়ে তাঁর ঘাড় মটকে বসে। শেষ একটা বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে চিৎকার করে বলতে লাগলেন—'স্থানাভাবে প্রাণহত্যা হতে চলেছে, দয়া করে আমাকে রাতের মত একটু ঠাঁই দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচান।'

এই কথা শুনে বাড়ির ভেতর থেকে কেউ যেন বলে উঠলেন—'ঠিক আছে ভাবতে হবে না, আপনি এইদিকে আসুন।' তাঁর আহ্বান শুনে ভূত-বক্তা দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। কিন্তু ঘরে ঢুকে কাউকেই দেখতে পেলেন না। ভিতরের একটি কুঠুরি থেকে এবারে কেউ যেন বললেন—'এসেছেন, ওখানে খাট পাতা আছে, ওতে বসুন। অতিথি সেবার সব রকম আয়োজন আছে এই ঘরে। প্রদীপ আছে—তাতে তেল সলতে দেওয়া আছে। আপনার কাছে কি দেশলাই আছে। না থাকলে দেখুন কুলুঙ্গিতে দেশলাই রাখা আছে। প্রদীপটা জ্বেলে নিন। বাইরের দাওয়ায় ঘড়াতে জল আছে, ঘটি আছে, গামছা আছে—হাত পা ধুয়ে খাটে বিছানা পাতা আছে—তাতে শুয়ে হোক বসে হোক একটু বিশ্রাম করে নিন। জানলার পাশে একটা কুলুঙ্গিতে টিকে, তামাক আর দেশলাই আছে। আমি খুব অসুস্থ, আমার কেউ নেই। আমি উঠে আপনার কাছে যেতে পারছি না। যদি তামাক খেতে ইচ্ছে হয়, তবে তামাক সেজে খেতে পারেন।'

আলো জ্বালতে বলেছেন, তামাক খেতে বলেছেন যখন তখন যে ভূতে কথা বলছে না ভেবে খুব স্বস্তি পেলেন—এই ভূতের গাঁয়ে যে এমন একটা মাথা গোঁজার জায়গা পাবেন, ভাবতেই পারেননি। পিদিম জ্বেলে, হাত-পা ধুয়ে তামাক সেজে টানতে লাগলেন। পেটের কথা আর ভাবতেই পারলেন না—একটা রাত তো, দেখতে দেখতে কেটে যাবে। সকালে উঠে খাবারের কথা ভাবা যাবে।

এমনি সব যখন ভাবছেন তখনই কুঠুরির ভিতর থেকে আবার শুনতে পেলেন —'আমার বাড়িতে আপনি এসেছেন, আমার অনেক ভাগ্য। আপনি আমার

অতিথি, রাত-উপোসী থাকবেন—তা তো হতে পারে না। আমার মহাপাপ হবে। ওই দেখুন বারান্দার পাশে একটা চালা আছে, তাতে একটা গাইগরু আছে। খাটের নিচে একটা ছোট গামলা আছে—তাতে করে দুধ দুয়ে নিয়ে আসুন। কুলুঙ্গিতে চাল আছে, চিনি আছে—কাঠ আছে, হাঁড়ি আছে, হাতা আছে। আপনি ব্রাহ্মণ মানুষ, পরমান্ন ছাড়া আর কী খাবেন। আর যখন রাঁধবেন, দেখবেন যেন দু'জনের খাবার মতো পরিমাণ হয়।'

ভূত-বক্তা অপ্রস্তুত হয়ে বললেন—'আমি বামুনের ছেলে, গাই দুইতে জানি না।'

কুঠুরির মানুষটি বললেন—'কিচ্ছু ভয় পাবেন না, আমার গরুটি খুব শান্ত, আপনাকে একটুও চাঁট মারবে না। দুধ দুইতে আপনার কোনো কষ্টই হবে না। তবে যদি দুইতে না পারেন, তবে মশায় এখানে ঠাঁই হবে না—অন্য জায়গা দেখুন।'

শুনে তো তাঁর হাত-পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যাবার যোগাড়। এই রাতে তিনি খাবেন কোথায়! সুতরাং গাই দুইলেন, চাল ধুয়ে গরম দুধে দিলেন, উনুন জ্বাললেন, চিনি দিয়ে পায়েস রান্না করে দুটো পাথরের থালায় ঢাললেন। কিন্তু ঢালতে ঢালতে ভাবলেন—'এটা কীরকম ব্যাপার হচ্ছে—ভদ্রলোক অসুস্থ বুঝতে পারছি। সেজন্যে তার কথাবার্তা নাকি সুরে হতে পারে। কিন্তু এতখানিই কি তিনি অসুস্থ যে একবার ঘরের বাইরে এসে আমার কাছে আসতে পারছেন না? আমাকেও তো তাঁর কাছে ডাকতে পারতেন। অসুস্থ অথচ পায়েস খাবার এত ইচ্ছে! তবে কি লোকটা জীবিত নয়? তবে কি লোকটা ভূ...!!!'

ঠিক তখনই কুঠুরি থেকে শুনতে পেলেন তাঁর নাকিসুরে বলা কথা—'আপনি যা মনে মনে ভাবছেন, তা একদম ঠিক। কিন্তু আপনি যদি আমার কথা শোনেন তবে আপনার কোনো বিপদ হবে না। পরমান্ন যা রেঁধেছেন—এক পাত্র রোয়াকে রেখে দিন, অন্য পাত্রটি নিয়ে আপনি খেয়ে নিন। আমার কথা না শুনলে আপনার সমূহ বিপদ।'

ভয়ে তাঁর হাত-পা শুকিয়ে কাঠ; গলা দিয়ে একটা ঘড়ঘড়্ আওয়াজ বের হতে লাগল। পায়েস খাবেন কী, গলা দিয়ে তা নামবেই না। কিন্তু উপায় নেই, খেতেই হবে—নইলে এই ভূতুড়ে বাড়ির মধ্যেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাসটুকু পড়ে যাবে। তেতোমুখে তেতো ওষুধ গেলার মতো মুখ করে তিনি পায়েস খেতে লাগলেন, চেটে-পুটেই খেলেন—কে জানে একটু থালার কোণে একটু লেগে থাকলে নিদেনপক্ষে এক গোছা চুল ছিঁড়ে নেয়। খাচ্ছেন আর থরথর করে কাঁপছেন।

কাঁপুনিটা হাজার গুণ বেড়ে গেল যখন শুনলেন বাইরে রোয়াকে একটা সপ্‌সপ্ শব্দ হচ্ছে। বুঝতে পারলেন, 'তিনি' পায়েস খাচ্ছেন। দেখতে দেখতে স্পষ্ট করে প্রদীপের কাঁপা কাঁপা আলোতে একটা ২৪/২৫ হাত পরিমাণ লম্বা হাত সেই কুঠুরি থেকে বের হয়ে রোয়াকের পায়েস সাবাড় করে পাশের গর্তে থাকা জল দিয়ে

পাথরের থালাটিকে ধুয়ে তুলে রাখছে। ভয়ে তাঁর দু'চোখ বন্ধ হয়ে এল। কোনোক্রমে হাতড়ে হাতড়ে বিছানার কাছে এসে চোখ বন্ধ করে 'মা দুর্গা' আর রামনাম স্মরণ করে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। নিজের কানেই যেন নিজে শরীরের হাড়ের খটখটানি শুনতে পাচ্ছেন।

কিন্তু শোবেন কী! আবার ভিতরের কুঠুরি থেকে ভূতমশায়ের গলা শুনতে পেলেন—'ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? ঘুমোবেন না, কান দিয়ে শুনুন—এই বাড়ির পাশের বাড়িটা আমার ছোট ভাইয়ের বাড়ি। কাল সকালে উঠে তার বাড়িতে গিয়ে তাকে ডেকে এই কথা কয়টি ভালভাবে তাকে বুঝিয়ে বলবেন—সে যেন সাতদিনের মধ্যে গয়া গিয়ে আমার পিণ্ডি দিয়ে আসে। নইলে তার ঘাড় মটকে দেবো। আপনারও কম বিপদ হবে না!'

ভয়ে তিনি আর চোখ খুলতে পারলেন না। কোনোক্রমে গলায় জোর এনে বললেন—'আচ্ছা, তাই করবো। আপনি ভাববেন না।' শুয়েছেন বটে, কিন্তু ঘুম দু'চোখ থেকে কোথায় পালিয়ে গেছে। বাইরে কাক-কাকলির আওয়াজ পেয়ে বুঝলেন ভোর হয়ে গেছে। কোনোক্রমে পোঁটলা-পুঁটলি সামলে কুঠুরির উদ্দেশে একটা প্রণাম ঠুকে ভুতুড়ে বাড়িটা থেকে বের হয়ে পড়লেন আমাদের ভূত-বক্তা মহোদয়। তারপরে সোজা রাস্তা ধরে টানা মাইলখানেক হাঁটার পর তাঁর সামনে একটা আতঙ্ক যেন অশরীরী ভূতের আকারে এসে দাঁড়াল। তিনি স্পষ্ট শুনতে পেলেন ভূতবাবু তাঁকে বলছেন 'আমার ভাঁইকে যে-সঁব কঁথা বঁলার জন্যে বঁলেছিলাঁম তোঁকে তাঁকে তাঁ নাঁ বঁলেই তুঁই পাঁলিয়ে যাঁচ্ছিস্? দেঁবো তোঁর ঘাঁড় মঁটকে?'

ভূত-বক্তাবাবু বুঝতে পারলেন—এ ভূত ভুলবার পাত্তর নয়। নইলে দিনের বেলাতেও বের হয়ে আসতে পারে! এই বলে কান-নাক মলা দিয়ে তাঁর ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে সব কথা বলে এলেন।

তারপরে চোঁ-চাঁ দৌড়। একেবারে পগার পার।

কাশিমবাজার ভূতেরা আর কী এখন আছেন!!

৩

সুন্দরী পেত্নীর পাল্লায় বঙ্কিমচন্দ্র

বাংলা সাহিত্যে সাহিত্য-সম্রাট বলতে বুঝি একজনকেই—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে। তাঁর বড় মেয়ে শরৎকুমারীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের। তাঁদের চার ছেলের মধ্যে দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের খুব আদরের নাতি ছিলেন। জীবনের নানা কথা তিনি তাঁর এই নাতিটিকে বলতেন বঙ্কিম। হাকিম হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রকে বদলির চাকরি নিয়ে নানান জায়গায় ঘুরতে হত। তখন তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁথিতে। শহর থেকে মাঝে মাঝেই

বঙ্কিমচন্দ্রকে আদালতের কাজের সূত্রে মফস্বলে, এমনকি গ্রামেগঞ্জেও যেতে হত। একবার কাঁথি থেকে ১৫/১৬ মাইল দূরের একটি স্থানে তাঁকে যেতে হয়। সেখানে গিয়ে একটি বাড়িতে তিনি ভূতের পাল্লায় কেমন করে পড়েছিলেন সেই ভূত-কহানিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আদরের নাতির কাছে জমিয়ে বলেছিলেন। দাদামশায়ের সেই ভূত-অভিজ্ঞতার কথা দিব্যেন্দুসুন্দরবাবু লিখে গেছেন 'বঙ্কিমস্মৃতি'তে। তাঁকে বলা সেই অভিজ্ঞতাটুকু এখন এখনকার পাঠকদের কাছে নিবেদন করি।

কাঁথি থেকে বঙ্কিম রওনা হয়েছেন একটি গঞ্জ পাল্‌কিতে চড়ে। তখন বিকেলবেলা, পশ্চিম আকাশে রোদের বেশ উজ্জ্বলতা তখনও। ভেবেছিলেন হন্‌হনিয়ে গিয়ে কাজ সেরে পাঁই পাঁই করে ফিরে আসবেন। পাল্‌কির বেহারারা তাঁকে বলেছিল—'বাবু আপুনির কোনো ডর লাই, হামরা ঠিক তোকে সাঁঝাসাঁঝি ফিরৎ লিয়ে আসবো।' বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে গেলেন তাঁর খানসামা মুরলী, দু'জন বরকন্দাজ, আর্দালি আর রান্নার বামুন। যদি কোনো কারণে আটকে পড়েন ব্যবস্থা তো রাখতেই হবে। এর আগে কতবার সকালবেলা মফঃস্বলে বের হয়েও সন্ধের মধ্যে ফিরতে পারেননি। কাজের চাপের তো কোনো হিসেব থাকে না। তাই আট-ঘাট বেঁধেই রওনা হলেন।

সেকালে কোনো গ্রামে গেলে সেই গ্রামের জমিদারেরাই হাকিম বা ওই শ্রেণীর মানুষদের সমাদর জানিয়ে তাঁদের বাগানবাড়িতে তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতেন। এবারে যেখানে গেলেন, সেখানের জমিদারবাবুও তাঁর বাগানবাড়ি খুলে দিলেন—সাঙ্গপাঙ্গোদের নিয়ে বঙ্কিমবাবুও সেখানে গিয়ে উঠলেন। কিন্তু কাজের চাপে সন্ধে গড়িয়ে রাত হয়েছে—অত রাতে পথে বের হওয়া উচিত নয়—পথেঘাটে ডাকাত ঠ্যাঙাড়েদের যা অত্যাচার। রাত ঘনাতেই বামুন ঠাকুর রান্নার তোড়জোড় আরম্ভ করে দিলেন। খাদ্য প্রস্তুত জানাতে গিয়ে মুরলী দেখেন কাছারিবাড়ি গমগম করছে, গাঁয়ের গণ্যিমান্যিরা বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দল বেঁধে দেখা করতে এসেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তো শুধু হাকিমবাবু নন, একজন বড় সাহিত্যিকও তো!

সেদিন ছিল অমাবস্যার রাত্রি। খাওয়া-দাওয়া সেরে বঙ্কিমবাবু কাঁথিতে ফিরে যেতে চাইছেন শুনে গণ্যিমান্যির দল, মায় জমিদারবাবু লোক পাঠিয়ে বলে পাঠালেন—তিনি যেন কোনো কারণেই এই ঘুটঘুটে অমাবস্যার রাতে ফিরে যাবার চেষ্টা না করেন—জান খতরা হয়ে যাবে একেবারে। বঙ্কিমচন্দ্র এমনিতে বড্ড জেদি, কারো কথায় আমল দেওয়ার পাত্র নন। তবুও যেন একটা আশঙ্কা তাঁকে ঘিরে ধরল। ঠিক করলেন রাতটা তাহলে কাছারি বাড়িতেই কাটিয়ে যাবেন। অতএব পালকি বিদেয় করা গেল না। জমিদারের তরফে তাদেরও রাতের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো।

বাগানবাড়িটা তিনমহলা। তার চারদিক ঘিরে মস্ত বাগান। বড় বড় লম্বা লম্বা

গাছ। গোটা বাগানের চারদিক উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বাগানের মাঝখানে বাগানবাড়িটা। সেখান থেকে বাইরে যাবার ফটকটা বেশ খানিকটা দূরে। সেই ফটক দিয়ে ভরদুপুরে যদি কোনো লোক বাগানে ঢুকতো বা বাগানবাড়ির দিকে আসত তবে বাড়ি থেকে তা ঠাহর করা খুব মুশকিল হত। গেটের সামনেই একটা বাদাম গাছ। বাড়ির পিছনের দিকে খিড়কির দরজা—একটু ছোট আকারেই। খিড়কির দরজা দিয়ে বাইরে গেলেই একটা ছোট পুকুর। পথের দু'ধারে লম্বা তালগাছের একটানা সারি। সেটার কোল ঘেঁষে গোলাপ গাছের সারি—ফুলে ফুলে ছয়লাপ, সুবাসে মৌ মৌ। অন্যদিকে যে কত রকমের চেনা-অচেনা গাছ তার সংখ্যা করে কে। সেই পথ দিয়ে বরাবর গেলেই বাগানের শেষপ্রান্তে বাইরে যাবার আর একটা দরজা। সেটা পার হলেই রাস্তায় নামা যায়। সেটাই সদর রাস্তা, তবে খুব একটা চওড়া রাস্তা—তা বলা চলে না। রাস্তাটার অপরপারে একটা ছোট্ট নহর—যাকে বলে খাল। আর তারপরই ধু-ধু প্রান্তর মাঠ—লোকে বলে ভূতে-পাওয়া-মাঠ।

বাড়ির প্রথম মহল পার হয়ে মাঝের মহলে যেতে গেলে একটা মস্ত উঠোন পার হয়ে যেতে হয়। উঠোনের ঠিক মাঝখানে একটা শিউলি ফুলের গাছ। শরৎকাল এলে গোটা মহলটা তার ফুলের সুবাদে ম-ম করে। দ্বিতীয় মহল যেখানে শেষ হচ্ছে সেই শেষের ঘরটা বেশ বড় আকারের। দরজা খুলে সেই ঘরে ঢুকলেই নজরে পড়বে একটা বিশাল পালঙ্ক—তাতে টান টান করে বিছানা পাতা। সেখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের জন্যে রাতে শোবার ব্যবস্থা দেখে বেশ বড় আকারের একটা সেজবাতি নিয়ে এসে মুরলী ঘরে জ্বালিয়ে দিতেই গোটা ঘরটা আলোয় ঝলমল করে উঠল। তারপরে মুরলী বঙ্কিমবাবুর জন্যে রাখা আলবোলাটায় তামাক সেজে দিলে অতি যত্নে।

মুরলী ঘর ছেড়ে যাবার আগে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে তার বাবুকেবলল—তাহলে বাবু আমরা আপনার পাশের ঘরেই থাকি। রাত-বিরেতে যদি আপনার দরকার পড়ে একবার ডাকলেই আমরা ছুটে আসতে পারি তাহলে। শুনে বঙ্কিমবাবু বললেন—'না না রে, তার দরকার নেই। প্রথম মহলে যে ঘরটায় আমি এসে প্রথম বসেছিলাম, তোরা সেই বৈঠকাখানা ঘরটাতেই গিয়ে শুয়ে পড়। এই উঠোনটা পার হলেই তো সেই ঘরটা। এক কাজ করবি তোরা—একটু সজাগ হয়ে ঘুমুস, যেন দরকার পড়লে এক ডাকেই তোদের সাড়া পাই। 'যে আজ্ঞে' বলে মুরলী দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল—বাবু, দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিন, চোর-ছ্যাঁচোরদের বিশ্বেস নেই।' মুরলী চলে যেতেই বঙ্কিমচন্দ্র বিছানা থেকে উঠে এসে ভিতর থেকে খিল এঁটে দিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন। যাতায়াত আর কাজের চাপে শরীর ক্লান্ত ছিল—বিছানায় শোওয়া মাত্রই গভীর ঘুমের সমুদ্রে ডুবে গেলেন।

ঘুমটা বেশ জমে উঠেছে এমন সময় আচমকা ঘুম ভেঙে গেল—দরজার বাইরে

কে যেন সমানে আঘাত করে চলেছে—দুম দুম দুম। ঘুম ভাঙল সেই বিকট আওয়াজে, সমস্ত মুখ-চোখ বিরক্তিতে ছেয়ে গেল। তবে কি মুরলী কোনো দরকারে ঘুরে এসে তাঁকে ডাকছে? হয়তো প্রথমে আস্তে আস্তে দরজায় ঘা দিয়েছিল, সাড়া না পেয়ে ভয় পেয়ে এমনি করে জোরে জোরে ধাক্কা মারছে। কিন্তু রাগে তার শরীর জ্বলছে অসময়ে ঘুম ভাঙানোর জন্যে। গজ গজ করে মুরলীর বাপান্ত করতে করতে দরজার খিল খুলে দরজা হাট করে দিলেন, ভিতরে সেজের মৃদু আলো একটা আলোছায়ার আবহাওয়া তৈরি করেছে, ঘুমচোখে দৃষ্টিও খানিকটা আবিল। কিন্তু মুরলী তো দরজায় নেই, কে তবে এত রাতে দরজায় এমন করে ধাক্কা মারছিল? সেজবাতিটা উস্‌কে দিয়ে ঘরের বাইরে এসে চারিদিক খুঁজলেন—কাউকে দেখতে পেলেন না। কেবল একটা বড় আকারের কুকুর সন্দেহজনক চাউনি দিতে দিতে ঘরের এ-প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে গেল।

কেমন একটা খুঁতখুঁতনিতে সারা মনটা বিষিয়ে গেল। আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে সেজবাতিটা কমিয়ে দিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু দু'চোখের পাতা এক করতে পারলেন না। কেবলই বারবার করে মনে হতে লাগল—এত রাতে এত জোরে জোরে দরজায় আওয়াজ হল কেন? কে এই ধাক্কা দিলে? কোথায় গেলই-বা সে। আবার মনকে প্রবোধ দিলেন—হয়তো পাশের বাড়িতে বা ঘরে কেউ ধাক্কা দিয়েছে—নিশুতি রাত তো, তাই অল্প আওয়াজটাই এত বড় হয়ে উঠছিল। রাতে দূরের শব্দও তো বড় কাছের বলে মনে হয়! তাই হয়তো আমি ঘুমের চট্‌কা ভেঙে এইরকম ভাবছিলাম। এই বলে পাশ ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিন্তু বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে—চোখের পাতা দুটিতে মিলন হচ্ছে-হবে এমন অবস্থায় আবার সেই বীভৎস আওয়াজ দরজার কবাটে—দুম্ দুম্ দুম্। কে যেন প্রবল আক্রোশে দরজার পাল্লা দুটো ভেঙে চুরমার করে দিতে চাইছে! আবার তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে এলেন। এবার রাগের সঙ্গে একটা সন্দেহের আঁচও মিশে গেল। আবার এও মনে হলো যে বড় কুকুরটাকে দেখেছিলেন—সেটাই খাবারের লোভে এসে ধাক্কা দিচ্ছে না তো!

দোনামোনা করতে করতে দরজাটা খুলেই দিলেন বঙ্কিমবাবু। কিন্তু কই কুকুর বা মানুষ কেউ তো নেই! কিন্তু দরজা খোলা মাত্রই তিনি যেন কাউকে ছুটে পালিয়ে যেতে দেখলেন বলে মনে হল। কিন্তু কাউকে তো দেখতে পেলেন না। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে বঙ্কিমবাবু আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়লেন। শুয়ে আর ঘুম এলো না, তবে কি চোর ডাকাতেরা এই খেলাটা খেলছে! অনেক হয়েছে, এবারে ধাক্কা দিলেও আর তিনি দরজা খুলবেন না। তবে যদি খুলতেই হয়....এই বলে নিজের প্যাঁটরাটা খুলে একটা ভোজালি বের করে হাতে নিলেন—মফঃস্বলে কোথাও যেতে হলে এই চাকুটা তিনি সঙ্গে রাখতেন বরাবর। ঠিক এই সময়েই আবার দরজায় আওয়াজ। আশ্চর্য তো! এবারে তো দরজায় ভেঙে ফেলার

আওয়াজ নয়, কে যেন আলতো করে টোকা দিচ্ছে দরজার কপাটে। রহস্য তো মন্দ নয় দেখছি—বঙ্কিমচন্দ্র মনে মনে ভাবলেন—'এই নাটকটা কি সারারাত ধরেই চলবে নাকি? দেখা যাক কী ব্যাপার'—এই বলে দরজা খুলে দিলেন এক হাতে আর অন্য হাতে ধরে রইলেন ধারালো ছোরাখানা। দরজা খুলে দিতেই তাঁর চক্ষু ছানাবড়া! দেখলেন তাঁর সামনে অদূরে দাঁড়িয়ে একটি ছোটখাটো গড়নের সুন্দরী যুবতী দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাঁকে দেখেই মেয়েটি প্রায় উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে তৃতীয় মহলের দিকে চলে গেল। এবার বঙ্কিমচন্দ্র খুব ধন্দে পড়ে গেলেন। কুকুর-টুকুর এমনকি চোর-ডাকাত পর্যন্ত চলতে পারে, কিন্তু এই রাত দুপুরে যুবতী মেয়েছেলে—তার ওপরে সুন্দরী! যেটুকু দেখেছেন তাতেই তাঁর মনে হয়েছে মেয়েটি নিশ্চয়ই কোনো বড় ঘরের মেয়ে। তবে কি এই মহিলা জমিদারবাবুর সঙ্গে কোনো অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে আছে? মেয়েটি কি নষ্টা, কলঙ্কিনী। হয়তো এই ঘরেই সে জমিদারবাবু বা অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয় প্রতি রাতে! আজ এই ঘরে অন্য পুরুষ দেখে অমনি করে ছুটে পালিয়ে গেল। হয়তো পালিয়ে গিয়ে দূরে আড়াল থেকে সে বঙ্কিমচন্দ্রকে লক্ষ্য করছে। কিন্তু শেষটা দেখতেই হবে।

এই ভেবে তিনি ছোরা হাতে মেয়েটি যেদিকে পালিয়ে গেছেন সেই তৃতীয় মহলের দিকে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন মেয়েটি সেই মহলের বারান্দার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতে লেগেছেন। বঙ্কিমকে দেখে তিনি একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। বঙ্কিমবাবু আরও একটু এগিয়ে গেলে মেয়েটি সরাসরি প্রশ্ন করে বসলেন—'মশায় আপনি কে, কেন আপনি এই গভীর রাতে আমার পিছনে পিছনে আসছেন? আপনার উদ্দেশ্যই বা কী? আমি তো আপনার কোনো ক্ষতি করিনি।'

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দিলেন—"ঠিক কথা যে তুমি আমার কোনো ক্ষতি করনি। আসলে আমার কোনো ক্ষতি করার কোনো শক্তিই তোমার নেই। তুমি একটা মেয়েছেলে—তুমি আমার কী ক্ষতি করতে পার?'

—তাহলে আপনি আমার পিছন ছাড়ছেন না কেন? কী মতলব আপনার? ঠিক আছে—আপনি ফিরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন, আপনি তো বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়... বিখ্যাত লোক?

—হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরেছ, আমিই বঙ্কিমবাবু, কিন্তু তুমি আমার নাম জানলে কী করে? সে যাক্‌গে—তুমি এত রাতে এসে আমার দরজায় ধাক্কা মারছিলেই বা কেন, আর কেনই বা এই জনমানবহীন বাগানবাড়িতে এসেছ এই গভীর নিশীথে? দ্যাখো, আমি হলাম হাকিম। তোমাকে যখন পেয়েছি তখন এমনি এমনি ছেড়ে দেবো না। তোমাকে আমি গ্রেপ্তার করব।'

—তবে শুনুন বঙ্কিমবাবু। আমার নাম 'বিরহ'—আমি এই গ্রামের জমিদারবাবুর মেজছেলের স্ত্রী। প্রত্যেক রাতে আমি এখানে আসি। যে ঘরে আপনি শুয়েছিলেন,

সেই ঘর প্রতি রাতেই ফাঁকা থাকে—কেউ এখানে শোয় না, থাকে না। ওই যে পাতা বিছানা, প্রতি রাতে ওই বিছানায় এসে আমি শুই। কেন আসি, কী মতলবে আসি, সে-সব কথা আমি আপানকে বলতে পারবো না, বলতে চাইও না। আপনি চেষ্টা করলেও তা জানতে পারবেন না। আপনি ভদ্র মানুষ, লেখাপড়া জানা মানুষ, লেখক মানুষ। আপনাকে একটা কথা বলছি—আপনি আমার পিছনে পিছনে আসবেন না। রাত শেষ হয়ে আসছে—আমারও চলে যাবার সময় হয়েছে। আমি এখন কোথায় যাবো তাও ঠিক করিনি।

—না, না, তোমাকে আমি কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারি না। আমার হাত থেকে তোমার আজ নিস্তার নেই। তোমাকে আমি গ্রেপ্তার করবো। তারপর সকাল হলে জমিদারবাবুর মেজো ছেলের সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছে তোমাকে জিম্মা করে দিয়ে তবে আমি নিশ্চিন্ত হবো।

—কেন আপনি মিছিমিছি আমাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করছেন, আপনি হাজার চেষ্টা করলেও আমাকে ধরে রাখতে পারবেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র এমনিতে অহঙ্কারী মানুষ। স্ত্রীলোকটির এহেন চ্যালেঞ্জ ছোঁড়া শুনে রাগে তাঁর গা-পিত্তি জ্বলতে লাগল। মহিলার গায়ে হাত দেওয়া উচিত নয় জেনেও তিনি তাঁকে ধরবার জন্যে হাত এগিয়ে দিলেন, অন্য হাতে ধারালো ছুরি। কিন্তু কী আশ্চর্য— বঙ্কিমচন্দ্রের হাত স্ত্রীলোকটিকে ধরার বদলে দেওয়ালে গিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা খেল, তিনি ব্যথা পেলেন। আর তাই দেখে বধূটি খিল খিল করে হেসে উঠলেন। সেই হাসি শুনে বঙ্কিমবাবুর মতো সাহসী মানুষের বুক থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। বধূটি সেই বুক কাঁপানো হাসি হাসতে হাসতে বঙ্কিমবাবুর পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। অমনি একপাক ঘুরে তিনি মেয়েটিকে আবার ধরতে গেলেন। তখন মহিলাটি আবার হেসে দৌড়ে পালাতে লাগলেন, বঙ্কিমবাবুও তাঁর পিছনে দৌড়তে লাগলেন। মহিলা খিড়কির দরজা খুলে বাগানে ঢুকলেন, তিনিও পিছনে পিছনে দৌড়ে পুকুর ছাড়িয়ে তালগাছের সারির মাঝখান দিয়ে একেবারে সদর রাস্তায় গিয়ে পড়লেন—সেই বাদাম গাছটার একেবারে কাছে। দেখলেন গাছের নিচে তাঁর পালকিটি রয়েছে, তাতে একজন বেহারা শুয়ে ঘুমুচ্ছে। বাদাম গাছের পাশেই একটা চাঁপাফুলের গাছ। শেষ রাতের বাতাসে চাঁপা গাছটা এদিক-ওদিক দুলছে। কিন্তু এত বেশি করে দুলছে কেন? খুব অস্বাভাবিক লাগল, আর কোনো গাছ তো দুলছে না। এবার বঙ্কিমের মনে একটু ভয় জাগল। মেয়েটা তো দৌড়তে দৌড়তে এসে চাঁপা গাছটার পাশেই দাঁড়াল। তারপরেই কর্পূরের মতো উবে গেল! তবে কি তিনি কোনো ছায়ামূর্তিকে অনুসরণ করেছিলেন?

এই ভেবে তিনি পালকির বেহারাদের ডেকে জাগালেন, ওই বাড়িতে ফিরে যাওয়ার কোনো ইচ্ছেই তাঁর হলো না। হাঁকাহাঁকিতে খানসামা মুরলী আর অন্য লোকজনেরা ছুটে এল চোখ কচলাতে কচলাতে। তখন রাত চারটে। বাগানবাড়ির

কাউকে না জানিয়ে ভোররাতে রওনা দিয়ে কাঁথি ফিরে এলেন সকাল আটটা নাগাদ। এমনি করে চার-পাঁচটা দিন কেটে গেল—কাউকে কিছু বলতেও পারেন না পাছে তাঁকে সবাই ভীতু ভেবে বসে। কিন্তু সর্বদাই ভাবেন যে ব্যাপারটা ঘটে গেল—সেটা আসলে কী?

ক'দিন পর সেই জমিদারবাবুর এক গোমস্তা কাজের কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে এসে হাজির হলেন। এটা-ওটা-সেটা করার ফাঁকে বঙ্কিমবাবুর মতো গম্ভীর প্রকৃতির মানুষও গোমস্তাকে জিজ্ঞেস করেই ফেললেন—'আচ্ছা, তোমাদের জমিদারবাবুর মেজ ছেলের বউটি কেমন? স্বভাব চরিত্তিরই বা কেমন?

—আজ্ঞে বাবু, সেই বউটি খুবই সুন্দরী আর শান্ত প্রকৃতির ছিলেন।

—ছিলেন কেন, তিনি এখনও আছেন, আমি তাঁকে দেখে এসেছি।

—অ্যাঁ কী বল্লেন, দেখে এসেছেন আপনি! দুঃখের কথা আপনাকে কী বলব? যে বাড়িতে আপনি ছিলেন, সেই বাড়িতে একবার মেজবাবু বৌমাকে নিয়ে ক'দিন বাস করতে গেছিলেন। একদিন কি জানি ওই বাগানের ভিতরের পুকুরে স্নান করতে গিয়ে বৌটি জলে ডুবে মারা যায়।

এবারে বঙ্কিমের কাছে সব স্পষ্ট হয়ে গেল। তিনি যে একটা হানাবাড়িতে রাত কাটাতে গেছিলেন—তা বুঝতে পারলেন। তাই গোমস্তাকে বললেন—'বাপু হে ফিরে গিয়ে মেজবাবুকে বলো বউটির একটা গতি করতে—গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দিয়ে আসতে। বউটি এখনও ওই ঘরটার মায়া ছাড়তে পারেনি।

মনে মনে ভাবলেন ভূতের হাত থেকে খুব বেঁচে গেছেন!

৪

কবরেজ বাড়িতে মুসলমানি ভূত

মেদিনীপুরের মৈতনা গ্রামের দ্বারকানাথ স্মৃতিরত্নের ছেলে গিরিশচন্দ্র কবিরত্নকে (১২৮০র-কার্তিক ১৩৬৮) একালের ক'জন চেনেন জানেন আমি জানি না তিনি একসময়ে কাশীতে গিয়ে মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্নের কাছে সাংখ্যদর্শন আর কবিরাজ উমাচরণ কবিরত্নের কাছে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র পড়েছিলেন। তিনি এত বড় পণ্ডিত ছিলেন যে কাশীর পণ্ডিত মহাসভা তাকে 'কবিরত্ন' উপাধি দিয়ে সম্মান জানান। কাশীতে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে সংস্কৃত নাটক অভিনয়ের জন্যেও। মেদিনীপুরের অজয়া গ্রামে তিনি একটি আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় স্থাপন করেন ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে। এখানে টানা চব্বিশ বছর আয়ুর্বেদ পড়ান। পরে স্বগ্রামে ফিরে অধ্যাপনা করতে থাকেন। এই সংস্কৃত পণ্ডিত দেশকে অপরিসীম ভালবাসতেন। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

এই মানুষটি নিজের চোখে ভূত দেখেছিলেন খোদ ময়মনসিংহ শহরে। ভূত-প্রেত তিনি কোনওকালে বিশ্বাস করতেন না। কাগজপত্রে যখন বিলিতি ভূতের গল্প

পড়তেন কিংবা কেউ পড়ে সেই গল্প তাঁকে শোনাতেন—গাঁজাখুরি গল্প বলে সে সব তিনি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতেন। সেই মানুষটিকে ভূতে বিশ্বাস করতে হল। একেই বলে বুঝি দশচক্রে ভগবান ভূত।

তখন তাঁর বাসার পাশেই থাকতেন সেকালের বিখ্যাত উকিল প্রসন্নবাবু। যে বাড়িতে গিরিশবাবু থাকতেন, সেটা বেশ বড় বাড়ি। তাঁর দক্ষিণ অংশে তিনি থাকতেন আর উত্তরদিকের অংশে থাকতেন আদালতের মহাফেজ ভুবনচন্দ্র রায় মশায়। গিরিশবাবুর একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন—তাঁর নাম অখিল। তিনি জেলার বাট্টগ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্যের বাড়িতে থেকে সেখানে কবিরাজি চিকিৎসালয় খুলেছিলেন। প্রায়ই গুরুর কাছে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র ঝালিয়ে যেতেন। তাঁর বাসা থেকে অখিলের বাসার দূরত্ব খুবই কম—এক ডাকেই সাড়া পাওয়া যেত। গুরুকে বাবার মতো শ্রদ্ধা করতেন ছাত্রটি। কাজে-অকাজে দিনে-রাতে অখিল গুরুমশায়ের তত্ত্ব-তালাশ করতেন।

একদিন গিরিশবাবু বসে আছেন, সূয্যিমামা পাটে বসতে চলেছেন। ধীরে ধীরে সন্ধে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ দুম করে সূর্য ডুবে যেতেই চারপাশ আবছা আঁধারে ঢেকে গেছে। আর ঠিক সেই সময়েই হুন-হা-হুন করতে করতে একটি পালকি এসে তাঁর বৈঠকখানার দরজার সামনে দাঁড়াল। কবিরত্ন মশায় বুঝতে পারলেন—মরণাপন্ন কোনও রোগী এসে হাজির হয়েছে। কিন্তু বেহারারা পালকির দরজা খুলে দিতেই তিনি সেই আবছা আলোতেই বুঝতে পারলেন—ভিতরে শায়িত রোগী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে—কাতরাতে কাতরাতে কী যে বলছে বোঝা যাচ্ছে না। কবিরত্ন মশায় নিজেই উঠে গেলেন। পালকির দরজার মধ্যে মাথা গুঁজে দিতেই দেখতে পেলেন রোগী আর কেউ নয়, তার অতি প্রিয় ছাত্র অখিল অমনি আর্তস্বরে কাঁদছে। গুরুদেবকে দেখতে পেয়েই শুয়ে শুয়ে কোনও রকমে হাত দুটো বের করে গুরুর পা দুটি জড়িয়ে ধরে মিনতি করতে লাগলেন—'গুরুদেব, মরে গেলাম, মরে গেলাম—আপনি আমাকে বাঁচান গুরুদেব।'

বেহারাদের বলে অখিলকে পাঁজাকোলা করে ধরিয়ে নিয়ে তাঁর বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে এলেন গিরিশবাবু। বিছানার উপরে অখিলকে শুইয়ে যথাসাধ্য চিকিৎসা করতে লাগলেন। ক'দিন ধরে যমে-মানুষের টানাটানি চলল, কিন্তু আরোগ্যের কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। অখিল কখনও অজ্ঞান হয়ে মরার মতো পড়ে থাকতেন, কখনও বা চেতনা পেয়ে প্রচণ্ড মাতামাতি করতেন, প্রলাপ করতেন খুব অথবা অবসন্ন হয়ে পড়ে থাকতেন। এমনি করে বারোটা দিন কেটে গেল প্রবল আশঙ্কার মধ্যে। তারপরে কবিরত্ন মশায়ের আর কিছু করার থাকল না, তেরো-দিনের দিন সব চেষ্টা ব্যর্থ করে অখিল চলে গেল।

মারা যাওয়ার আগের দিন, তখন সবে সন্ধে লেগেছে, অখিলের শয্যার পাশে তার মাথায় হাত দিয়ে গিরিশবাবু বসে আছেন, হঠাৎ ঘরের হ্যারিকেনটা দপ্‌ করে

নিভে গেল। তবে কি এতে তেল ফুরিয়ে গেছে! গিরিশবাবু আবার লণ্ঠনটি জ্বালিয়ে নিলেন—তেল তো ভর্তিই রয়েছে, তবে এমনটি হল কেন? হ্যারিকেনটি হাতে নিয়ে দরজার দিকে বাইরে যেতে গিয়ে দেখেন সেই ঘরের দরজায় একটি মহিলা ঘরের ভেতরের দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। পরনে বকের পালকের মতো সাদা ধপধপে একটি সাদা ধুতি। গায়ের রঙ যেন ফেটে পড়ছে—দুধে আলতায় গোলা যেন। আকাশে তখন পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে—তারই আলো মহিলার শরীরের পানে। তিনি কে জানবার জন্যে দরজার দিকে দু'কদম এগিয়ে যেতেই সেই স্ত্রী-মূর্তি যেন যাদুবলে মিলিয়ে গেল—এদিক ওদিক খুব খুঁজে হ্যারিকেনটা উঁচু করে ধরে। তার কোনও হদিস আর পাওয়া গেল না।

তবে যতটা ভয় পাওয়া উচিত ছিল, ততটা ভয় তিনি পেলেন না। তাঁর মন তখন শিষ্য অখিলের জীবন-মরণ নিয়ে সদানিযুক্ত। অন্য কোনও ভাবনা যেন তাঁর মনের মধ্যে ঠাঁই-ই পাচ্ছিল না। কিন্তু যেই তিনি দরজার কাছ থেকে ঘুরে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন—আবার হ্যারিকেনটা দপ্ করে উঠে নিভে গেল, কেরোসিনের কটু গন্ধ এসে নাকে ঢুকল। আবার আলো জ্বালাবার জন্যে বৈঠকখানা থেকে বের হয়ে তাঁকে বাড়ির ভিতরে ঢুকতে হল— দেশলাই কাঠি তখন এত সস্তা ছিল না। ঘরের ভিতর থেকে আবার আলো জ্বালিয়ে যেই অখিলের ঘরের দিকে আসছিলেন তিনি, আবার দেখলেন তাঁর শোবার ঘরের দরজার সামনে সেই নারীটির মূর্তি—যেন দরজার কপাট ধরে দাঁড়িয়ে আছে। যেই গিরিশবাবু একটু এগিয়েছে দরজার কাছে, অমনি সেই মূর্তি ঘরের একপাশে যেন সরে গেল।

এবার তিনি একটু বিচলিত হয়ে পড়লেন। একটা ভূতের ভয় যেন হিম হয়ে তাঁকে চেপে ধরতে চাইছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর ভাইপোকে আর বাড়ির পরিবারকে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে দু-তিনবার ডাকতে শুরু করলেন। চিৎকার শুনেই তাঁরা ছুটে এলেন। সেই আর্তস্বর, ভুবন রায় মশায়ের কানেও গেছিল—তিনিও কী হয়েছে, কী হয়েছে বলতে বলতে ছুটে এলেন। তিনি তাঁদের সব কথা বুঝিয়ে বললেন। বিশেষ করে একটু আগেই হ্যারিকেনের আলোয় স্পষ্ট করে দেখেছেন—তার কথা সবিস্তারে বললেন।

তাঁর কথা শুনে তিনজনেই হ্যারিকেন নিয়ে বাড়ির বাইরে গিয়ে চারপাশ ঘুরে এলেন—কিছুই দেখতে পেলেন না। ভাইপোটি ভৃত্যকে নিয়ে ঘরের ভিতরেও অনেক খুঁজলো। কেউ নেই। ভুবন রায় মশায়ের মুখে একটা বিদ্রূপের চোরা হাসি ওষ্ঠাধারে আর চোখের পাতায় নেচে গেল যেন। গলার স্বর যতখানি সম্ভব মৃদু করে তিনি বললেন—'আপনার মন ভাল নয়, শিষ্যের কথা ভাবছেন একমনে—তাই কোথাও যেন একটা ভুল করে ফেলেছেন, ঘরের ভেতরে-বাইরে কিচ্ছু নেই। আপনি ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিন। উত্তেজনার বশে কী দেখতে কী দেখে বসেছেন। এসব নিয়ে ভাববেন না।'

আর বিশ্রাম নেবেন। তাঁর প্রিয়তম শিষ্য মৃত্যুশয্যায়। এসময় ভুবন রায় মশায় তাঁর অবস্থা দেখে হাসছেন! মনে খুব কষ্ট হল যত, ততখানিই রাগ হল তাঁর উপর। পরে ভেবে দেখলেন অখিলের এই অসুখে এঁরা সবাই তাঁর পাশে আছেন, যদি রাগারাগি বা কিছু বাড়াবাড়ি করেন, তবে তাঁরা হয়তো আর আসবেনই না। তাতে তাঁর বিপদ বাড়বে বই কমবে না। সাত-পাঁচ ভেবে বিদ্রূপ হজমই করলেন।

তারপর সেই ভয়াবহ দিনটি এল। আমাকে শোকসাগরে আপাদমস্তক ডুবিয়ে রেখে অখিল পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নিল। তিনি উন্মাদ হলেন না বটে, কিন্তু পৃথিবীতে কোনও আকর্ষণই যেন তিনি আর অনুভব করতে পারলেন না। বেশিরভাগই ওই ঘরে, যেখানে অখিল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে—সেখানেই কাটাতেন। রোগীরা এলে তবুও একটু স্বস্তি পেতেন—একটু আনমনা হতে পারতেন। কিন্তু ওই ছায়ামূর্তি তাঁকে রেহাই দিত না। রাত্রিতে ঘর থেকে বাইরে গেলেই সেই স্ত্রীলোকটির ছায়ামূর্তি দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেতেন। শুক্লপক্ষের রাতে তো কথাই নেই, অন্যদিন রাতেও স্পষ্ট দেখতে অসুবিধে হত না। কারণ স্ত্রীলোকের গায়ের রঙ যত ফর্সা, পরনের কাপড়টিও তেমনি ধপধপে সাদা। কাজেই অন্ধকারেও যেন তাঁকে স্পষ্ট দেখা যেত। সব সময় যে ছায়ামূর্তি, ছায়ামূর্তিই বা বলবে কেন—কারণ সে তো ছায়া নয়, কায়াময়ীই—সেই নারী দরজায় নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে থাকত তা নয়। মাঝে মাঝে গিরিশবাবু তাঁকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় হেঁটে যেতে দেখেছেন। হাঁটার সময় তার হাত দুটো দুলত, মাঝে মাঝে হাত দিয়ে খসে-পড়া ঘোমটা টেনে যথাস্থানে রাখত।

এতদিন বাড়িতে ওই মূর্তিটাকে একা তিনিই দেখতে পেতেন। একদিন গিরিশবাবুর স্ত্রী অন্দরমহল থেকে বাইরের দিকে আসছিলেন—তিনিও হঠাৎ করে ঘরের দরজা খুলতেই সামনে ওই মূর্তি দেখতে পেলেন। তখন বিছানায় শুয়েছিলেন, ছুটে এসে গিরিশবাবুকে ডেকে ঘুম থেকে তুলে সেই মুখ দেখালেন। কবিরত্ন মশায় বললেন—'কিছু ভয় পেও না, ও খুব ভাল, কারও ক্ষতি করে না। তোমাকে তো আমি কতদিন বলেছি, আমি নিজে ওকে অমনি দরজার কাছে দেখেছি। কাছে গেলেই ও পালিয়ে যায়।' সাহস দিলেন বটে স্ত্রীকে, কিন্তু মনে মনে কপালে হাত ঠেকিয়ে সেই আত্মার প্রতি তাঁর সভয় নমস্কার জানালেন এবং তিনি শয্যাত্যাগ করে মূর্তিটির কাছে গেলেন। কাছে যেতেই মূর্তিটি অদর্শন হল। কবিরাজ-গিন্নি আর বাইরে যাবার এতটুকু চেষ্টা করলেন না, রাম নাম করতে করতে আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

সকাল হতেই গুটি গুটি পায়ে ভুবন রায় মশায়ের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন কবিরত্নমশায়। তাঁকে গতরাতের সব কথা সবিস্তারে খুলে বললেন। এবারে তিনি আর হাসলেন না, বরং বললেন—'ভয় করবেন না কবরেজ মশায়, অমনি একটি মেয়েছেলের মূর্তি আমরা অনেকদিন ধরেই দেখে আসছি, পাড়ার অনেকেও

দেখেছে। সেদিন আপনাকে সাহস যোগাবার জন্যে আমি হেসে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম, আপনি কী মনে করেছিলেন জানি না। তবে আমরা কেউই ভয় পাই না ওকে, ও কোনদিন কারও অনিষ্ট করে না। বউমা বোধহয় খুব ভয় পেয়েছেন ওকে দেখে। সেটাই স্বাভাবিক। আমি গিয়ে তাঁকে সাহস দিয়ে সব বুঝিয়ে বলে আসবো, যাতে তাঁর মন থেকে ভয় চলে যায়।'

এইসময় পর্যন্ত কবরেজ মশায়ের কোনও সন্তানাদি হয়নি। এর কিছুদিন পরেই তাঁর ছেলে শরৎ-এর জন্ম হয়। আস্তে আস্তে শরৎকুমার বড় হয়ে ওঠেন এবং কুড়ি-একুশ বছর বয়সে আদালতে একটি চাকরি পেয়ে যান। আদালতে সেই সময়ে অন্নদা গাঙ্গুলি বলে একজন কর্মচারী ছিলেন। তিনি পুরোহিত পাড়ায় গোপাল ভট্টাচার্যের বাড়িতে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতেন। তিনিও ওই ভূতের বিষয়টি আদ্যোপান্ত জানতেন। কবিরত্ন মশায় তাঁর সঙ্গেও এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সবাই ভূতের ব্যাপারে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন তাঁকে। এমন করে নিরাপদ ভূতের সার্টিফিকেট দিতে কখনও শোনেননি তিনি।

একদিন গাঙ্গুলি মশায় গিরিশবাবুর কাছে এসে বললেন—'কবরেজ মশায়, শুনেছি ওই পাড়ায় থাকার সময় একটি বিধবা মহিলার সঙ্গে মাঝে মাঝে আপনার দেখা সাক্ষাৎ হত কিন্তু কাল রাতে সেই মহিলার সঙ্গে আমার কথাবার্তা পর্যন্ত হয়ে গেছে। আমি তো খুব আগ্রহ নিয়ে বললাম, কী ব্যাপার বল তো? সে বলল—কাল রাতে খুব গরম পড়েছিল। ঘুম আসছিল না বলে বারান্দায় বসেছিলাম, এমন সময় দেখলাম বাড়ির সামনের বাঁশের গেট খুলে কে একটা মেয়েছেলে আমার ঘুরে ঢুকছে। দেখেই আমি কে কে বলে চিৎকার করে উঠলাম। সে তখন আমাকে বলল—'তুমি আমাকে চেন না, আমি আতর জান। এ পাড়ার সবাই আমাকে ভাল করে চেনে, জানে।' এই কথাটুকু বলেই সে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু আমি ভূতের সঙ্গে কথা বলেছি, একথা আমি যেন ভাবতেই পারছি না। মনে করলাম কোথাকার কোনও একটা বদ-চরিত্রের মেয়েছেলে আমার বাসায় ঢুকতে চাইছিল—একে এখনই তাড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু কবরেজমশায় সত্যি কথা বলছি আপনাকে—অত রাতে আমি একটা মেয়েছেলে হয়ে তাকে খুঁজে পেতে বের করতে সাহস হল না। কাছেই আমাকে যে হিন্দুস্থানি প্রসন্ন গোয়ালা ছিল, তাকে ডাকতেই সে উঠে আমাকে বললে—বাবু এত রাতে আর বাইরে যাবেন না—বাড়ি যান।

পরের দিন দুধওয়ালা এসে আমার মায়ের কাছে এসে জানাল যে—'এ পাড়ায় রাত নিশুতি হলে একটা বিধবা মেয়েছেলেকে অনেকে দেখে। গাঙ্গুলি মশায় বোধহয় তাকে দেখেই আমাকে ডাকতে গেছিলেন।'

অন্নদা গাঙ্গুলি এই কাহিনীটি বলতেই গিরিশবাবুর মনে পড়ে গেল তাঁদের পাড়াতে আতর জান নামে একটি মুসলমান মহিলা ছিলেন বটে। এক রাতে তার

রোগের চিকিৎসাও তিনি করেছিলেন—তাও তাঁর মনে পড়ে গেল। তার মৃত্যুর কথাও কবরেজ মশায়ের মনে পড়ে গেল। কাছেই কবরখানা। তখন সব মনে পড়ে গেল। আতর জানের উদ্দেশ্যে একটা নমস্কার জানিয়ে কবরেজমশায় পরের দিন শান্তি স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করলেন।

পরের রাত্রি থেকে আতর জানকে সেই বাড়িতে আর দেখা যায়নি।

৫

তারাশঙ্করের বাড়িতে ভূত!

বাঙালি পাঠকের কাছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। বীরভূম জেলার লাভপুরের এই ক্ষণজন্মা সাহিত্যিক যখন বছর আটেক-এর কিশোর, তখনই তাঁর বাবা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু ঘটে। ফলে অভিভাবকশূন্য এই পরিবারের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব নেন তাঁর বাবার মামা। তিনি দায়িত্ব নিলেন বটে, কিন্তু তিনিও বেশিদিন বাঁচলেন না—বছর চারেকের মধ্যে তারও মৃত্যু হল। তাঁর ওই ভাগ্নে, তারাশঙ্করের বাবা ছাড়া ইহ সংসারে তাঁরও কেউ ছিলেন না। ফলে তারাশঙ্করদের পরিবারের দেখভাল করার মতো কোনও পুরুষ মানুষ ছিলেন না। বাড়িতে একজন নায়েব ছিলেন, আর ছিলেন ছোট ভাইয়ের পড়ানোর জন্যে গৃহশিক্ষক গৌর ঘোষ মশায়। দু-একজন চাকর চাপরাশিও অবশ্য ছিলেন। গরুবাছুরদের দেখাশুনোর জন্যে দু-একজন বাউরি জাতের মুনিষও ছিল। বৈঠকখানা বিস্তৃত উঠোনে তিন-চারটে ধানভর্তি মরাই।

একদিন লোকজনদের প্রতিনিধি হয়ে গৌর ঘোষ মশায় কথা বলতে এলেন তারাশঙ্করের মায়ের কাছে। সবিনয়ে বললেন—'মা, অপরাধ নেবেন না, একটা কথা বলতে এসেছি, ভরসা দেন তো খোলসা করে সব বলি। পিসিমাকে বলবার মতো সাহস আমার নেই—কথায় কথায় যা রেগে ওঠেন। রেগে উঠে হয়তো—

—ঠিক আছে, কী বলতে এসেছ, বলো।

—বৈঠকখানায় তো টেকা কঠিন হলো মা!

—কেন? —বলেই মা বললেন—ও, তোমরা ভয় পাচ্ছে তো!

—হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন মা, কত্তা হয়তো—

অর্থাৎ গৌর ঘোষ মশায় বোঝাতে চাইলেন—কর্তামশায় মরে ভূত হয়েছেন! নায়েব মশায় তখন বললেন—'সমস্ত রাত্তির ধরে, কত্তা মশায় যে ঘরটিতে মারা গেছেন—সেই ঘরে হট হট শব্দ হয়, চেয়ারে-খাটে যেন কেউ উঠছেন, বসছেন, ভয়ে শরীর হিম হয়ে যায় মা।' বলেই হাত দুটি জোড় করে কর্তার বিদেহী আত্মাকে খুশি করার জন্যে প্রণাম করে বসলেন।

পিসিমা এই কথা আগেই শুনেছিলেন এবং শুনে রাগই করেছিলেন। এখন

আবার শুনে চোখ দিয়ে আগুন বের করতে লাগলেন। তাই দেখে মুখ নিচু করে নায়েব-মাস্টারসহ অন্যরা সেখান থেকে পগার পার। কিন্তু আধঘণ্টা যেতে না যেতেই আবার তারা ফিরে এসে গলায় যতটা সম্ভব বিনয় ঝরিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—মা, পিসিমা—আপনারা দু'জনেই দয়া করে একবার এই ঘরে আসুন, নিজের কানে শুনে যান, আমরা কিছু মিথ্যে বলেছি কিনা তাতেই বুঝতে পারবেন।

বাধ্য হয়ে মা উঠলেন, মাথার কাপড় টেনে পিসিমাও তাদের পিছনে পিছনে গেলেন গজগজ করতে করতে। এবারে বৈঠকখানার বারান্দায় এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে লাগলেন...

খট্-খট্! খট্-খট্! তারপরে দুম্-ধমাস্....শব্দটা আসছে বাবার মামা, তারাশঙ্করদের দাদু যে ঘরে মারা গেছিলেন—সেখান থেকেই এই হাড়-হিম করা শব্দটা থেকে থেকেই শোনা যাচ্ছে। সকলে আঁতকে উঠেছেন, কিন্তু মা খুব সাহসী ছিলেন—এগিয়ে গিয়ে নিজেই তালাবন্ধ ঘরটার তালা খুলে দিলেন চাবি ঘুরিয়ে। ঘরের ভিতর হ্যারিকেনের আলো নিয়ে ঢুকলেন, ইচ্ছে না থাকলেও অন্যেরাও পিছনে পিছনে গিয়ে দেখলেন—গোটা ঘর তছনছ—চেয়ারপত্তর উল্টে পড়ে আছে!!

এবার পিসিমার পেত্যয় এল—কাঁপা কাঁপা গলায় মাকে ধরে বললেন—ও বউ, এবারে কী হবে? মা কোনও উত্তর না দিয়ে চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। হ্যারিকেনটা উঁচু করে তুলে ধরে। তারপর আবিষ্কার করলেন—ঘরের একটা জানলা খোলা রয়েছে একটুখানি। নিজে এগিয়ে গিয়ে জানলার খিলটা জোর করে এঁটে ধরে বললেন—'নায়েব মশায় হাতুড়ি আর পেরেক নিয়ে আসুন তো! একেবারে পেরেক মেরে জানলার কাঠ একেবারে আটকে দিন।'

নায়েব মশায় তাই করলেন, করতে গিয়ে হাতুড়িটা একবার হাত থেকে ঠক্ করে মেঝেয় পড়ে গেল। আবার সবাই ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। মা বললেন—'চলুন, ঘরের বাইরে যান, এইবার দেখুন—আর আওয়াজ পাবেন না।' বলে নিজে ঘরের কড়াতে তালা ঝুলিয়ে চাবিবন্ধ করে দিলেন।

কিন্তু মা ভরসা দিলেও কী হবে! দু'দিন যেতে না যেতেই আবার সকলে এসে তাঁরা জোড়হাতে নিবেদন করলেন—পেরেক মেরে কি তাঁদের আটকানো যায় মা!

—আবার হচ্ছে বলছ?

—না মা, ঘরের মধ্যে কিছু হচ্ছে না বটে, কিন্তু সারা রাত ধরে চালের ওপর দিয়ে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন মা। মচ মচ শব্দে আমাদের রাতের ঘুম চলে গেছে। পরের দিন মা একটা পেয়ারা গাছ কাটিয়ে দিলেন, গাছটা বাইরে ছিল, কিন্তু একটা ডাল ওই ঘরের চালের সঙ্গে লেগে গেছিল।

এবারে সব আওয়াজ বন্ধ হল। সবাই দু'দিন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ঘুমোতে লাগল।

কিন্তু ওই দু'দিন মাত্র! সেই রাতে বাড়ি থেকে খেয়ে সবাই কর্তার বাড়িতে ঘুমোতে এসেছে। হঠাৎ সবাই সমস্বরে চিৎকার করে উঠল—ভূ...ভূ...ভূত! গৌর ঘোষ মশায় ছুটে এসে একেবারে উঠোনে পড়ে গেলেন।

—কি, কি হল ঘোষ মশায়?

—প্রচণ্ড শব্দ করে কর্তা 'বাঁপ' বলে লাফিয়ে পড়েছেন!

—'কী বলছ, কী বলছ' বলে মা বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

—বউ যেও না—পিসিমা পিছু ডাকলেন।

কিন্তু বউ শুনলেন না, যে কাঁঠাল গাছের উপর কর্তা 'লাফিয়ে' পড়েছিলেন—হ্যারিকেনটা তার দিকে তুলে মা, দেখতে লাগলেন ঠাহর করে সেই অন্ধকারেই! হঠাৎ তিনিও 'বাঁপ' বলে লাফিয়ে উঠলেন। সবাই দেখতে পেলেন—একটা পাউষ বেড়াল অবিকল 'বাঁপ' বলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মা উঠে গৌর ঘোষকে ডাকলেন —দেখে যাও কী হয়েছে।

আর কী হয়েছে—গৌর ঘোষ ততক্ষণে—'আমার একপাটি চটি কোথা গেল'....বলতে বলতে মুখ নিচু করে বাইরের দিকে—

★ ★ ★

শুধু কি এঁরাই ছিলেন। তারাশঙ্কর আমাদের স্বর্ণ ডাইনির কথাও শুনিয়ে গেছেন। শুকনো কাঠির মতো চেহারা, একটু কুঁজো, মাথাভর্তি কাঁচা-পাকা চুল; হাটে আনাজপাতি কিনে ঝুড়িতে করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ফেরি করত। চাউনি দিয়ে মনে হত বুকের কলজের রক্ত শুষে যাচ্ছে! জেলেপাড়ার মোড়ে একটা ঘর বেঁধে বাস করত—একা। সাতকুলে কেউ ছিল না। স্বামী-ছেলেকে খেয়ে সে এমনি পাগলিনী।

একদিন সে নজর দিয়ে বসল অবিনাশদাদাকে। ওঝা এসে তার ধুম জ্বরে তাঁকে ঝাড়তে লাগল। আর তাতেই স্বর্ণডাইনি চিৎকার করে উঠে বলেছিল—আমাকে মেরো না, মেরো না, আমি স্বর্ণডাইনি। সরষে ছিটিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল ওঝা। গাছে গাছে উড়ে স্বর্ণডাইনি কোথায় চলে গেল।

৬

পিঠাপুরম্-এর হানাবাড়ি

'বাঙালীর সার্কাস' নামে একটি লোমহর্ষক বইয়ের লেখক প্রিয়গোপাল বসু নিজে ছিলেন একটি সার্কাস দলের প্রতিষ্ঠাতা ও অধিকারী। তাঁর দলের সুশীলাসুন্দরী বাঘের খাঁচার মধ্যে বাঘের সঙ্গে একা শুয়ে থাকতেন এবং লড়াই করতেন। সার্কাসের প্রথম বাঙালি মালিক হয়ে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে তাঁর দলের নানা ক্রীড়াকৌশল দেখাতেন এবং তাঁর কালে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন।

কলকাতার বাইরে সুদূর মাদ্রাজ প্রদেশের কোকনদা শহরে সার্কাস দল নিয়ে গিয়ে কেমন করে নিজে ভূত দেখার অধিকারী হয়েছিলেন—তার চমৎকার বর্ণনা তাঁর বইটিতে তিনি রসিয়ে রসিয়ে লিখে গেছেন।

তখন প্রিয়নাথ তাঁর সার্কাসের দলবল নিয়ে ভাইজাকে (বিশাখাপত্তনম্) উপস্থিত। সেখানে খেলা দেখানোর পালা শেষ করে তাঁরা বর্তমান তামিলনাড়ুর সমুদ্রতীরবর্তী কোকনদা শহরে যাবার জন্যে তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন। তাঁর দলের ম্যানেজার বিহারীলাল মিত্রকে সেজন্যে প্রথমেই সেখানে সরেজমিন দেখে আসার জন্য দু'দিন আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। পিথাপুরম্-এর (পিঠাপুরম্) রাজ-কলেজের গা-লাগোয়া এক বিশাল ময়দান। সেখানে খেলা দেখানো উপযুক্ত কাজ হবে বুঝতে পেরে বিহারীলালবাবু কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে সেখানে খেলা দেখাবার লিখিত অনুমতি আদায় করে নিলেন—সেখানেই তাঁবু খাটিয়ে নিতে পারবেন ভেবে তিনি শহরের মধ্যে প্রিয়গোপালবাবু ও অন্যান্যদের থাকার উপযুক্ত বাসাবাড়ির সন্ধানে বের হলেন। কিন্তু পুরো দুটো দিনে শহর চষে বেড়িয়েও বিহারীবাবু থাকার উপযুক্ত কোনও ভাড়াবাড়ির সন্ধান পেলেন না। শেষে জানতে পারলেন শহর থেকে ৫/৬ মাইল দূরে পিঠাপুরম্-এর রাজার একটি বেশ বড় বাড়ি আছে। রাজারা সেটা কেউ ব্যবহার করেন না—খালিই পড়ে থাকে। চোর ডাকাতেরা পথের মধ্যে লুঠতরাজ করে পথচলতি মানুষের সর্বস্ব অপহরণ করার পরে তাকে এই ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে চুরির সাক্ষ্য লোপের জন্যে। ধীরে ধীরে এই পোড়ো বাড়িটা একটা হানাবাড়িতে পরিণত হয়। জনসাধারণ এই বাড়ির চৌহদ্দিতে তো যানই না, লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে যায় এই বাড়িতে ওইসব মৃত মানুষদের প্রেতাত্মা বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়। দূর থেকে ভেসে আসে ভূত-প্রেতের প্রাণকাঁপানো অট্টহাসি, হঠাৎ হঠাৎ জ্বলে ওঠে নানা রঙের বাতি, দরজা-জানালা সব খট্‌খট্ করে ওঠে। তাই ওই হানাবাড়িতে কেউ যেতে চাইলে প্রতিবেশীরা নিষেধ করেন। অনেকে ওই বাড়ি দেখতে গিয়ে আর প্রাণ নিয়ে ফিরে আসেননি, পরে তাঁদের মৃতদেহের গন্ধে সমস্ত পল্লী দূষিত হয়ে উঠলে বোঝা যেত—সেই মানুষটি আর বেঁচে নেই। তাই কেউ ওর আশেপাশে যেতে চাইলেও সবাই হাঁ-হাঁ করে নিষেধ করতেন।

কিন্তু বাড়ি তো বিহারীবাবুকে পেতেই হবে, মালিকবাবু তাঁকে পই পই করে বলে দিয়েছেন—বাড়ির খবর না নিয়ে তিনি যেন না ফেরেন। তাই ঠিক করেছেন ওই পোড়ো বাড়িতেই তাঁরা উঠবেন। তাছাড়া তাঁদের দলের অনেকেই তো ওখানে থাকবেন—একা একা থাকার ভয় সেখানে থাকবে না। অনেক ব্যায়ামবীর তাঁদের দলে আছেন, অস্ত্রশস্ত্রও আছে। জোরালো আলো জ্বলবে রাতভর। হয়তো শহরে কোনও কোনও সময়ে খালি বাড়ি পাওয়া যায়, কিন্তু বিহারীবাবু যখন খুঁজছিলেন তখন একটাও বাড়ি খালি ছিল না। কোনও ছোট বাড়ি পেলে তাদের তো চলবে

না। তাই ওই পোড়ো বিশাল বাড়িটাতেই থাকার ব্যবস্থা করে বিহারীলালবাবু বিশাখাপত্তনমে ফিরে এসে প্রিয়গোপালবাবুকে সব বললেন। 'ভুতুড়ে বাড়ি' শুনে বাবুমশায় হেসেই উড়িয়ে দিয়ে বললেন—দুটো বাঘ আর সিংহ রাতের বেলায় ছেড়ে দেব—সব ভূতপ্রেত খেয়ে সাবাড় করে রেখে দেবে!

কোকনদা শহরের তখন দুটো রেল স্টেশন—একটি সমুদ্রতীরবর্তী—কোকনদা পোর্ট আর অন্যটি কোকনদা সিটি স্টেশন। প্রিয়গোপালবাবু দলবল নিয়ে একদিন গভীর রাতে এসে সিটি স্টেশনে নামলেন। কিন্তু ওই বাড়িতে যাবার জন্যে একটিও ঘোড়ার গাড়ি দেখতে পেলেন না। বাহন হিসেবে উপস্থিত কেবল অনেকগুলো গরুর গাড়ি—বলদে টানা। এক মাইল পথের জন্যে সেই সময়ে (১৮৬০ সাল নাগাদ) পাঁচ পয়সা। সেই চুক্তিতে বেশ কয়েকটা ছইওয়ালা বয়েলগাড়ি ভাড়া করে সদলে তাঁরা সেই বাড়ির দিকে রওনা হলেন। যখন সেখানে পৌঁছলেন তখন রাত নিশুতি হয়েছে।

গরুর গাড়ি থেকে নেমে বিহারীবাবু দলের সামনে সামনে চলতে লাগলেন—পিছনে পিছনে প্রিয়গোপালবাবু ও অন্যেরা দলবদ্ধভাবে। সামনেই এক বিশাল ফটক পার হয়ে ভিতরে গেলাম, ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমাদের এত বড় দল, কিন্তু মাত্র ৭/৮টি হ্যারিকেন হাতে আমরা এগিয়ে চলেছি। বাড়ির চারপাশে একতলা উঁচু পাঁচিলের জন্যে অন্ধকার যেন আরও জমাট। বিশাল প্রাঙ্গণে চার-পাঁচটা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। প্রত্যেক বাংলোর চারপাশে বিশাল আঙ্গিনা। আর প্রত্যেক আঙ্গিনায় বড় বড় আমগাছ, ফলের ভারে অবনত। গোটা উঠোনই হয় সিমেণ্ট-বাঁধানো নয় তো সুদৃশ্য টাইল-খচিত।

এত রাতে এই অচেনা-অজানা বাংলোয় আলাদা আলাদাভাবে থাকার কথা তাঁরা ভাবতেও পারলেন না, কারণ ভয় পাবেন ভাবলেও বাড়িটার বদনামের কথা মন থেকে মুছে ফেলতেও পারছিলেন না বসুমশায়। তাই সকলেই যাতে একত্র হয়ে থাকতে পারে—সেইমতো নির্দেশাদি দিলেন বিহারীবাবুকে। একটি বাংলোতে সব খেলোয়াড়দের থাকার ব্যবস্থার হল। সেই বাংলোর ঠিক মাঝখানে একটা বড় হলঘর। তার দু'পাশে দুটো খুব প্রশস্ত ঘর। তাঁরা সেই দুটো ঘরেই থাকবেন ঠিক হওয়ায় সেখানেই বিছানাপত্তর বিছানো হল। হলঘরের সামনের চওড়া বারান্দায় তিন-চারটে উনুন তৈরি করে রসুইদারেরা খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। তখন গ্রীষ্মকাল, বেশ গরম করতে লাগল। বিহারীবাবু আর রাখালবাবু ঘরের মধ্যে না থেকে বাইরের চত্বরেই শোবার ব্যবস্থা করেছেন দেখে বসুমশায়ও তাদের সঙ্গে শোবার আয়োজন করতে লাগলেন। বিছানাতে শুয়ে শুয়েই তিনি সব কাজ তদারক করতে পারছিলেন। বিহারীলাল মিত্র কলকাতার সিমলা স্ট্রিটের মধু রায়ের গলির বাসিন্দা ছিলেন। তিনি বসু মশায়ের দলে যোগ দেবার আগে গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাসে চাকরি করতেন। রাখালদাস বসু মশায়ের বাড়ি ছিল ৮৪নং

মানিকতলা স্ট্রিটের শুঁড়িপাড়ায়। তিনজনেরই শুয়ে শুয়েও ঘুম আসার উপায় ছিল না। রসুই বামুন দীননাথ মোহান্ত রাঁধতে রাঁধতে এত বকাবকি করছে যে কাজের পোকা মরে যাবার জোগাড়। বসু মশায় ভাবতে লাগলেন কী কুক্ষণে যে দীনুকে সিমলা স্ট্রিটের বিখ্যাত গোঁসাইবাড়ির পাশের হোটেল থেকে নিয়ে এসেছিলেন—এত বছরেও ওর বকবক করা রোগটা যায়নি। দীননাথ বিহারীবাবুকে উদ্দেশ করে বলছিলেন—'ম্যানেজারবাবু যেখানেই যাবেন কেবল কাঁচা কাঠ জোগাড় করে রাখবেন। ফুঁ দিতে দিতে আমার চোখ দুটো অন্ধ হবার জোগাড়। মশায়ের পায়ে গড়—এমনি করে এই গরিব বামুনের ছেলেকে আর কষ্ট দেবেন না। আজ খেতে যেতে কত রাত হয় দেখুন এখন!

বিহারীবাবু মৃদুস্বরে বললেন—'আরে বাবা, বাজার কি এখানে যে শুকনো কাঠ পাবো? এখান থেকে শহর কম-সে-কম দেড় দু'মাইল। আজ কি কেউ খেতে পেত বাবা! ভাগ্যি আঁজুবাবুর বুদ্ধি—এই সবে গাছ থেকে কাঠ ভেঙে রেখেছিলেন—তাই রক্ষে। নইলে আজ সবারই হরিমটর হতো। বাবুরা তো একটা চাকরকেও সঙ্গে দেবেন না, কেবল বলেন— লোকাল ম্যান এনগেজ কর। জল তোলবার জন্যে যে কত কষ্ট করতে হয়েছে তার লেখা-জোখা নেই। পাশের মাঠ থেকে একটা গরুর রাখালকে ডেকে এনে খোসামুদ করে তবে জল তুলিয়ে রেখেছি।'

বিছানায় বসে বসে এই সব কথাবার্তা চলছে, আলো-আঁধারির মধ্যে প্রিয়গোপালবাবুর মনে হল রসুইখানার বারান্দার পিছনের হলঘরের মধ্যে একটা মানুষ যেন শূন্য দিয়ে উড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ানক আওয়াজও সবাই শুনতে পেলেন। প্রথমে সবাই ভাবলেন সার্কাস দলের কোনও ব্যায়ামবীর এমনি করে হঠাৎ লম্ফ প্রদান করেছেন, কিন্তু কোনও মানুষ কি লাফ দিয়ে এতখানি উঁচুতে উঠতে পারে? উঠতে যদি বা পারে কারও পক্ষে কি এমনি করে বাজপাখির মতো উড়ে চলে যাওয়া সম্ভব!

এমনি করে বসু মশায় যখন ভাবছেন, তখনই মিনিট দু'য়েকের মধ্যে প্রথমে একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ এবং ঠিক তার পরেই একটা বিকট ভাঙা গলার শব্দ যেন শুনতে পেলেন বাকিরাও। তাঁদের দলে ছিলেন সতীশ চাটুজ্যে—শ্যামবাজারের সেই লাঠিবাজ আর ক্লাউন আর তালতলার বনমালী দাস—'বোসেস সার্কাস'-এর পূর্বতন ম্যানেজার—দু'জনে মিলে রান্নাবান্নার তদারকি করছিলেন—তাঁদের দু'জনকে ডেকে প্রিয়গোপালবাবু বললেন—'দেখতো হে ব্যাপার কি।' দু'জনেই প্রথমে গট গট করে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন—ভিতরে ঢুকবার সাহস হল না। কিন্তু ভিতরে গোঁ গোঁ আওয়াজটা চলতেই থাকল।

প্রিয়গোপালবাবু দলের কর্তা। কী হয়েছে জানবার জন্যে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন—ব্যাপারটা তাঁকে জানতেই হবে। দলের লোকে ভয় পেয়ে গেলে খেলা দেখানো জমবেই না। তাই হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে চিৎকার করে বলতে

লাগলেন—'লজ্জা করে না তোমাদের! দু-দুটো বুড়ো মিনসে একেবারে পূর্ণচ্ছেদের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছ, আর একটা লোক মরণ যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ করছে— শুনতে পাচ্ছ না? এগিয়ে গিয়ে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছ না!' যে মানুষটা গোঁ গোঁ করছিলেন তিনি তাঁরই সার্কাসের কর্মী ভূতনাথ। প্রিয়বাবু এগিয়ে যাচ্ছেন দেখে সতীশবাবু আর বনমালীবাবুরাও সাহস পেয়ে এগিয়ে গেলেন। তাঁদের দেখাদেখি অন্যেরাও এগিয়ে গেলেন। প্রিয়বাবু একটা ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে গেলেন—যে খেলোয়াড় বুকের উপর সাতমণ পাথর চাপিয়ে তাকে ভাঙতে বলেন, যে পালোয়ান বাঘের সঙ্গে লড়তে একটুও পিছপা হন না—তাঁরা দেখলেন তিনি ভয়ে কেমন জুজুটি বনে গেছেন।

হলের ভিতরে গিয়ে সবাই দেখতে পেলেন হলের মাঝখানে মাত্র একহাত গভীর একটি জলের চৌবাচ্চার মধ্যে হরাইজেন্টাল বারের কুশলী খেলোয়াড় জোড়াসাঁকোর মাথাধরা গলির ভূতনাথ দাস সেই গর্তের মধ্যে হাঁটু গেড়ে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছেন আর চৌবাচ্চার সানের ওপর মুখ ঘসে ঘসে গোঁ গোঁ আওয়াজ করছেন। দেখতে দেখতে একঘর লোক জমে গেল। সকলে ধরাধরি করে তাঁকে তুলে নিয়ে বাইয়ে নিয়ে এলেন। মুখে-চোখে জলের ছিটে দিতেই তাঁর জ্ঞান ফিরে এল, কিন্তু চেতনা পেয়েই থর্ থর্ করে কাঁপতে কাঁপতে এদিকে ওদিকে চাইতে লাগলেন।

হঠাৎ করে প্রিয়গোপালবাবুর মনে হল—এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল অথচ মনে হচ্ছে দলের সবাই এসে জড়ো হননি। ভিতরে গিয়ে দেখলেন—ট্রিপল হরাইজেন্টাল বারের বিখ্যাত খেলোয়াড় বেণীমাধব ঘোষ—বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে রয়েছেন। তিনি যেন ওঠবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। কী হল তাঁর! এদিকে ভূতনাথবাবুকে ধরাধরি করে যে বিছানা পাতা হয়েছিল প্রিয়গোপালবাবুদের জন্যে, সেখানে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। আশপাশে তখন একটা ফিসফিসানি—এ বাড়িটাতে ভূত আছেই—নইলে। গোপাল ডুরিয়া বলেই ফেললেন—'মশায়রা বিশ্বাস করুন আর না করুন আমি নিজের চোখে দেখেছি একটা মেয়েছেলে আমার পাশ দিয়ে দু'বার চলে গেছে। আমার সঙ্গী দু'চার জন বাবুও নেশা করছিলেন—তাঁরাও দেখেছেন। এই বলে বললেন—'আমি জন্তু-জানোয়ারদের সঙ্গে থাকতে পারবো না এই হানাবাড়িতে। আপনাদের সঙ্গেই থাকবো। ভূতনাথের চেতনা ফিরেছিল। তিনি বললেন—'আপনি আমার বাবার মতো, আপনার কাছে মিথ্যে বলব না। আমি দিব্যি গেলে বলছি, আমি স্বপ্ন দেখি নাই। আপনাদের কাছে বলতে আমার সাহস হচ্ছে না। আমি শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বটে, কিন্তু তার পরেই সেই ভয়ানক ব্যাপারটা ঘটে গেল। আমার খুব ভয় করছে বাবু, মনে হচ্ছে তারা আবার আসছে—রাম-রাম, রাম-রাম!' এই বলে দু-হাত কপালে তুলে উদ্দেশ্যহীনভাবে প্রণাম করে বললেন ভূতনাথ। আর তারপরেই আবার সারা শরীর জুড়ে একটা

কাঁপুনি, ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন নির্দেশের উদ্দেশ্যে। তার দিকে তাকিয়ে দেখে অনেকেরই আত্মাপুরুষ উড়ে গেল। রাত দুপুর হয়ে গেছে। ভূতনাথের ভূতগ্রস্ত অবস্থা দেখে বেশ কয়েকজন কাঁপতে কাঁপতে মালিকের বিছানাতেই লটকে পড়েছেন—কাণ্ডকারখানা হারিয়ে। প্রায় পঞ্চাশ জন লোক ভূতনাথকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। ভূতনাথকে একটা কপট ধমক দিয়ে বসুমশায় বললেন—'তুমি ন্যাকামি ছাড় তো! চারিদিকে এত লোক দাঁড়িয়ে—তবে আর ভয় পাচ্ছ কেন?' তাঁর ধমক শুনে ভূতনাথ জীবনে যা কখনও করেননি—মালিকের মুখের ওপর চোপা করে বলে উঠলেন—'জানেন ইস্টিশানের টিকিটবাবু আমাদের কী বলেছিলেন? —বলেছিলেন এ বাড়িতে মানুষ বাস করে না, আপনারা খুব সাবধানে থাকবেন। বিহারীবাবুর আর কী! এনতার ফ্রি টিকিট বিলোবেন আর ফ্রি বাড়ি নেবেন। মালিকের সুসার করবেন—অভাগা খেলোয়াড়দের দিকে একবারও তো চেয়ে দেখবেন না। এই বাড়িতে রাতে তো দূরের কথা দিনমানেও কেউ আসে না, লাখ টাকা দিলেও গরুর গাড়ির গাড়োয়ান এই পথ মাড়ায় না। আমার এখন পুরোপুরি জ্ঞান ফিরেছে, কিন্তু সর্ব অঙ্গে আমার ব্যথা—হাত পায়ের দশা দেখুন—তাহলে সত্যি-মিথ্যে সব বুঝতে পারবেন।'

কে একজন হ্যারিকেন একটা তুলে ধরতেই দেখা গেল ভূতনাথবাবুর হাত-পা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, সবটাই ছড়ে গেছে গভীরভাবে। সতীশবাবু তাঁকে সাহস দিয়ে বলতে লাগলেন—'ভয় কি ভূতনাথ, তুমি তো আর একা নও এখানে। আমরা এত লোক তোমার পাশে থাকতে তোমার ভয় কিসের! তাকিয়ে দ্যাখো—তোমার পাশে বেণীবাবু একটা কোৎকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। উনি সাতমণ পাথর বুকে ভাঙেন, তোমার গোলা নিয়ে খেলা করেন, প্যারালাল বারে ডবল ডিগবাজি খান—তাঁকে দেখে তোমার সাহসী হতে ইচ্ছে করছে না, কেবল ফাঁকি দিয়ে বীর নামটা কিনে নিচ্ছ?'

তাঁর কথা শুনে ভূতনাথ একটু সুস্থ হয়ে নিজের বিছানার দিকে গেলেন। রসুইখানায় ডাল-ভাতের গন্ধ পেয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লেন—একটু বাদেই তো খাওয়া হবে। কিন্তু যেই বিছানায় শোওয়া অমনি রাজ্যের ঘুম তাঁর চোখে নেমে এল—গভীর ঘুমে তিনি বিছানায় এলিয়ে পড়লেন। কতক্ষণ শুয়েছিলেন তিনি তা জানেন না, কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে হল কে যেন তাঁকে ঠেলা দিয়ে ডাকছে! ভূতনাথবাবু কোনও সাড়াশব্দ না দিয়ে মট্‌কা মেরে পড়ে রইলেন, পরে পাশ ফিরে জুত করে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে হল কে যেন তার পা ধরে টানছে। চোখ চেয়ে দেখলেন—কী গভীর জমাট ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঘরে টিনের যে ডিবেটা জ্বলছিল—সেটা আর নেই, বাইরের বাগানের সামান্য আলো ঘরের মধ্যে আসছে। তাঁর মনে হল এসব শয়তানী বনমালীবাবুরই। তাই তিনি চিৎকার করে উঠে বললেন—'আঃ কী করছেন বনমালীবাবু! এইমাত্র আমি জেনে এসেছি,

এখনও ভাত হয়নি। কেন আমায় বিরক্ত করছেন?' কিন্তু কেউ যেন তাঁর কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না। তারপরেই সেই ভয়ানক ব্যাপারটা ঘটতে লাগল। তিনি স্পষ্টত বুঝতে পারলেন খুব মোটা মোটা অনেকগুলো হাতের অনেকগুলো সাঁড়াশির মতো আঙুল তাঁর ঘাড়, পিঠ ধরে তাঁকে তুলবার চেষ্টা করছে, হাত ও পায়েও তেমনি করে কতকগুলো আঙুল মরিয়া হয়ে চেপে ধরেছে আর টানছে। ঘরের আলো-আঁধারি আবছায়াতে তিনি প্রাণভয়ে চিৎকার করে উঠলেন—'কে রে?' তারপরেই উঠে বসলেন। বসতেই দেখলেন তাঁর চারপাশে চার চারটে যম—প্রাণপাখি তাই দেখে উড়ে যাবার উপক্রম। একটা নয়, চার চারটে যম।

'ভয়ে চোখ বেরিয়ে আসতে চাইছে। হঠাৎ নজরে এল ঘোর কালো চারটে মুখের ভেতর থেকে চার পাটি দাঁত বেরিয়ে এসে হি হি করে হাসতে লেগেছে। তিনি চিৎকার করতে যেতেই যেন একশোটা হাত এগিয়ে এসে তাঁর গলা-মুখ চেপে ধরলে—গলা দিয়ে একটুও আওয়াজ বের হল না। প্রাণের ভরসা একেবারেই ছেড়ে দিয়ে তিনি সেই প্রাণ বরফঠাণ্ডা করা দাঁতের পাটি—হি হি করা হাসি আর খেজুর গাছের পাতার মতো খাড়া খাড়া চুলগুলো দেখতে দেখতে একেবারে বিহ্বল হয়ে গেলেন।'

ভূতনাথবাবু এইভাবে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলা শেষ করতে না করতেই কে যেন পিছন থেকে চিৎকার করে বলে উঠলেন—'ওগো, তারা ওই আবার আসছে।' এই কথা শুনতে পেয়েই গোটা দলের মধ্যে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল আসন্ন ভয় থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে। বিশেষ করে মেয়েরা—শোভাবাজারের ফুলবাগানের সুচিন্তা আর সুকুমারী, ব্যাঘ্র-সুন্দরী সুশীলাসুন্দরী, বিডন স্ট্রিটের হিরন্ময়ী ও মৃণ্ময়ী (ডাকনাম ভূতি ও ভোমা)—চিৎকার করে 'বাবা গো—মাগো' বলে বিহারীবাবু আর হরিমতিবাবুর (বেদব্যাস নামেই পরিচিত) ঘাড়ের ওপর এসে পড়লেন। বেদব্যাস সবে কলকেতে আগুন দিয়ে তামাক খেতে শুরু করেছিলেন। মেয়েরা গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়াতে কলকের আগুন ছিটকে গিয়ে বিছানায় পড়ে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে দিলে। এর মধ্যে ভূতনাথবাবু আবার জ্ঞান হারিয়ে বসলেন —ঘন ঘন ফিটের খিচুনি দেখে সবাই আরও ভয় পেয়ে গেলেন। সতীশ চাটুজ্জ্যের ছেলেও এই দলে ছিলেন— তাকে দেখে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বলে উঠলেন—'বেটা তুই মুসলমান, তুই আমাদের বাঁচা।' বেণীবাবুর হাতের লাঠি কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে গেল। রসুইখানা থেকে দীননাথ দৌড়ে ঘরে আসতে গিয়ে অন্ধকারে ঠাহর করতে না পেরে নিচু চালের ধাক্কা খেয়ে কপাল ফেটে রক্তারক্তি। মেয়েদের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ আর পুরুষদের চিৎকার সেই ভূতের পুরী একেবারে নরক হয়ে উঠল—কে বলবে এটা পিঠাপুরম-এর রাজবাড়ি। গোপাল ডুরিয়া আর সহিসেরাও আস্তাবল ছেড়ে দৌড়ে সেই নরকে এসে তাকে গুলজার করে দিলে। এর মধ্যে বিছানার আগুন ধিকি ধিকি এগিয়ে এসে বেদব্যাসের কাপড়ে লেগে গেল এবং

ক্রমশ উপরের দিকে উঠছে—আগুনের আলোয় তা দেখতে পেয়ে রাখালবাবু এক ঝটকায় টান মেরে তার কোমরের কসি খুলে ফেললেন, নরক একেবারে পরিপূর্ণ হল নির্বাস বেদব্যাসের উপস্থিতিতে। ধীরে পরিবেশ শান্ত হল। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্যে।

একটু বাদেই রন্ধনশালা থেকে দীননাথের চিৎকার শোনা গেল—'ছোটবাবু (প্রিয়গোপাল বসু), শিগগির উঠুন—একটা কি বিশ্রী রকমের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।' প্রিয়গোপালবাবু উঠে বসতেই স্পষ্ট শুনতে পেলেন বারান্দার দিক থেকে এই ভয়ানক আওয়াজটা আসছে—'দর্‌দর্‌ দর্‌দর্‌ দর্‌দর্‌'। এই আওয়াজটা যেন কোনও মানুষের গলা থেকেই বের হয়ে আসছিল। —এই শব্দের যেন কোনও বিরাম নেই; ক্রমাগত হয়েই চলেছে। মনে মনে তাঁর একটা ভয় জাগল। তাই বিহারীলাল, রাখালবাবুদের ডেকে তুললেন। অনেকে মিলে বারান্দার কোণে গিয়ে একটা ভয়ানক ভয়ঙ্কর কাণ্ড দেখতে পেলেন। সেখানে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে পা-দু'টি সামনে মেলে ডানহাতের লাঠিখানা উঁচু করে ধরে দলের আমিরুদ্দিন শেখ মুখে একনাগাড়ে 'দর্‌দর্‌ দর্‌দর্‌' বুলি আওড়ে চলেছেন। তাঁর চোখ দুটি জবা ফুলের মতো লাল, মুখ থেকে সমানে গেঁজলা বেরিয়ে আসছে—এত বড় জোয়ানটা কেমন যেন মিইয়ে গেছেন।

কী করবেন ঠিক করতে না পেরে চারদিকে চেয়ে কিছু দেখতে চাইলেন তিনি। কিন্তু সেই ঘোর অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলেন না। লোকটার কাছে গিয়ে দেখলেন তিনি সম্পূর্ণ জ্ঞান হারাননি বটে, কিন্তু কথার উত্তর দেবার সামর্থ্য তার ছিল না। অনেকক্ষণ বাদে কয়েকবার দীর্ঘশ্বাস নিয়ে তিনি কাটা কাটা করে যা বললেন তা এক জায়গায় করে নিলে এমনটায় দাঁড়ায়—'বাবু, আমি বাদলচাঁদ ও নূরজাহান বিবির পাছু পাছু এসে রোয়াকে লাঠি হাতে বসে রইলেম। ওঁরা দু'জন খানিক পরে ঘরের ভিতর গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। কাছে কেবল একটা টিনের ডিবে জ্বলছিল। আমার খুব ঘুম আসছিল। আমার সবেমাত্র তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় সামনে শুকনো পাতার খস্‌খস্‌ আওয়াজ পেয়ে 'কোন হ্যায়' বলে যেই হাঁক দিয়েছি, দেখলাম দু'জনে আমার দিকে তেড়ে আসছে। আমি কিন্তু ভয় পাবার ছেলে ছিলাম না। যেমন লাঠি তুলে মারতে যাব, আশ্চর্য্যি ব্যাপার—অমনি আলোটা দপ্‌ করে নিভে গেল। একজন এসে আমার হাতে লাঠি ধরলে, আর একজন আমার টিপে ধরলে। আমি বাদলবাবু, বাদলবাবু, দু' চারবার হাঁক দিলাম, কেউ সাড়া দিলে না। আমি কিন্তু বুঝতে পারছিলাম—ওরা ঘুমিয়ে পড়েননি। আমি একটা কুস্তির প্যাঁচ চালিয়ে ওদের হাত থেকে গলাটা ছাড়িয়ে নিতে চাইলাম—কিন্তু কিছুতেই ছাড়াতে পারলাম না। আসলে ওরা তো মানুষই নয়—অপদেবতা। গলায় যে হাত ও আঙুলগুলো ধরেছিল সেই হাড়সর্বস্ব হিম ঠাণ্ডা অনুভূতি...মানুষের হতেই পারে না। ভূতনাথবাবু ঠিকই বলেছিলেন। ওরা ওই রোয়াকের ধার থেকে

টেনে এনে আমাকে এইভাবে কোণঠাসা করে রেখে গেছে।'

বিহারীবাবু জিগ্যেস করলেন—'তবে 'দর্‌দর্‌ দর্‌দর্‌' করছিলে কেন?' উত্তরে তিনি বললেন আমি দর্‌ দর্‌ বলিনি—ধর্‌ ধর্‌ বলছিলাম—বাঙ্গাল দেশে থেকে থেকে এমনই উচ্চারণটা হয়ে গেছে।

এবারে সবাই ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে দিলেন। ঘর থেকে আলুথালু বেশে পাগলিনীর মতো বের হয়ে এলেন বিবি নূরজাহান। তবে কি? ওকে ভূতে ধরেছে। পরক্ষণেই অন্ধকার ভেদ করে চারটি লোক ছুটে এসে বললে—'একঘর লোক আমরা শুয়ে আছি, ভয়ানক কাণ্ড ঘটে গেল। আবার সেই তাঁরা এসেছিল।' দেখতে দেখতে সেই ভয়ের রাত শেষ হয়ে গেল। চোখের পাতা কেউ বুজতে পারলেন না। কিন্তু চারদিক ফর্সা হতে না হতেই একদল লোক ছুটে এসে বললেন—বাবু, ওদিকে সর্বনাশ হয়েছে, দেখুন দু-চারজনকে ভূতে রাতে একেবারে মেরে রেখে গেছে। ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ করে চারদিক কাঁপিয়ে তারা এসেছিল। প্রিয়বাবু দেখলেন ৪/৫টি ছিন্ন মুণ্ড মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, রক্তের স্রোতে সমস্ত মেঝে লালে লাল। হঠাৎ দিনের বেলাতেই সমস্ত জানলা শার্সি সশব্দে নড়তে লাগল—সবগুলিই কোন্‌ এক ভৌতিক মন্ত্রে একসঙ্গে খুলছে, একসঙ্গে বন্ধ হচ্ছে। মহা-আতঙ্কে সবাই আর্তনাদ করছেন, এই বুঝি পৃথিবীর শেষ ঘটে যাবে। বসুমশায় শয্যার উপরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলেন ৫/৬টি নরমুণ্ড এদিক-ওদিক গড়িয়ে গড়িয়ে বেড়াচ্ছে। বিশাল কতকগুলি হাত জানলা দিয়ে লম্বা করে এগিয়ে আসছে—একেবারে গলার কাছে। তিনি মূর্ছিত হয়ে বিছানায় পড়ে গেলেন।

যখন জ্ঞান ফিরল, তখন দেখি সবাই সেবা করছেন, এমনকি পিঠাপুরম্‌ রাজবাড়ির এক কর্মচারীও। সবাইকে আদেশ দিলেন এই ভূত্‌ড়ে বাড়িতে আর নয়। দুপুরের মধ্যেই বাড়ি খালি করে সবাই চলে গেলেন।

৭

হাকিমের বাংলোর বিবিভূত

গোপালচন্দ্র শাস্ত্রীকে একালের লোক তেমন করে চেনেন না, সেকালের লোকেও বিশেষ কেউ চিনতেন কিনা আমাদের লেখা থেকে পাঠক তা বুঝে নিতে পারবেন। ইংরেজ আমলে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার হিসেবে অবশ্য বেশ পরিচিত হয়েছিলেন। স্বদেশ প্রেমিক এই মানুষটি দীর্ঘদিন ইংরেজ সরকারের দাসত্ব করতে পারেননি, সেজন্য চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর ডেপুটিগিরির সময় একটা দারুণ ভৌতিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেটি তিনি 'ভারতী' পত্রিকার ১৩০৪ সালের শ্রাবণ মাসে দু'কিস্তিতে লিখেছিলেন। তার থেকেই আমাদের এই সত্যি ভূতের বাড়ি নিয়ে একটা লেখা পাঠকদের দরবারে উপস্থিত করার সুযোগ

এল। তবে তিনি রাজনৈতিক কারণে কিছু স্থান এবং কিছু লোকের নাম গোপন করে গেছিলেন।

বঙ্গদেশে ডেপুটিগিরি করতে করতে গোপালবাবু একবার বিহারে বদলি হয়ে যান। যেখানে চাকরি করতে গেলেন সেখানে যে ইউরোপিয় জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন—তাঁকে সাহায্য করতেই গোপালবাবুকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। জায়গাটার নাম ধরে নিন 'ক'। এখানে তাঁর কাজের খুব চাপ ছিল। আদালতের হাকিমের কাজ প্রচণ্ড পরিশ্রমেও সারাদিনে শেষ করতে পারতেন না—মাসের মধ্যে অন্তত পঁচিশটা দিন বাসায় ফিরে আসতে রাত ন'টা বেজে যেত। সুবিধের মধ্যে তাঁর বাসা ছিল গঙ্গার একেবারে পাড়েই, বিস্তৃত বাংলোটিতে ফিরে শয্যায় নীল হাওয়াটা খুবই আরামের ছিল। ফুরফুরে হাওয়ায় শরীরের সমস্ত ক্লান্তি একেবারে দূর হয়ে যেত। কয়েকটি গাছ কাটিয়ে তিনি তাঁর বাংলা-লাগোয়া মাঠটাকে প্রশস্ত আর খোলামেলা করে নিয়েছিলেন। গাছ কাটানোর জন্যে পরিচিতদের কেউ কেউ তাঁকে বলেন—'গাছ কেটে আপনি ভাল করেননি। এর একটি পুরনো গাছে একটি ব্রহ্মদত্যি বহুকাল ধরে বাস করে আসছেন বলে আমরা শুনেছি। তাছাড়া এই বাংলোবাড়িতে অনেক ভূতপ্রেত বাস করে। সেজন্যে এই বাড়ি সহজে কেউ ভাড়া নেয় না। আপনি সে জন্যেই এত সস্তাতে এই বাড়ি ভাড়া পেয়েছেন।'

সত্যিই তাই—বাংলোর আশেপাশে অন্যদের বাড়িঘর নেই, মানুষজনের চলাফেরাও খুব কম। সন্ধে হলে তো কথাই নেই, চারধার একেবারে শুনশান। পাশ দিয়ে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। এই বাংলো বাড়ির সামনেই একটা মড়া পোড়ানোর ঘাট ছিল। সেখানেই বহু শবের সৎকার হত। তাতে আশপাশের পরিবেশ দুর্গন্ধে ভরে যেত। একবার এক জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট এই বাংলোতে থাকার সময় মড়া পোড়ার গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে সরকারকে বলে এখান থেকে শবদাহের ব্যবস্থা উঠিয়ে দেন—ঘাট উঠে যায় মাইলখানেক দূরে। গোপালবাবু স্থানীয় লোকেদের কাছে আরও শুনেছিলেন যে, শ্মশান দূরে সরে যাবার পর থেকেই বাংলোটিতে ভূতের উপদ্রব খুব বেড়ে যায়। ওই জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট—মিঃ টো বদলি হয়ে চলে যাবার পর আর কোনও ম্যাজিস্ট্রেট এই বাংলোতে বাস করতে আসেননি—এখানে ভূতের উপদ্রবের কথাটা সর্বত্র এমনভাবেই চাউর হয়ে গেছিল। তবুও গোপালবাবু এখানেই বাসা নিয়েছেন শুনে অবধি স্থানীয় এবং আদালতের লোকেরা খুব অবাক হয়ে গেছিলেন। শুধু অবাক নয়—তাঁর ক্ষতির আশঙ্কাও তাঁরা করতে লেগেছিলেন। গোপালবাবুকে তাঁরা একেবারে সাবধান করে বলে দিলেন—'দেখুন, এখানে আগে বেশ কিছু গোয়ালা, কসাই জাতীয় মুসলমান বাস করত। ভূতের ভয়ে তারা সবাই পালিয়ে গেছে, সেজন্যেই এখানে কোনও লোকবসতি নেই। আপনি যদি নিজের ভাল চান তো তাড়াতাড়ি এখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে শহরের অন্য কোনও বাড়ি ভাড়া করে উঠে যান।

গোপালবাবু যুবক মানুষ—বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেই শ্বশুরমশায়ের যত্নে এই চাকরিটি পেয়ে গেছিলেন। তাঁর স্ত্রী নবীনা, সবে বিয়ে হয়েছে। স্ত্রী গুণবতী—বাংলা, হিন্দি—দু'টি ভাষাতেই অনর্গল কথা বলতে পারেন—সংস্কৃত এবং ইংরেজিতেও চলনসই জ্ঞান। তাঁর ভয়-ডর কম—তবুও লোকমুখে এই যে ভূতের ব্যাপার প্রচার হয়েছে—তার উৎস জানবার জন্যে তিনি স্বামীকে অনুরোধ করলেন। সত্যিই যদি এরকম কোনও ভৌতিক উপদ্রব থাকে—তবে আমাদের অন্য জায়গায় বাড়ি দেখতে হবে।

বিদেশ বিভুঁইয়ে স্ত্রীর কথা শোনা ভাল—তাঁর মতো বন্ধু তো এখানে আর কেউ নেই। তাই ভেবে পরের দিনই তিনি শহর কোতোয়ালকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলে তাঁকে সব খুলে বললেন। তিনিও এসব কথা কিছু কিছু আগেই শুনেছিলেন। তবে হাকিমের সামনে সে-সব কথা কবুল না করে বললেন—'হুজুর আমি দু-এক দিনের মধ্যেই সরেজমিনে তদন্ত করে আপনাকে সব রিপোর্ট দেবো। এ ক'দিন আপনার বাংলোর চারপাশে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করছি, আর অনেক আলো লাগাবার ব্যবস্থা করছি স্যার, আপনি কিছু ভাববেন না, এই বান্দা হাজির থাকতে আপনার কোনও লোকসান হতে দেবো না।' তাঁর কথা রেখে তিনি ২/৩ দিনের মধ্যে একটা বড়সড় গোপন রিপোর্ট গোপালবাবুকে সিলকরা খামে ভরে নিজে এসে দিয়ে গেলেন এবং অভয় দিয়েও গেলেন। পাহারা আর আলোর ভয়ে এ ক'দিন ভূতের তেমন উৎপাত দেখা গেল না—দু'একটা ধুপধাপ শব্দ ছাড়া। কিন্তু ওই গোপন রিপোর্ট পড়ে গোপালবাবুর গায়ের সমস্ত লোম ক্ষণে ক্ষণে খাড়া হয়ে উঠতে লাগল। তবে তরুণী স্ত্রীকে তার সব খুলে বললেন না—পাছে ভয় পেয়ে বিগড়ে যান। এর দু'দিন পরেই স্বয়ং ইন্সপেক্টরবাবু নিজের এসে বলে গেলেন—'They say that this Bunglow is haunted by–' এবং বাংলোতে—উপদ্রব আছে। গোপালবাবু চুপ করে আছেন দেখে আবার বললেন —'Many have seen with their own...'—তাঁরা অনেকেই নিজের চোখে দেখেছেন।' কাছেই বসেছিল মুসলমান সাব-ডেপুটি কালেক্টর—তিনি শুনে বললেন—'We are now living in arrage of supersition–আমরা একটা কুসংস্কারের যুগে বাস করছি এখন।' তবে মৌলবী সাহেব একেবারে সোজাসুজি বলে দিলেন—বাস্তবের আড়ালে কত রহস্য যে লুকিয়ে আছে—কে জানে!' অর্থাৎ—।

দেখতে দেখতে সপ্তাহখানেক কেটে গেছে। আদালতে কাজ সেরে গোপালবাবু বাসার দিকে আসছেন, রাত প্রায় ন'টার কাছাকাছি। এদিন তাঁর হাতে আবগারি আর পুরসভা সংক্রান্ত ছোট ছোট বন্দোবস্তের ভার ছাড়াও বেশ কয়েকটা ফৌজদারি মোকদ্দমার ভারে ন্যস্ত ছিল। একজন মুসলমান দরবেশিনী (স্ত্রী—দরবেশ বা ফকির) চুরির মোকদ্দমায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারায় অভিযুক্তা হওয়ায়

আদালতে তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছিল। ওই মহিলা খানদানি বংশের ছিলেন—কারণ উর্দু এবং ফার্সিতে খুবই দখল ছিল, কোরান এবং ইসলামি তত্ত্ব একেবারে নখদর্পণে। তাঁর পাণ্ডিত্য ও ভদ্রতা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় তাঁকে অশেষ শ্রদ্ধা করতেন। ইনি আসলে ইরান থেকে এসেছিলেন। অথচ এই মহিলাকেই চুরির অপরাধে শোপর্দ করা হয়েছে—গোপালবাবু শুনে ইস্তক অবাক হয়ে গেছেন। অন্যদিকে পুলিস ইন্সপেক্টর, যিনি তাঁর বিরুদ্ধে চুরির মামলা করেছেন—তিনিও নিজে সৎ এবং মিথ্যা মামলার বিরোধী ছিলেন। তিনিই নিজে রিপোর্ট দিয়েছেন যে, এই দরবেশিনী, আসল নাম ফতিমা গাঁইয়া, চুরি করেছেন—এর স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সামান্য ধরনের চুরির অভিযোগ হলে হয়তো সবাই উপেক্ষা করতেন। কিন্তু এই চুরি ঘৃণিত এবং খুবই নীচতার। এবং মজার কথা ফতেমার বিরুদ্ধে যাঁরা সাক্ষ্য দিলেন তাঁরা সকলেই তাঁর গুণকীর্তন করেও তাঁকে 'চোর' বলেই প্রমাণিত করলেন। অতএব হাকিম হিসেবে গোপালবাবুর আর অন্য কোনও উপায় রইল না, তিনি তাঁকে চোর বলেই সাব্যস্ত করলেন—তবে কোনও রায় দিলেন না। তিনদিন পরে রায় শোনাবেন জানিয়ে তিনি মোকদ্দমা মুলতুবি করে দিলেন। পরের দিন নিজেই সরেজমিনে সব জানবার জন্য অকুস্থলে গেলেন এবং তাতে তাঁর ধারণা হয়ে গেল যে ফতিমা অবশ্য অপরাধ করেছেন। তারপরের দিন মামলাটি নিয়ে গোপালবাবু ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়ের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। সব শুনে তিনিও অভিযুক্তকে শাস্তি দেবার পরামর্শ দিলেন।

এই সময়ে সরকারি আদেশে দুপুরের পরিবর্তে সকালে কাছারি বসাবার হুকুম হয়েছিল। তাই রায়দানের দিনে সকাল ৮টার মধ্যেই ফতিমাকে কাছারিতে হাজির করানো হল। আদালতের কাজ শুরু হতে হাকিমসাহেব দণ্ড ঘোষণা করলেন—তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড। শুনে দরবেশিনী বললেন—'ঈশ্বর আপনার ভালো করুন; নিরপরাধিনীকে বিনা কারণে আপনি প্রাণে মারলেন।' পুলিসের লোকেরা কালক্ষেপ না করে ফতেমাকে জেল হাজতের দিকে নিয়ে গেলেন। স্পষ্ট দেখতে পেলেন গোপালবাবু—দরবেশিনীর চোখ থেকে ঘৃণার ও প্রতিহিংসার আগুন ঝরে পড়ছে। গোপালবাবু তাতে বিহ্বল হয়ে গেলেন, তাঁর হাত থেকে কলম খসে পড়ে গেল। চেয়ার থেকে উঠে কাউকে কোনও কথা না বলে তিনি বাসায় ফিরে এলেন।

কয়েকদিনের মধ্যে গোপালবাবু খবর পেলেন—জেল হাজতেই দরবেশিনীর মৃত্যু হয়েছে। ডাক্তার মৃত্যুর জন্যে তাঁর মানসিক অবসাদকেই দায়ী করে রিপোর্ট দিয়েছেন। কিন্তু জেলের জমাদার এসে জানালেন—এমন অসাধারণ এবং মহান মৃত্যু তিনি কখনও দেখেননি—এটা মৃত্যু নয়। জীবনমুক্তির পর নবজীবন। শহরের মুসলমানেরা এসে ফতেমার শবদেহ নিয়ে গিয়ে কবর দিলেন।

এরপরে বেশ ক'টা দিন কেটে গেছে—একদিন বিকেলে বাংলোর বারান্দায়

বসে গোপালবাবু গঙ্গার তরঙ্গমালা দেখছিলেন, তার বুড়ো চাপরাশি এসে বলল—'হুজুর, পরশু রাতে পাহারা দেবার সময় কনস্টেবল মূলচাঁদ সিং বড্ড ভয় পেয়ে গেছিল। কাল রাতে পাহারা দিচ্ছিল সিপাই নাদির খাঁ—সেও ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিল। আজকে রাতে জোড়া পাহারার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। গোপালবাবু তর্ক না করে দু'জন পাহারাদারদের জন্য হুকুম দিলেন। কথা বাড়ালেই তাঁর স্ত্রী সব শুনে হয়তো ভয় পেয়ে যেতে পারতেন। চাপরাশি চলে গেলেন রান্নার লোককে বারান্দাতেই খাবার দিতে যাবার জন্য বললাম। দু'জনে সেখানে বসেই রাতের খাবার খেয়ে নিলাম। খাওয়া শেষ হয়ে গেল—রাত প্রায় দশটা তখন। ঠিক সেই সময়ে তাঁর ঘোড়ার গাড়ির সহিস এসে কাঁপতে কাঁপতে জানাল—'আমি জেলের মধ্যে গেছিলাম, গিয়ে দেখি পাহারার কনস্টেবল দু'জন অজ্ঞান হয়ে মূর্ছায় পড়ে আছে। পাশে ছিল জেলের চাকর ভোঁজলা—তার মা বলল, এরা ভূত দেখে অজ্ঞান হয়ে গেছে।'

শুনেই দৌড়ে তিনি ফটকের বাইরে এসে দেখেন সত্যিই কনস্টেবল দুটো অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে। ভোঁজলাও মূর্ছিত। অনেক কষ্টে তাদের চেতনা ফেরানো গেল। তিনজনেই সংজ্ঞা পেয়ে একই রকমের এজাহার দিল। তারা যা বলল—তার রমকটা এই প্রকারের—'ক'দিন ধরেই দিনে থানার কাজ এবং রাতের পাহারা দেবার কাজ চলছে। পরশু রাতে একটি মেয়েছেলেকে ফটক দিয়ে যেতে দেখেছিলাম, তার হাতে মশাল ছিল—সেটি খুব মৃদুভাবে জ্বলছিল—তাই মেয়েটির চেহারাটা স্পষ্ট করে দেখা যায়নি। তবে মনে আছে তার মাথায় মানুষের মাথা ছিল না একটা খুলির মতো ছিল। তাকে জিগ্যেস করলাম—তুমি কে? সে বললে—তিব্‌রা। তখন জানতে চাইলাম—সে কেন এসেছে। তাতে সে খুলিতে হাত দিল—আর সঙ্গে সঙ্গে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। আজ রাতে পাহারা দিতে গিয়ে আবার ওই মেয়েটিকে দেখতে পাওয়া গেল। আজও সেই মশাল আর খুলি দেখেছি। সে কিছু একটা বলতে চাইল—তার ভাষা বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ সে একটা ভয়ানক মূর্তি ধরে পাশের গাছের ডালে পা দিয়ে সোজা গাছে উঠে গেল। এরমধ্যেই তারা অজ্ঞান হয়ে যায়। ভোঁজলা চাকরও একই রকমের এজাহার দিয়েছে। তাকে পাশের এক দোকানদার বলেছিল ঐ ভূত নারকেল গাছের মতো লম্বা—কিন্তু হাত ছিল না।

সেই সময় সাব-ইন্সপেক্টর মশায় রোঁদে বেরিয়েছিলেন—তাঁদের সবাইকে দেখে ঘোড়া থেকে নেমে কী হয়েছে তা জানতে চাইলেন। তাঁর সঙ্গে যতজন পাহারাদার ছিলেন—তাদের সবাইকে বলা হল সেই রাতে সবাইকে পাহারা দিতে হবে। যদিও গোপালবাবু ভাবলেন পাহারা দিয়ে ভূতকে কি তাড়ানো যাবে!

দারোগা চলে যেতেই তিনি সেই বারান্দায় ফিরে এলেন, দেখলে তাঁর স্ত্রী সেখানে নেই। অন্দরেও তাঁকে পাওয়া গেল না। গঙ্গার ঘাটের দিকে নজর যেতেই

দেখতে পেলেন ঘাটের এক পৈঠাতে একজন স্ত্রীলোক হতচেতন হয়ে পড়ে আছেন। ছুটে গিয়ে দেখলেন—তিনিই তাঁর স্ত্রী। অনেক কষ্টে তাঁর চেতনা ফিরিয়ে তাঁকে বাংলোতে নিয়ে এলেন, কিন্তু তাঁর কথা বলার মতো অবস্থা ছিল না। বাড়িতে কিছু কবিরাজি ওষুধ ছিল—খল-নুড়ি দিয়ে নেড়ে মধু দিয়ে তা খাইয়ে দিলেন। তাতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তিনি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। তারপরে যা বললেন তা তাঁর ভাষাতেই আমরা বলতে পারি ঃ

'তুমি বারান্দা থেকে চলে গেলে আমি উঠে গঙ্গারঘাটে নেমে গঙ্গার শোভা দেখতে গেলাম। এমন সময় মনে হল যেন একটি মেয়ে গঙ্গায় স্নান করছে। সে কে জানতে খুব কৌতূহল হল। হঠাৎ দেখলাম একটি স্বর্গীয়া নারীমূর্তি সামনে দাঁড়িয়ে। শরীরে তাঁর সন্ন্যাসীর বেশ—দয়া, কোমলতা, প্রেম, ব্রহ্মজ্ঞান—সব কিছুর আশ্চর্য মণ্ডপ। আমি ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়াতেই সেই মূর্তি শূন্যে মিলিয়ে গেল। আবার তাকে দেখলাম। এবার আর প্রেমময়ী মূর্তি নয়—বিকটাকার মূর্তি। তা দেখে আমি মূর্ছিতা হয়ে পড়ে গেলাম ঘাটের সিঁড়িতে।

সমস্ত দাসদাসীদের একটি ঘরের মধ্যে রেখেই তাঁরা বিছানায় শুয়ে গেলেন। শুয়ে গেলেন বটে, কিন্তু ঘুম এলো কই!

পরের দিন রবিবার, কাছারি বন্ধ। তাই সকালেই জয়েন্ট সাহেবের কাছে চলে গেলেন গোপালবাবু এবং তাকে সমস্ত খুলে বললেন। তিনি শুনে রহস্যময় ভাষায় তাকে এসব উপেক্ষা করতে বললেন। জোরদার পাহারার ব্যবস্থা করলেন। আর তাতেই ভৌতিক রহস্য ঘনীভূত হল সেই বাংলো বাড়িটাতে। অনেকে তাঁকে পরামর্শ দিলেন একটা যজ্ঞ অথবা শান্তি স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করতে। সেইমত তিনি কিছু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আনিয়ে পূজা-অর্চনার যাবতীয় ব্যবস্থা করলেন। ক'দিন একটু শান্তিতে কাটালেন তিনি। কিন্তু সেই শান্তি ছিল সাময়িক। এবার আর একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে লাগল। গোপালবাবুর উন্মাদপ্রায় অবস্থা।

এবারে তিনি 'ক' স্থান থেকে বদলি হয়ে 'খ' স্থানে এলেন প্রমোশন পেয়ে। তাঁর মাইনে বাড়ল, ক্ষমতাও বাড়ল। লোকজন নিয়ে তাঁর সংসারের সদস্য সংখ্যা দাঁড়াল একুশ। ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া বলদে টানা গাড়িতে মালপত্র চড়িয়ে তাঁরা নতুন বাসার উদ্দেশ্যে সদলবলে রওনা হলেন। পথের মধ্যে, তখন রাত এগারোটা হবে—কে যেন এক মহিলা কণ্ঠে চিৎকার করছেন—'মেরি জান যাতি হ্যায়'! গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে তিনি সশস্ত্র পাহারাদারদের নিয়ে যেদিকে থেকে আওয়াজটা আসছিল সেদিকে দৌড়লেন। চিৎকার করে বলতে লাগলেন—'ভয় নেই, আমরা আসছি।' হঠাৎ আবার শুনতে পেলেন সেই আর্ত চিৎকার—'মেরি জান যাতি হ্যায়'। এবার আওয়াজটা এল সম্পূর্ণ উল্টোদিক থেকে। চাঁদনি রাত, পথে কোনও বনজঙ্গল নেই। কোনও মানুষকে সেই ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মধ্যে দেখা গেল না। কিন্তু শোনা গেল আবার আর্তনাদ—'মেরি জান যাতি হ্যায়'। তন্ন তন্ন করে খুঁজে

কাউকেই পাওয়া গেল না।

একটা দিন কোনওক্রমে কাটল। পরের রাত্রে আবার সেই চিৎকার। হঠাৎ মনে হল আওয়াজটা কাছেই মহুয়ার গাছের নিচে থেকে আসছে। জঙ্গল-পুকুর সব খুঁজেও পাওয়া গেল না। কাছেই থানা ছিল, থানার দারোগাবাবুকে সব জানালেন। শুনে তিনি বললেন—'এখানে এমন ব্যাপার তো কখনও ঘটেনি, শুনিওনি।

এরপরে কর্মস্থলে পৌঁছে তিনি কাজের ভার নিলেন। একবার মাত্র এখানে দরবেশিনী ফতেমার দূতকে তিনি স্বচক্ষে দেখেন। এবারে একদিন তিনি সস্ত্রীক হরিদ্বারে গেলেন, পরে গয়াতে গিয়ে ফতেমার উদ্দেশে ভূতপিণ্ড দিলেন। কে ভূত, কাহার ভূত, বিচার না করেই দিয়েছিলাম। তারপর আর তাঁর নতুন বাংলোতে কোনওদিন ভূতের অত্যাচার হয়নি।'

৮

বারাসতে 'শিশিরকুঞ্জে প্রেতাত্মার কথোপকথন

এখনকার বাংলাদেশের যশোর জেলার পলুয়া-মাগুরার সুসন্তান শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১) বাংলাদেশের সুবাদে নয় কলকাতার বিখ্যাত দুটি ইংরেজি ও বাংলা পত্রিকার সম্পাদকের সূত্রেই অনেক মানুষের কাছে পরিচিত। প্রথম যৌবনে মানুষটির সঙ্গে ব্রাহ্ম-সমাজের বেশ যোগ ছিল। তারপর এসব ছেড়ে তিনি পৃথিবী বিখ্যাত প্রেততত্ত্ববিদ মাদাম ব্লাভাটস্কির থিভসফিক্যাল সোসাইটির ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন এবং প্রেতচর্চায় খুব উৎসাহ দেখাতে থাকেন। এ বিষয়ে লেখালেখি, সভাস্থলে বক্তব্য প্রকাশ ইত্যাদি কাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িতে থাকেন। একবার ভূত-আত্মা-প্রেত ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ জানবার জন্যে আমেরিকা যাবেন ঠিক করেছিলেন। কিন্তু প্যারিচাঁদ মিত্রদের সহযোগিতায় বাড়িতে বসেই এই কাজ করতে লেগেছিলেন। বাড়ির লোকজনদের—মা, ভাই-বোনেদের নিয়ে তিনি প্যান্‌চেটে প্রেত আহ্বান করে 'তাঁদের' সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। বাইরের কোনও লোককে তিনি নিতেন না। একটা নির্জন ঘরের মধ্যে 'চক্র' (Circle) বসাতেন। একটা গোলাকার টেবিলের চারপাশে তাঁরা বসতেন। প্রথম যখন 'চক্র' করেন প্রথম দু-তিনদিন প্রেত্মারা আসেননি। এজন্যে হতাশ হয়ে পড়ছিলেন। তিনি তাঁর নিজের ভাই হীরালাল মারা গেলে সর্বদাই তাঁর শোকে অভিভূত হয়ে থাকতেন। তাঁর আত্মার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন—এই ভরসাতেই তিনি এই প্রেতচক্রের আয়োজন করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু প্রথম দু-তিন দিনে তাঁর কোনও প্রেত যখন দেখা দিলেন না—তখন তিনি বলতে শুরু করলেন—'প্রাণের ভাই হীরালালকে ছেড়ে তিনি আর বাঁচতে চান না। ইচ্ছেমতো যদি হীরালালের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে না পারি তবে এ জীবন রেখে লাভ কিসের? এর চেয়ে আত্মহত্যা

করে জীবন শেষ করে দিই; পরলোকে যদি তার সঙ্গে দেখা হয়—তবে সেটাই করবো। আসলে মৃত্যুকে জয় করার জন্যেই তাঁর এই প্রয়াস।

এরপরে একদিন তিনি যখন ওই চক্রে বসে একমনে হীরালালকে প্রার্থনা করছিলেন, সেদিন শিশিরকুমারের এক সহোদরের শরীরে ও মনে একটা আশ্চর্য রকমের অস্বাভাবিকতা দেখা গেল। তিনি প্রথমে সেই গোল টেবিলটার উপরে ভয়ঙ্কর জোরে আঘাত করতে লাগলেন তাঁর হাত দুটো দিয়ে এবং শেষে ভয়ঙ্কর কাঁপতে থাকেন। এরপরে হাপুস নয়নে কাঁদতে শুরু করেন। এরপর যাঁরা সেই ঘরে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা দেখতে পেলেন তিনি ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে কিছু যেন ধরতে চাইছিলেন। তাই লক্ষ্য করে শিশিরকুমার তাঁর জন্যে টেবিলের ওপর একটা সাদা কাগজ ও একটা কাঠ-পেন্সিল রেখে দিলেন। তাঁর ভাইটি আঙুল দিয়ে পেন্সিলটা চেপে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু কিছুতেই সেটাকে বাগে এনে ধরে কিছুই লিখতে পারলেন না। একটু পরে আবার চেষ্টা করে যখন পেন্সিলটা কোনক্রমে ধরতে পারলেন তিনটে আঙুল দিয়ে তখন কাগজে দাগ কাটা শুর হল একটা আবিষ্টভাবে। কিন্তু কয়েকটা হিজিবিজি দাগ টেনে কাগজ নষ্ট করতে লাগলেন শুধু।

তিনি সফল হলেন না বটে, কিন্তু শিশিরকুমার যেন অন্ধকারের মধ্যে একটু হলেও আলো দেখতে পেলেন। মনে হল এই তো প্রথমবার—এর পরের চেষ্টায় ভাই সফল হবেন এবং হীরালালের প্রেতাত্মার সঙ্গে তিনি সংযোগ করতে সমর্থ হবেন।

এরপরের দিন সন্ধে হতে না হতেই ভাই-বোনেদের সঙ্গে নিয়ে সেই ঘরের নির্জনতার মধ্যে শিশিরকুমার ঢুকে পড়ে দরজাটা চেপে বন্ধ করে ছিটকিনি আটকে দিলেন। নীরবে অন্যান্য ভাইবোনেদের সঙ্গে সেই ভাইটিও টেবিলের সামনে রাখা একটা চেয়ারে গিয়ে বসলেন। টেবিলে রাখা ছিল কয়েক পৃষ্ঠা সাদা কাগজ ও একটা কাঠ-পেন্সিল। একটু বাদেই একটা অলৌকিক কিছুর আবির্ভাব সবাই অনুভব করতে লাগলেন। তারপরেই শিশিরকুমার বুঝতে পারলেন তাঁর সেই সহোদরের শরীরের আত্মা ভর করেছে। তাঁর হাতে সেই পেন্সিল তুলে দিলেন তিনি খুব সন্তর্পণে। একটা কিছু লেখার আওয়াজ শোনা গেল খস্ খস্ করে। শিশিরকুমার ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। সেই আবছা অন্ধকারে তিনি দেখতে পেলেন কাগজের উপর লেখা রয়েছে একটা নাম—হীরালাল ঘোষ। শিশিরকুমার স্থির নিশ্চয় হলেন —হীরালালের আত্মাই এই ঘরে আবির্ভূত হয়েছে। সেদিন এইটুকুই। সেই কাগজটি নিয়ে তিনি ঘরে উপস্থিত ভাইবোনেদের দেখাতে লাগলেন। সবার চোখেই তখন বিরহ-আনন্দের মিশালে একটা নয়নধারা বইতে লাগল। ছুটে গিয়ে তিনি মা'কে সেই কাগজখানা দেখালেন। মা কাগজখানা কখনো বুকে জড়িয়ে ধরে, কখনও ঠোঁটের কাছে এনে অজস্র চুম্বন করতে লাগলেন। আর কান্নাভেজা আটকে-পড়া

গলায় বারবার বলতে লাগলেন—বাপ্ হীরে এসেছিস? বাপ্, তুই ভাল আছিস্ তো!

তার পরের দিন আবার সন্ধে ঘনিয়ে আসতেই সবাই মিলে সেই ঘরে চক্রে বসলেন। এদিনের চক্রে টেবিলে রাখা সবগুলো কাগজেই একের পর এক লেখা উঠতে লাগল পেন্সিলের আঁচড়ে। যা লেখা হল তার ভাষাটা অনেকটা এই রকম—

'আমি এখন যেখানে রয়েছি, তা তোমাদের জড়জগৎ থেকে হাজার গুণে সুন্দর। এখানে আসলেও ভগবান কিম্বা তাঁর অনগৃহীত কোনও আত্মার সঙ্গে আমার এখনও দেখা হয় নাই। এখানে নাস্তিক আত্মার অভাব নেই। কোনও মানুষের শরীর আশ্রয় না করলে আমি স্থূল জগৎকে দেখতে পাই না।'

কিছুদিনের মধ্যে শিশিরকুমারের বারাসতের বাড়ির প্রেতচক্র বেশ জমে উঠল। এখানে মিডিয়ামের সাহায্যে তাঁদের পরিবারের চেনা-জানা মৃত আত্মীয় ও স্বজনদের আত্মাদের নিয়মিত আবির্ভাব ঘটতে লাগল। এইসব আত্মারা মিডিয়ামদের মাধ্যমে নানান কথা জানাতে লাগল। কেউ জানাল—'জীব আপন আপন কর্মের ফলভোগ করে থাকে। শরীরে কোনো রোগ বাসা বাঁধলে যেমন কষ্টের সীমা থাকে না, সেইরকম পৃথিবীতে থাকার সময় পাপ কাজ করলে আত্মারও কষ্ট আর অশান্তির সীমা-পরিসীমা থাকে না। যাকে নরকযন্ত্রণা বলে—তা কোনও কবির কল্পনা নয়। পৃথিবীতে মানুষ ভগবানের নির্দিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন করে নোংরা জীবন যাপন করলে পরজগতে যে তার আত্মাকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আবার যারা পাপ কাজ করে এতটুকুও অনুতাপ না করে বরং অহঙ্কার করে আর ভগবানের নিন্দে করে থাকে—তাদের অবস্থা যে কতটা শোচনীয় হয়ে থাকে—তা বর্ণনা করাও অসম্ভব।'

এই সূত্রে আমাদের মনে পড়ে যাচ্ছে শিশিরকুমারের শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের একটি বিশ্বাসযোগ্য অভিজ্ঞতার কথা। দীনবন্ধুবাবুর গ্রামের একটি বয়স্ক ব্রাহ্মণ তাঁর প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পরে আবার বিয়ে করেছিলেন। সেই ব্রাহ্মণের প্রথম পক্ষের একটি বিধবা মেয়ে ছিলেন, তিনি তাঁর সৎমার চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। একদিন সেই বিধবা মেয়েটি তাঁর সৎমার চুল বাঁধতে বাঁধতে হঠাৎ 'সতীন খাবো, সতীন খাবো' বলে চিৎকার করতে করতে তাঁর সেই সৎমার দুটো গালে ঠাস ঠাস করে চড় মারতে লাগলেন আর তারপরেই খুব জোরে গালে কামড়ে দিলেন। কামড়ের জ্বালায় বিমাতা একেবারে অস্থির হয়ে পড়লেন।

তাই দেখে ব্রাহ্মণ স্ত্রীকে বাঁচানোর জন্যে আর সান্ত্বনা দেবার জন্যে ছুটে এলেন —দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী স্ত্রী বলে কথা! মেয়ে তখন সৎমাকে ছেড়ে বাবাকেই তীব্র আর অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিতে আরম্ভ করলেন আবার বিয়ে করার জন্যে। তাই দেখে লোকেরা বলাবলি করেছিলেন—ব্রাহ্মণের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর আত্মাই তাঁর

বিধবা কন্যার শরীরে আবির্ভূত হয়ে এই সব কাণ্ড করিয়েছিলেন।

শিশিরকুমারের বাড়িতে যাঁরা প্রেতের মিডিয়াম হতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে হেমন্তবাবু, মতিবাবু ছাড়া তাঁর তৃতীয় পুত্র পীযূষকান্তি এবং ছোট মেয়ে সুহাসনয়নাও ভাল মিডিয়াম ছিলেন। শিশিরকুমার তাঁর বারাসতের বাড়িতে যখন 'চক্র' বসাতেন তখন সব মিডিয়ামের মধ্যে তাঁর ছোট মেয়েটিই সবার আগে আবিষ্ট হয়ে পড়তেন। শিশিরকুমার মিডিয়ামদের মাধ্যমে যে সব প্রশ্ন করতেন এবং তার যে সব উত্তর পেতেন সেগুলির প্রায় সবই লিখে রাখতেন। এর মধ্যে থেকে চারটে প্রেতাত্মার কথোপকথন আমরা হুবহু তুলে দিচ্ছি। এগুলি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন শিশিরকুমারের জীবনী লেখক অনাথনাথ বসু এবং তাঁর 'মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ' বইটিতে উল্লেখ করে গেছেন। সেকালের কথোপকথনের ঠিকঠাক ঢঙ আর লেখার পদ্ধতিটি সরাসরি তুলে দিলাম একালের পাঠকের জন্যে—এতে তাঁরা সেই যুগে বারাসতের একটা বাড়িতে ভূতেদের কথাবার্তায় একটা সেকেলে পরিবেশের সন্ধান পাবেন।

এই চক্রে শিশিরকুমারের পিতার প্রেতাত্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

প্রশ্ন ঃ তুমি কে?

প্রথমে কোনও উত্তর নাই। পরে মিডিয়ম কথা কহিবার চেষ্টা করিলেন। শেষে অতি গম্ভীর স্বরে উত্তর—আমি তোমার বাবা। আমি তোমায় সাবধান করিতে আসিয়াছি, কারণ তোমায় শীঘ্র আসিতে হইবে। অতএব ধর্ম্মে মতি দাও।

প্রশ্ন ঃ ধর্ম্মে মতি কিরূপে দিব?

উত্তর ঃ সংসার ছাড়।

প্রশ্ন ঃ আমি কি বৃন্দাবন যাইব?

উত্তর ঃ তা নয়, গৌরাঙ্গের চরণে আত্মসমর্পণ করে দিবানিশি পাদপদ্মে সেবা কর।

প্রশ্ন ঃ বাবা, আমি ভাবিতাম মরিয়া তোমার চরণ ধরিয়া তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করিব, কারণ তোমাকে কত তাচ্ছিল্য করিয়াছি।

উত্তর ঃ আমার ক্ষমা না চাহিয়া তাঁহাকে (ভগবানকে) ডাকো। তোমার মা দশ বৎসর কি কঠোর সাধনা ভজনা করেছেন তা কি তুমি জানো না? তুমি সেখানে এখানে উভয় স্থানে ধন্য হও। আমি চাই। এই মিডিয়ম আমাকে সহ্য করিতে পারিতেছে না। তুমি কাঁদিতেছ কেন? কাঁদিয়া আমাকে দুঃখ দিতেছ, ইহা স্বার্থপরতা। কাঁদিবার কারণ কি? সব পাবে, সুখময়।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি দাদাদের সঙ্গে আছেন?

উত্তর ঃ আমি আর তোমার মা একত্রে আছি। একত্রে আর ভিন্ন কি, বলিতে গেলে সকলে একত্রে আছি। আমি যাই, আর থাকিতে পারিতেছি না।

★ ★ ★

এই চক্রে শিশিরকুমারের দ্বিতীয় পত্নী কুমুদিনীর প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয়।

প্রশ্ন ঃ আমি কবে মরিব?

উত্তর ঃ আমি সে সব জানি না। ভগবান ইহা জানিতে দেন না। তিনি (বাবা) যে শীঘ্র বলিয়াছেন, তাহার মানে দু'বৎসর হইতে পারে, চারি বৎসর হইতে পারে। তিনি যখন এলেন, তখন চারিপাশে আমরা দাঁড়াইয়াছিলাম।

প্রশ্ন ঃ এসো আমোদ করি। তুমি আর তোমার দিদির ইহার মধ্যে ভাল কে?

উত্তর ঃ দিদি ভাল।

প্রশ্ন ঃ তা তো তুমি বলবেই। তোমার দিদি কবে সাধন ভজন করল? তুমি কত সাধন ভজন করিয়াছ।

উত্তর ঃ দিদি আজ ৪০ বৎসর সাধন ভজন করিতেছেন। তুমি ভাব যে তিনি এতদিন চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন? আর আমি যে সাধন ভজন করি সে প্রথমে, আমি তাহার পর পাষাণ হইয়াছিলাম। (ক্রন্দন)

প্রশ্ন ঃ কাঁদিতেছ কেন?

উত্তর ঃ একটা কথা মনে করিয়া কান্না আসিল। তোমাকে বলিয়া দুঃখ দিব না।

প্রশ্ন ঃ এতদূর বলিলে ত, তবে বল।

উত্তর ঃ যেদিন আমি আসি, সেদিন বিকাল বেলা প্রাণ ছটফট করিতেছিল। ইচ্ছা ছিল, তোমাকে বুকে করিয়া হৃদয় জুড়াইয়া যাই।

প্রশ্ন ঃ (কষ্ট প্রকাশ করিলাম)।

উত্তর ঃ তোমাকে বলিয়া অন্যায় করিলাম।

প্রশ্ন ঃ ও সব কথা যাক্। এস আমোদ আহ্লাদ করি। এস হাসি। তুমি আর তোমার দিদি, ইহার মধ্যে কে বেশি রূপবতী?

উত্তর ঃ (হাস্য) তুমি বল দেখি, কাহাকে তুমি বেশি ভালবাস? (হাস্য) কাল দিদির অনেক কথা বলিবার বাকি ছিল। বলিতে পারে নাই বলিয়া দুঃখিত হইয়াছে। আমি অনেক বলিলাম যে তুমি যাও, তবু আমাকে জোর করিয়া পাঠাইয়াছিল। ছিদাম[১] তো পাগল হইয়াছে। সে রোজ আসিতে চায়।

প্রশ্ন ঃ আসিতে দাও না কেন?

উত্তর ঃ তাহার আসিতে আমাদের সম্পূর্ণ সাহায্য প্রয়োজন। ফুলিকে[২] আমি যত সহজে ইনফ্লুয়েন্স করিতে পারি, দিদি তাহা পারেন না, কারণ সে আমার মেয়ে। আমি ওখানে ভাবিতাম যে, তুমি আমার স্বামী অতএব আমার সামগ্রী; তাহাতেই তোমাকে তাচ্ছিল্য করিয়াছি। মনে আসিলেও মুখে করিতাম না। ভাবিতাম জোর আমার। হরিমোহনকে[৩] দেখিও। তাহার বড় অবনতি হইয়াছে। তুমি না পার,

---

(১) ছিদাম—শিশিরকুমারের একটি পুত্র; অতি শৈশবেই মৃত্যু হয়।

(২) ফুলি (মিডিয়ম)—শিশিরকুমারের কনিষ্ঠা কন্যা সুহাসনয়নার ডাক নাম।

(৩) হরিমোহন—শিশিরকুমারের শ্যালক।

তোমার দুই ছেলেকে বলিও।

প্রশ্ন ঃ তাহারা আমার কথা শুনে না।

উত্তর ঃ শেষকালে আমি বড় কষ্ট পাইয়াছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতাম যে, ভগবান ছয় মাস আমাকে স্বাস্থ্য দেও, আমি একবার স্বামী সেবা করিব।

(এইখানে আরও অনেক কথা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা লেখা হয় নাই)

★ ★ ★

প্রশ্ন ঃ আবার কান্না কাটনা আরম্ভ করিলে?

উত্তর ঃ না। আমি না লিখিয়া কেন কথা কহিতেছি, জান? তুমি কৃপণ লোক। তোমার কাগজ খরচ হইবে না।

প্রশ্ন ঃ কাল ভুবন [৪] আসিয়া যাহা লিখিল, তাহাতে বুঝিলাম যে, সে এখন আর বোকা নাই।

উত্তর ঃ চিরকালই বোকা থাকিবেন? যে প্রাণ হইতে কথা বলে, তাহার কথায় বোকামি থাকিবে কেন? আমি যাই। আমাদের অধিকক্ষণ থাকিবার নিয়ম নহে।

প্রশ্ন ঃ তোমার কি অধিকক্ষণ থাকিতে কষ্ট হয়?

উত্তর ঃ ঠিক তা নয়। ভগবান কৃপা করিয়া এরূপ কথা কহিতে সুবিধা দিয়াছেন; আমাদের উচিত নহে যে বহুক্ষণ এইরূপ করি?

মিডিয়মের চৈতন্য হইবার অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার শরীরে এক দুশ্চরিত্রা কুলি রমণীর প্রেতাত্মার আবির্ভাব লক্ষিত হইল। মিডিয়ম লাফাইয়া উঠিয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা কহিতে লাগিল। শিশিরকুমার তাঁহার কন্যার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিলে, মিডিয়ম তাঁহাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করিয়াছিল। অনেক চেষ্টার পর মিডিয়মের চৈতন্য হইয়াছিল।

★ ★ ★

এই চক্রেও শিশিরকুমারের দ্বিতীয়া পত্নী কুমুদিনীর প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয়।

প্রশ্ন ঃ অত ভয় কর কেন? আমরা থাকিতে ভয়?

উত্তর ঃ আমি পূর্বেই বলিয়াছি, একটা পতিতা স্ত্রীলোক কয়েকদিন আসিবার চেষ্টা করিতেছিল। আমরা আসিতে দিই নাই। সেদিন হঠাৎ প্রবেশ করিয়া ফেলিল, আমরা তখনই তাহাকে তাড়াইতাম, কিন্তু একটু সময় লাগে।

প্রশ্ন ঃ তাহাকে ভাল উপদেশ দাও না কেন?

উত্তর ঃ ক'দিন দিয়াছি, তা সে কানে করে না। শুন, তোমাদের মধ্যে ঝগড়া, দ্বেষ, হিংসা আছে। যেসব লোক কুইচ্ছা পৃথিবী হইতে লইয়া আসে, তাহা সহজে অতিক্রম করিতে পারে না। কাজেই যে মন্দ কাজ করে, সে মন্দ লোক অনেকদিন

---

(৪) ভুবন—শিশিরকুমারের প্রথমা স্ত্রী ভুবনমোহিনী।

থাকে। তাহার মন্দ অভ্যাস সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে। আমি এক কথা তোমাদের বলিয়া রাখি একথা তুমি সকলকে বলিও। ওখানে যাহা এক বৎসরে হয়, এখানে তাহা কুড়ি বৎসর লাগিবে।

প্রশ্ন ঃ তোমার দিদিকে আসিতে দিলে না কেন?

উত্তর ঃ তিনি কাছে দাঁড়াইয়া।

প্রশ্ন ঃ তোমার দিদির সহিত ঝগড়া বাঁধাইয়া দিব দেখিবে?

উত্তর ঃ কখনও নয়। অসম্ভব। তিনি যে কত ভাল তাহা তুমি অনুভব করিতে পার না। তিনি ৪০ বৎসর তোমার পথ চাহিয়া আছেন।

প্রশ্ন ঃ তোমরা মেয়ে মানুষ হইয়া পেত্নীকে তাড়াইলে কি করিয়া?

উত্তর ঃ এখানে মেয়ে মানুষ পুরুষ বিভিন্ন নাই। যে যত ভাল, তাহার তত শক্তি। আমি পরম ভাগ্যবতী তোমাকে পাইয়াছিলাম।

প্রশ্ন ঃ আমাকে না পাও, কেদার হালদারকে পাইতে।

উত্তর ঃ (হাস্য) কেদার হালদার নয়, নামটা ভুলিয়া গিয়াছি।

প্রশ্ন ঃ ওখানকার সমুদয় কথা বল।

উত্তর ঃ তুমি প্রশ্ন কর, আমি বলিতেছি।

প্রশ্ন ঃ তোমরা কিরূপে দিন কাটাও?

উত্তর ঃ হাসি, কাঁদি, গল্প করি, বেড়াই, ঘুমোই।

প্রশ্ন ঃ তোমরা কি ঘুমাও?

উত্তর ঃ ঠিক ঘুম নয়, একরূপ বিশ্রাম করি।

প্রশ্ন ঃ দাদাদের সঙ্গে কি দেখা হয়?

উত্তর ঃ সর্বদা দেখা হয়, কিন্তু দিদির সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা একত্রে থাকি।

প্রশ্ন ঃ আমার মনে হয়, তাহার নাম চণ্ডী হালদার।

উত্তর ঃ (উচ্চহাস্য) ঠিক।

প্রশ্ন ঃ তুমি কি এখন ফুলিকে খুব কায়দা করিয়াছ?

উত্তর ঃ সম্পূর্ণরূপে।

প্রশ্ন ঃ সে পেত্নীটা এসেছিল কেন?

উত্তর ঃ বাঁদরামি করিতে।

প্রশ্ন ঃ তুমি কি ফুলিকে ঠিক কায়দা করিয়াছ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ করিয়াছি।

প্রশ্ন ঃ আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তাহা উত্তর করিতে পারিবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ পারিব।

প্রশ্ন ঃ যা ফুলি না জানে।

উত্তর ঃ হ্যাঁ পারিব।

প্রশ্ন ঃ তুমি এমন কথা বল, যাহা ফুলি না জানে।

উত্তর ঃ দেখ, বোটে যাওয়ার কথা, হাঁসখালিতে থাকার কথা, ইহা তোমার ইচ্ছা হয়, জিজ্ঞাসা কর।

প্রশ্ন ঃ বোটে তোমরা কে কে গিয়েছিলে?

উত্তর ঃ তুমি, আমি, পীযূষ, পাঁড়ে, রাখালের মা। এই দেখ পাঁড়ে ও রাখালের মায়ের কথা ফুলি কিছুই জানে না।

(প্রকৃত কথা পাঁড়ে, চণ্ডী হালদার ও রাখালের মায়ের কথা মিডিয়ম কিছুই জানিতেন না। শিশিরকুমারের সহিত বিবাহের পূর্বে চণ্ডী হালদারের সহিত কুমুদিনীর বিবাহের কথা হইয়াছিল, সেইজন্য শিশিরকুমার রহস্য করিয়া চণ্ডী হালদারের নাম করিয়াছিলেন।)

শিশিরকুমার প্রেতাত্মাবাদ্ আলোচনা করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। এদেশে প্রেততত্ত্ব প্রচারে তিনি সচেষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পতিত হইয়া প্রথমে তিনি ও তাঁহার সহোদরগণ প্রচার কার্যে আপন আপন শক্তি সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করিবার অবসর পান নাই। তবে তাঁহারা যে একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন, তাহাও নহে।

(প্রতিবেদন ঃ অনাথনাথ বসু)

৯

দেওঘরের এক বাড়িতে দিনের বেলায় ভূত দেখা গেল

যশোরের পলুয়ামাগুরা গ্রামে জন্ম হলে কী হবে, শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১) বিখ্যাত হয়ে আছেন কলকাতা থেকে প্রকাশিত দুটি বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার কারণে—অমৃতবাজার পত্রিকার এবং যুগান্তর দৈনিক দুটির তিনি নামজাদা সম্পাদক ছিলেন। তখন তাঁর বয়স প্রায় ষাট ছুঁই ছুঁই—১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ। দেওঘরে তাঁদের নিজের বাড়ি ছিল, সেখানেই গিয়ে বাস করছিলেন। পাশেই গনেরি মাহাতো নামে এক গোয়ালা বাস করতেন। তাঁর বাড়িটার চারপাশেই খোলা ময়দান।

এ-কথা ও-কথা হতে হতে একদিন কে একজন বলে বসলেন—গনেরির বাড়িতে ভূতের খুব উপদ্রব দেখা দিয়েছে। শুনে একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করে বসলেন শিশিরবাবু। তাঁকে ভূতের কথা জিগ্যেস করতেই গনেরি বললেন—ভূত নয়, একটা পিশাচ। গনেরি শিশির- বাবুদের দেওঘরের বাড়িতে রোজ দুধ দেবে এই কড়ারে তাঁর চাকর শিবে গিয়ে দুধ নিয়ে আসত প্রতিদিন। কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না এই ব্যবস্থায়। কিন্তু একদিন ঘোরতর ঘটনা ঘটে গেল। শিবে দুধ আনতে গিয়েছিল। ফিরতে দেরি হচ্ছিল দেখে বাড়ির সবাই চিন্তা করছেন। এমন সময় শিবের ক'জন বন্ধু তাঁকে অজ্ঞান অবস্থায় ধরাধরি করে বাড়িতে রেখে গেল। তার

জ্ঞান ফিরতে শিশিরবাবু জিগ্যেস করলেন—কী হয়েছিল রে শিবে?

শিবে বললে—গনেরির বাড়িতে ভূতের উপদ্রব হয়েছে শুনতে পেয়ে সে সন্ধ্যা হবার আগেই দুধ আনতে তাঁর বাড়িতে গেছিল। সবে সন্ধ্যা হয়েছে, দুধ নিয়ে গনেরির বাড়ি থেকে বের হবার একটু বাদেই একটা কাল রঙের কিম্ভূতকিমাকার কিছু একটা তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তার বুকে এমন জোরে ধাক্কা মারে যে সে ভয়ে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়, হাতের দুধ গড়িয়ে মাটিতে পড়ে একাকার!

এদিকে গনেরি পিশাচের হাত থেকে রক্ষে পাবার জন্যে তার কয়েকজন গাট্টাগোট্টা খোট্টা গোয়ালাকে নিজের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করেছিল। সাঁঝ লাগার আগেই তারা গনেরির বাড়িতে হাজির হয়ে পড়ে। তারাই শিবের আর্ত চিৎকার শুনে বেরিয়ে এসে ধরাধরি করে নিয়ে এসে শিশিরবাবুদের বাড়িতে পৌঁছে দেয়।

এসব ব্যাপার ভাল নয়। সরেজমিনে কী ঘটেছিল জানবার জন্যে দু'জন বন্ধুকে নিয়ে শিশিরবাবু গনেরির বাড়িতে হাজির হলেন। যে সময় তাঁরা যান, সে সময়ে গনেরির বুড়িমা, তার স্ত্রী—কেউই বাড়িতে ছিল না। শুধু গনেরির এগারো বছরের মেয়েটি উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিল।

মেয়েটি একা ঝাঁট দিচ্ছে দেখে, তাঁরা আর বাড়ির ভিতরে না গিয়ে বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর বন্ধু দু'টি একটু তফাতে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কী যেন সব বলাবলি করছিলেন। তাই দেখে একটু মজা করে ভূতকে উদ্দেশ্য করে শিশিরবাবু বলতে লাগলেন—'ওহে ভূতমশায়, শুনছো? তুমি যদি এখানে থাকো তবে একবার দয়া করে আমাদের দেখা দাও।'

কথা শেষ হয়েছে কি-না হয়েছে গনেরির বাড়ির চালের ওপর থেকে একটা ভারি মাটির তাল গড়িয়ে এসে তাঁর পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়ল। শিশিরবাবুর একটু ভয় হল, তবে মজাটাই লাগল বেশি। তিনি অমনি বন্ধুদের ডেকে বললেন—'দেখছো তো ভাই, ভূতমশায় কেমন করে আমার অনুরোধে সাড়া দিয়েছে!'

বন্ধুরা একটা ধপাস্ শব্দ শুনেছিলেন বটে, তবে মাটির তালটা কেমন করে গড়িয়ে পড়েছিল চাল থেকে তা খেয়াল করেননি। তাঁরা এগিয়ে এসে মাটির চাঙরটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালেন। এবার শিশিরকুমার আবারও রসিকতা করে ভূতের উদ্দেশে বলেলেন—"দেখো বাবা ভূত, আমি একা নই, এখন তিনজনেই আমরা তোমার অতিথি। আমাদের তিনজনের সঙ্গেই তোমার একই রকমের ব্যবহার করা উচিত। তাই নয় কি? তুমি আমাকে সম্মান করেছো, এদেরও সম্মান দেখাও। দয়া করে তুমি তাদের কাছেও প্রকাশ পাও।'

এই কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা মাটির চাঙড় চাল বেয়ে গড়িয়ে

এল। তিনজনেই একসঙ্গে সেটা নিজের নিজের চোখে দেখতে পেলেন। এবং তিনজনেই একেবারে অবাক হয়ে থ' বনে দাঁড়িয়ে রইলেন। একবার মনে হল এটা কি ঝাঁট দিচ্ছে ওই মেয়েটার কাজ? কিন্তু তা কী করে হবে। এখান থেকেই তো তাঁরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন—মেয়েটা একমনে ঝাঁট দিয়ে চলেছে।

তখন শিশিরবাবু সাহসভরে আবার বললেন—'ভূতমশায়, দয়া করে তুমি আমাদের মনের সব সন্দেহ দূর করে দাও।' সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে একটি এবং পরে প্রায় একই সঙ্গে দুটো চাঙড় গড়িয়ে মাটিতে এসে পড়ল। তখন বেলা ৯টা। পরিষ্কার সূর্যালোকে মাঠের মাঝখানে এই বাড়িতে এই ভৌতিক কাণ্ড নিজেদের চোখে দেখলাম!

এবং এরপরে পরেই রসিক পিশাচমশায় মাটির সঙ্গে পাথরের চাঙড় নিয়ে খেলা শুরু করে দিল। পাথরের চাঙড়গুলো শূন্যে উঠে পড়ছে, আবার মাটিতে পড়ে যাচ্ছে, কে যেন লোফালুফি করছে। আর মেয়েটি যেখানে ঝাঁট দিচ্ছিল সেখানেও ইট, পাথর, মাটি, কাঁকরের যেন বৃষ্টি হতে লাগল।

দেখতে দেখতে গোটা পাড়ায় কথাটা চাউর হয়ে যেতেই দলে দলে লোক সেখানে জড়ো হয়ে গেল। জটলাতে ভূত নিয়ে নানান কথা শোনা যেতে লাগল। একটু বাদেই গনেরি তার বুড়িমা, স্ত্রীকে নিয়ে ফিরে এসে সব কাণ্ড দেখে থ'। তার বাড়ির পাতকুয়োতে তখন জলের উথালপাথাল—ছলাৎ ছলাৎ শব্দে কুয়োর মধ্যে ভীষণ আওয়াজ। হঠাৎ সবাইকে অবাক করে কুয়োর জলের মাঝ থেকে প্রায় একমণ ওজনের একটা ভারি পাথর উঠে এসে উঠোনের মাঝখানে দুম্ করে এসে পড়ল। ভাগ্যিস্ সেখানে কেউ দাঁড়িয়ে ছিল না।

এইসব কাণ্ড দেখে কেউ ভিরমি খেলো, অনেকেই রাম নাম জপতে জপতে পালিয়ে বাঁচল। হঠাৎ শিশিরবাবুর মনে হল—মেয়েটি যেখানে ঝাঁট দিচ্ছিল, সেখানেই ইট-পাথর বেশি পড়ছিল। তবে কি ওই মেয়েটাই ভূতের মিডিয়াম! সেটা পরীক্ষা করার জন্যে বন্ধুদের নিয়ে তিনি বাড়ির পূর্বদিকের মাঠে গেলেন। সেখানে একটা সরষের ক্ষেত ছিল। তার পাশেই বড় বড় মাটির চাঙড় দেখতে পেলেন। এখান থেকেই কি তবে ভূতেরা মাটি সংগ্রহ করছিল। কী ঘটবে এবার দেখবার জন্যে দুটি স্ত্রীলোককে শিশিরবাবু সেই মাঠে বসিয়ে রাখলেন। যেই বসা, অমনি সেখানের মাটির ঢেলাগুলো যেন নাচ শুরু করে দিল। এক একটা চাঙড় লাফিয়ে পাঁচ ফুট পর্যন্ত উঠে পড়ছে আবার মাটিতে ধপ্ করে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু গনেরির বাড়িতে ততক্ষণে মাটি পড়া বন্ধ হয়ে গেছে।

এবারে শিশিরবাবু গনেরির মা, স্ত্রীকে নিয়ে একটি ঘরের মধ্যে মুখোমুখি বসলেন। ঘরেও তখন প্রচুর আলো। ঘরের ছাদের সিকা থেকে কে যেন কিছু বের করতে চাইছে—এমনটা তাঁর মনে হল। ঠোঙাতে ভাত ছিল, সেই ঠোঙাটা বের করে এনে কে যেন শিশিরবাবুর মাথার উপর ঢেলে দিলে। এবার শিশিরবাবু বেশ

একটু ভয় পেলেন, গোটা শরীর শিরশির করে উঠল। আবার অন্য একটি শিকাতে নুন ছিল, সেখান থেকে ভূতমশায় এক বাটি নুন তাঁর মাথায় ঢেলে দিলে। ভূতে যে এতখানি রগড় করে তা তাঁদের জানা ছিল না।

সেই ঘরের কোণে রাখা একটা লম্বা বাঁশের লাঠি ছিল। হঠাৎ সেটা নড়তে লাগল। তারপরে বেড়ালের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে শিশিরবাবুর দিকে হাসতে লাগল। কাছে এসে হঠাৎ মাটির উপরে জোরে আঘাত করল, তাঁর মাথাটা কোনক্রমে বেঁচে গেল। মনে হল পিশাচ তাঁকে ভয় দেখিয়ে চলে যেতে বলছে। তাঁরা সদৃশ্য পিশাচের দিকে অদৃশ্য নমস্কার ছুঁড়ে বাড়ি চলে আসলেন। দেওঘরের সেই ভূতের বাড়িটার কেউ সন্ধান দিতে পারেন?

১০

ধূর্জটিপ্রসাদ ভূত দেখলেন মামার বাড়িতে

ভাটপাড়া চব্বিশ পরগণার সন্তান ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১)-কে কোন্ পরিচয়ে পাঠকের সামনে হাজির করবো ধন্দে আছি। তিনি যত বড় সঙ্গীতজ্ঞ, তত বড়ই সাহিত্যিক, যত বড় অধ্যাপক, তার চেয়েও বড় তাঁর মননশীলতা। এমন একজন মানুষ ভূতের গল্পও লেখক। ভূতের গল্প যাঁরা লেখেন তাঁরা ভূত সম্পর্কে সত্যি কথা বলেন কিনা, পাঠকমহলে তাই নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে শুনেছি। কিন্তু তিনি, যে কাহিনীটি বলতে চাইছি, সেটি 'নিছক সত্য' বলে আমাদের বিশ্বাস করতে বলেছেন।

তখন তাঁর বয়স বিশ সবে পার হয়েছে, যাকে বলে টগবগে তরুণ। সেটা ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কথা। থাকেন মামার বাড়ি হালিসহরে। একসময়ে মামার বাড়ির খুব বাড়বাড়ন্ত ছিল, তবে তিনি যখন থাকতে শুরু করেন, তখন অবস্থা বেশ পড়ন্ত। অনেকেই মারা গেছেন। আছেন কেবল তাঁর দিদিমা এবং তাঁর শিবরাত্রির সল্‌তে একমাত্র পৌত্র। ধূর্জটিপ্রসাদের মামাতো দাদাটি দেখতে সুন্দর, রোগা-রোগা চেহারা। চোখে পুরু লেন্সের চশমা আর গানে যাকে বলে ওস্তাদ— তা-ই। এই দাদাকে সবাই সাধু বলতেন।

তাঁর বাড়িতে হামেশাই আড্ডা বসতো। বিশাল বিশাল ঘর, সারি সারি বিছানা পাতা। আড্ডাবাজেরা প্রায় বিনা লাইসেন্সেই এখানে আড্ডা দিয়ে যেতেন। চা, চুরুট, সিগারেটের সঙ্গে বই পড়াও চলত। বড় বড় আলমারি ভর্তি হাজার কিসিমের বই।

ভাদ্রমাসে কলকাতা শহরে তাল-পাকা আর পচা গরম। ধূর্জটিপ্রসাদ কলকাতার বাড়ি ছেড়ে গঙ্গাতীরবর্তী হালিসহরে এসে হাজির হলেন শিয়ালদহে দুপুর তিনটের ট্রেন ধরে। সেদিন শনিবার, অফিস সেরে অনেকেই বাড়ি ফিরছেন। গাড়ি ছাড়ার

পর একসময় ঘ্যাঁচ করে কাঁকিনাড়ায় ট্রেন থামল। এক ভদ্রলোক, ছোটখাটো চেহারার, গোঁফের চুল নিতান্ত পাতলা, ওঁদের কামরায় উঠলেন। দেখেই চিনতে পারলেন ধূর্জটিপ্রসাদের ছেলেবেলায় স্কুলের ড্রইং মাস্টারমশায়, তাঁরই হাতে তাঁর হাতেখড়ি হয়েছেন। লোকটি ভারি রসিক, ধূর্জটিকে ডাকতেন 'গুজরুটি এলাচ' বলে।

তাঁর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন—স্যার আমাকে চিনতে পারছেন না?

—কই চিনতে পারছি না তো?

—আমি ধূর্জটি, আপনি আমাকে গুজরুটি বলে ডাকতেন।

—ওহো, তাই তো, কত বড় হয়ে গেছো, কত ছেলেই তো হাত দিয়ে গেলে, বয়েস হয়েছে—আর মনে থাকে না।

ছাত্রের বাড়ির খবর সব নেওয়ার পরে জিগ্যেস করলেন—'আর ছবি-টবি আঁকো?

—আজ্ঞে না, এখন ছবি দেখি।

—ও জিনিস বাবা কেবল দেখে হয় না, একটু অভ্যাসও রেখো।

—আপনি এখন?

—হুগলি নর্মাল স্কুলে।

—তাই নাকি? তাহলে আমার জ্যাঠামশাইকে নিশ্চয়ই চেনেন।

—কে?

জ্যাঠামশাইয়ের নাম বলাতে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন—'আহা এমন লোক আর হয় না, যেমন পণ্ডিত তেমনি নিরহঙ্কার, যেমনি কড়া, তেমনি নরম।'

মনটা তার খুশিতে টইটম্বুর হয়ে গেল।

—তুমি কোথায় যাচ্ছ বাবা!

—এই হালিসহরে, আমার দাদাকে দেখতে।

—হালিসহরে? —সে তো আমাদেরই ওপারে। একটু কোণে। হালিসহর থেকে ছেলেরা রোজ নৌকো করে হুগলি কলেজে পড়তে যায়।

—আচ্ছা, মাস্টারমশায়, আপনার জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে দেখা হবে?

—হবে, সে তো পাশের বাড়ি।

—তাহলে ভালই হয়, জ্যাঠামশায়কে বলবেন—আজই, না হয় কালই, ভোরবেলা নৌকো করে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবো। যাবোই যাবো। আমি তাঁকে দেখতেই বেরিয়েছি, হালিসহরটা ঘুরে যাবো।

—ভদ্রলোক নৈহাটিতে নেমে গেলেন, ধূর্জটি এবারে সিগারেট ধরালেন।

কেন যে মরতে জ্যাঠামশাইয়ের খবর দিয়ে তাঁর কাছে যাবো কথা বলে বসলেন কে জানে! ধূর্জটির জ্যাঠামশায় খুব রাশভারি আর গম্ভীর প্রকৃতির লোক। তাঁর সঙ্গে

দেখা করার কোনও ইচ্ছেই তাঁর ছিল না। হালিসহর স্টেশন এলো। তাঁর কাছে যাবে বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেকথা বেমালুম ভুলে গেলেন। পথে ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের একজনের কাছে খুব একটা মন্দ খবর শুনলেন। তাঁর ও তাঁর ওই মামাতো দাদার এক বিশেষ বন্ধুর বৌদির খুব অসুখ, মরণ-বাঁচন সমস্যা। কলকাতা থেকে ডাক্তার আনতে গেছেন—মোটরে করে তাঁকে নিয়ে আসবেন। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত দাদার কাছে পৌঁছলেন। তাঁর বুড়ি দিদিমা, যাঁকে তিনি রাঙামা বলে ডাকতেন—তিনি গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'মা-বাবাকে বলে এসেছিস্ তো ভাই?'

—বৌদির নাকি বড় অসুখ?

—শুনেছি বটে, কলকাতা থেকে ডাক্তার আনতে গেছে—তা, তুই রাতে কী খাবি?

হাত পা ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে ওপরে গেলাম, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ৪/৫ খানা ঘর। দক্ষিণ দিকে ঘরগুলো বন্ধই থাকতো, থাকবার মানুষ কোথায়? বড় পূবমুখো ঘরে দাদা থাকতো। শনি-রবিবারে বন্ধুরা এলে অন্য ঘর খোলা হতো। সন্ধ্যা হলেই বড় আকারের হিঙ্কসের আলো জ্বেলে রাখা হতো। অত বড় বাড়ি, রাতবিরেতে একা একা বের হতেই ভয় হত। সেদিনে ক্লান্ত হয়েছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ। রাত দুপুর, দাদা মেঝেতে পাটি পেতে শুয়ে পড়ল, আমার জন্যে পালঙ্কে বিছানা। ঘরের ভিতর বেশ গুমোট, দাদাকে বলে পায়ের কাছে জানালাটা খুলবার অনুমতি চেয়ে নিলাম। ধূর্জটিপ্রসাদ উঠে লোহার খিলটা খুলে পাল্লাটা একটু ফাঁক করতে না করতেই 'দাদাগো' বলে চিৎকার করে সটান মাটিতে পড়ে গেলেন। পাল্লাটা ঝপাৎ করে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে খিড়কিটাও বন্ধ হয়ে গেল।

তারপরে কী যেন কী হয়ে গেল। ধূর্জটিপ্রসাদ দাদাকে জড়িয়ে ধরে গোঁ গোঁ করতে করতে বলেছিলেন—'দাদাগো যেও না।' আলো নিভে গেছে। অনেক কষ্টে আমার হাতের বাঁধন ছাড়িয়ে দাদা চুপি চুপি জিগ্যেস করলেন—'কী দেখেছিস?' তিনি জবাব দিলেন—'একজন মানুষ—চোর, দরজার পাশে, দরজায় প্রায় মুখ ঠেকিয়ে, গালের পাশে হাত রেখে আমাদের কথা শুনছিল।'

—ভয় কি? দরজা বন্ধ আছে— ও চোর।

—না, দাদা চলে যেও না।

—আচ্ছা, যাচ্ছি না বাবা যাচ্ছি না। তুই আমাকে ছাড়, কলসি থেকে তোর মাথায় জল ঢেলে দিই।

দাদা মাথায় জল ঢালতে লাগলেন। হঠাৎ মনে হল, ছাদে গুম গুম আওয়াজ হচ্ছে, যেন কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে। দাদা হঠাৎ বলে উঠলেন—'ওরে পাশের ঘরে দরজা খুলে ওরা সবাই ঘুমুচ্ছে, ওদের মেরে রেখে যাবে—জাগিয়ে দিই চল্'।

—না, দাদা যেও না, এখান থেকে চেঁচিয়ে বল।

—না, চেঁচিয়ে রাত দুপুরে কেলেঙ্কারি করবো না।

এই বলে তাঁরা দুই ভাই ছাদে গিয়ে শুয়ে থাকা লোকগুলোকে ডাকবার জন্যে গায়ে হাত দিতেই তাঁরা 'চোর, চোর' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। দাদা বললেন—'চুপ, আমরা চোর নই, তবে চোর ছাদে এসেছে।' শুনে সবাই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সবাই আলোর সন্ধান করতে লাগলেন।

এদিকে ধূর্জটিপ্রসাদ ভিজে মাথায় খুব কষ্ট পেতে লাগলেন। তারই মধ্যে ছাদ, সিঁড়ি, খাটের নিচ—সবই তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল, কিন্তু কোনও চোরের পাত্তা পাওয়া গেল না।

কিন্তু হঠাৎ লক্ষ্য করা গেল সেই হিঙ্কস-এর নিভে যাওয়া লণ্ঠনটা জ্বলতে আরম্ভ করল। তার শিখা থেকে একটা মুখ উঠে পড়ল। অদ্ভুত তার ভঙ্গি, অদ্ভুততর তার হাসি। সে মুণ্ডু কেবল নড়ছে, বাঁ থেকে ডাইনে, ডাইনে থেকে বাঁয়ে, প্রথমে আস্তে, ক্রমে জোরে জোরে, মাঝে মাঝেই লাফিয়ে উঠছে—আর হি হি করে হাসছে। তারপরে—

তারপরে মুণ্ডুটা বড় হতে লাগল, হাসতে হাসতে মুখের হাঁ-টা প্রায় কান ছুঁয়ে বসে, চোখটা ভয়ঙ্কর রকমের ড্যাবড্যাবে হয়ে উঠল।

—ওই দেখ, আলোর ভিতর থেকে আসছে'—ধূর্জটি চিৎকার করে উঠলেন।

সবাই তাই দেখছিলেন। সবাই মিলে একসঙ্গে হুটোপুটি করে চেঁচাতে লাগলেন—হা, ঐ যে...ঐ যে....। তারপর কী যে হল—অজ্ঞান মানুষেরা কী করে সেই সব কথা বলবেন!

আধুনিক সাহিত্যিকেরাও ভূত দেখেন

আ.ক.ভূ.বা./১০

এবারে কলকাতার বেশ কিছু সাহিত্যিকদের ভূত দেখার অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁদেরই বক্তব্য আমরা একে একে তুলে ধরছি। এদের এসব বাড়ি ভূতুরে নয় নিশ্চয়ই। ভূতেরা একেবারে টেম্পোরারি বাসা নিয়েছিল এসব জায়গায়। অতএব নিরাপদ!

আলো জ্বালিয়ে গিয়েছিল

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

সরাসরি ভূত দেখার দুর্ভাগ্য আমার না থাকলেও আমি খুব ভূতের ভয় পাই। যে ঘটনার কথা বলছি সেটা এই কয়েকদিন আগের। আমার বাড়িতে একজন কাজের মেয়ে ছিল—তিন চার মাস কাজ করার পরে সে বাচ্চা হতে গিয়ে মারা যায়। তারপর রাত্তিরে আমি একেবারেই একলা থাকতে পারতাম না। মনে হতো ওকে ঠিক দেখতে পাবো। আগেই বলেছি আমি একদমই একলা শুতে পারি না। গত কয়েকদিন আগে আমি আমার মেয়ের ঘরে একটা ক্যাম্প খাট পেতে শুয়েছিলাম, ঠিক সেই জায়গায় যেখানে ওই কাজের মেয়েটি শুতো। পাশের খাটে মেয়ে ঘুমোচ্ছে। রাতে হঠাৎই ঘরের আলোটা আপনা-আপনি জ্বলে উঠল। আমার মনে হতে লাগল ঘরে আমি ছাড়াও অন্য কেউ আছে। এরপর আমার স্ত্রী এসে আলোটা নিভিয়ে দেন। ভেবেছিলাম আমি বোধহয় ভয় পেয়ে আলো জ্বালিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছি। আমার স্ত্রী চলে যাওয়ার পরে আবার আলোটা জ্বলে ওঠে—, পাখাটা বন্ধ হয়ে যায়। আমি উঠে গিয়ে আলোটা নেভাবার সময় দেখি সুইচটা লুজ হয়ে গেছে কিনা। অথচ বেশ শক্তই ছিল— গায়ের জোরে জ্বালাতে হচ্ছিল। এরপর আমি ওই ঘর ছেড়ে চলে যাই। আমার বিশ্বাস ওই মেয়েটির আত্মা বা ভূত যাই বলি না কেন, ওই সময়ে ওই জায়গায় এসেছিল। ওর জায়গায় আমাকে শুয়ে থাকতে দেখে—নানাভাবে আমাকে বিরক্ত করছিল যাতে জায়গাটা ছেড়ে দিই। তবে ওই ঘরে শোওয়ার কথা ভাবতেই পারিনি।

বন্ধুর ভূত পাশের খাটে!

সমরেশ বসু

আমি পাশ ফিরে শুলে, পাশের খাটেও ক্যাঁচ, ক্যাঁচ! আমি কোন শব্দ করলে, পাশের খাট থেকেও কে যেন শব্দ ফেরৎ পাঠায়! তার ওপর ওই নিশুতি রাতে বই, খাতা নিয়ে কে যেন টেবিলে নাড়াচাড়া করে! কাগজের খস্‌খস্ আর পাশের

খাটের ফিস্‌ফিস্‌ আওয়াজে ঘুম আসে না কিছুতেই। ভয়ে নয়, কীরকম যেন এক অস্বস্তিতে। ভূতের ভয় আমার কোনও কালেই ছিল না। এখনও নেই। ও ভূত আমি ঠিক দেখেছি বলেও মনে পড়ে না, হ্যাঁ ওই একবার ভূত-ভূত মনে হওয়া ছাড়া আর কোনও বারই নয়। সাল ঃ ১৯৬২। মাস ঃ কার্তিক, স্থান ঃ দীঘা। আমি সেবার পুজোর লেখাটেখা সেরে একটু নিশ্চিন্তে জিরিয়ে নেব বলে এলাম দীঘায়, উঠলাম শৈলেনবাবুর পান্থশালায়। ঘরে একা থাকতে চাই বলে ভাড়া নিয়ে নিলাম দুটো বিছানাই। রফা হল ১০ টাকায়।

খড়্গপুর পর্যন্ত ট্রেনে, সেখানে থেকে বাসে কাঁথি হয়ে দীঘায় এসে পৌঁছেছি বেলায় বেলায়। হাত মুখ ধুয়ে বসেছি হোটেলের বারান্দায়। ঝাউবনের মাথায় সূর্য্যি ডুবছে ক্রমশ সন্ধে হয়ে আসছে। চা বিস্কুট খাচ্ছি। আর দু চোখ ভরে উপভোগ করছি উথাল পাথাল সমুদ্রের বুকে সোনাঝরা সূর্যের সোনালি মিলন। হঠাৎ কোত্থেকে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে হাজির দুটি কুকুর। বিস্কুট ছুঁড়ে দিই। শূন্যে লুফে নেয়। তখনই হঠাৎ কেন যেন মনে হয় এতো কুকুর নয় শেয়াল। আবার পরক্ষণেই —নাঃ নাঃ এ কুকুর। কুকুর না শেয়াল, শেয়াল না কুকুর করতে করতে ভাবতে ভাবতে নামল বৃষ্টি। প্রচণ্ড বৃষ্টি। আকাশ জুড়ে বিদ্যুৎ চমক। মেঘের ডাক। সমুদ্র গর্জ্জন। দমকা হাওয়ায় ঝাউবনে সোঁ সোঁ আওয়াজ। সামনে যতদূর চোখ যায় কেউ কোথাও নেই। আর ঘরেও আমি একা। চারিদিকে কেমন যেন গা ছমছমে একটা ভাব।

ইতিমধ্যে খাওয়া-দাওয়া করে আলো নিভিয়ে শুয়েছি বিছানায়। আমার পাশের বিছানাটা ফাঁকা। তোষক, গদি কিছুই পাতা নেই। তবু যতবারই ওদিকে চোখ যায় মনে হয় কে যেন শুয়ে আছে। যতবার পাশ ফিরি, মনে হয় পাশের বিছানাতেও কে যেন পাশ ফিরল...দিন সাতেক ছিলাম সেবার। ছ'দিন এরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। সাতদিনের দিন আর থাকতে না পেরে শৈলেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী ব্যাপার বলুন তো।' বাগে পেয়ে শৈলেনবাবুও জড়িয়ে ধরেন আর কি, 'সে তো আপনার ঘরেই ছিল।'

—সে মানে?

—আপনার বন্ধু ফোটন।

—বলেন কি! শুনেছিলাম সে পোয়াতি বউকে নিয়ে দীঘায় বেড়াতে এসে খুন হয়েছে। তিন নম্বর ঘরেই নাকি?

—খুন হয়নি। দীঘা থেকে এক মাইল দূরে, ওড়িশা বর্ডারে গিয়ে ধুতির কাছায় ফাঁস লাগিয়ে, ঝুলে মরেছে। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে প্রমাণ হয়েছে তা।

ওসব শোনার পর শেষ দিনটা একা ঘুমোতে পারিনি। তিন নম্বর-ঘরের মেঝেতে শুয়েছিল হোটেলের এক চাকর। তবে সে রাতে পাশের বিছানায় আর কেউ আমাকে দেখে পাশ ফিরে শোয়নি। ঘরেতে ক্যাঁচ, কোঁচ, ফিস্‌ফিস্‌, খস্‌খস্‌ শব্দও শুনিনি আর।

ভূত মুখে বরফের কুচি ছড়িয়ে গেল

সুচিত্রা মিত্র

ভূত আছে কি না আছে—এমন কথা বলতে চাই না। কারণ ভূত বললেই মনে হয় গল্পকথা। কিন্তু Spirit বলে কিছু একটা আছে এটা আমি বিশ্বাস করি। আর এ নিয়ে তো গবেষণা চলে আসছে—চলছে। কিন্তু সে কথা থাক। আমার জীবনে কয়েকবার যে অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল তারই একটা বলি।

বিশ্বাস-অবিশ্বাস করা? সে আপনাদের মর্জি। বহু বছর আগে ১৯৪৫-৪৬ সাল হবে। আমি বি.এ. পড়ি স্কটিশ চার্চ কলেজে। গান গাই, ছাত্র রাজনীতি করি, টিউশান করি, আড্ডা মারি—এমনই বয়স তখন। সময়টা ছিল শীতকাল। কলেজের শেষে পার্টির cell meeting ছিল গোয়াবাগানে এক ছাত্রনেতার বাড়িতে। সেখান থেকে যখন পথে নামলাম তখন বিকেল সাড়ে ছ'টা হবে। কিন্তু শীতের বিকেল তো—তাই অন্ধকারটা নামে তাড়াতাড়িই। গোয়াবাগানের কাছেই সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট। সেখানে আমার এক সহপাঠিনীকে economics-এর একটা বই, কিছু নোট্‌স দিয়ে বাড়ি ফিরব—এমনই বলা ছিল বাড়িতে। এখনকার কথা বলতে পারি না, কিন্তু তখন সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট ছিল খুবই সরু আর নোংরা। যাইহোক বন্ধুর বাড়িতে কাজ এবং আড্ডা সেরে যখন রাস্তায় বেরুলাম তখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা। বাড়ি ফিরলে কপালে বকুনি আছে নির্ঘাত—ফলে জোর কদমে হাঁটা শুরু করলাম। ওই সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট ধরে এঁকে বেঁকে কিছুটা হাঁটলেই কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, তারপর 2B বাস ধরে ভবানীপুরের বাড়িতে। তখনও কলকাতা শহরে কিছু কিছু রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলত। সন্ধের একটু আগেই কাঁধে মই নিয়ে লোক এসে গ্যাস জ্বালাত আবার ভোরবেলা ওইভাবে এসেই নিভিয়ে যেত। এ রাস্তায়ও গ্যাসের আলো। একে শীতের রাত্রির তায় গ্যাসের আলো পথটা খুব আলোকিত নয়। একটা গ্যাসপোস্ট থেকে আর একটার দূরত্বের মধ্যে শীতের রাতের ধোঁয়াশা এবং ঘন অন্ধকার জমাট বেঁধেছিল। একটু হয়তো অন্যমনস্কই ছিলাম। হঠাৎ মনে হল কে জানি আসছে। তখন চুরি, ছিনতাই, এসবের হাঙ্গামা ছিল না। তাই সে ভয় আমার হয়ইনি। কিন্তু 'পেছনে সে আসছে' এই বোধ হতেই গা ছম্‌ছমিয়ে উঠল। আমি ভীতু এ বদনাম আমার নেই। ছোট থেকেই আমি ডাকাবুকো। কিন্তু সে রাত্তিরে কী যে হল—ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে দেখব যে তাও পারলাম না। মনে হল ঘাড়টা যেন স্ক্রু দিয়ে আঁটা। হাঁটার বেগ বাড়ালাম। একটা গ্যাসপোস্ট পেরিয়ে পড়লাম জমাট অন্ধকারের কবলে...আর কি সেই সময়েই পেছনের (কি বলব তাকে আজও জানি না) প্রাণীটি হন্‌হনিয়ে আমাকে পেরিয়ে চলে গেল। ওরেঃ বাস্‌। কি ঢ্যাঙা। আপাদমস্তক সাদা কোনও কাপড়ে জড়ানো—বোধকরি শীতের জন্যে। আর পাশ দিয়ে যখন গেল তখন যেন মুঠো মুঠো বরফের কুচি আমার ওপর ছড়িয়ে গেল। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। চোখ দুটো রইল সামনের গ্যাস-

পোস্টের দিকে—প্রাণীটিকে ওই আলোয় আর একবার দেখবার ইচ্ছেয়। কিন্তু, ওমা! গ্যাসের আলোয় যাবার আগেই প্রাণীটি কোথায় উবে গেল। 'উবে গেল' বলছি এই কারণেই যে তাকে আর আলোর তলায় দেখলাম না। যুক্তি দিয়ে মনকে বোঝালাম হয়তো কোনও বাড়িতে ঢুকে গেছে নয়তো বা আশপাশের কোনও গলিতে। জোরে হাঁটা শুরু করলাম। কিন্তু কোথায় কি? আমার বাঁপাশে একটা খাটাল আর ডানপাশে একটা বাড়ির উঁচু টানা দেওয়াল। এছাড়া কোনও বাড়ির দরজা বা সরু গলি নেই! তারপর? তারপর বুকের ধকধকানি মাথায় বয়ে কেমন করে যে বড় রাস্তায় এসে পড়লাম—তা মনে নেই। বলতে পারেন চোখের ভুল। হতে পারে। কে জানে? যেমন ধরুন না কেন—এই যে সারাদিন কাজের পর রাতে বারোটায় টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে যখন লেখাটা লিখছি মনে হচ্ছে, কে যেন ঠিক আমার পেছনে দাঁড়িয়ে, কি লিখছি, পড়ছে। ঠাণ্ডা নিঃশ্বাসও আমার গালে লাগছে...কেমন যেন একটা uncanny feeling একে কি বলবেন আপনারা? এমন অভিজ্ঞতা আমার আরও অনেক...কিন্তু থাক। সেগুলো পরে কোনও সময়ে না হয় বলা যাবে।

হেডলাইটের আলোয় ছায়ামূর্তি!

তপন সিংহ

ভূত বা অলৌকিক কিছু নিয়ে চিন্তাভাবনা করার সময় আমি কখনও পাইনি। লোকেশনে ভূটান গিয়েছিলাম। ছবির নাম 'হাটেবাজারে'। জায়গাটার নাম ভুটান সান্‌চি। সেখানে আমরা আমাদের থাকার জায়গা থেকে মাইল ছয়েক দূরে শুটিং করতে যেতাম। সান্‌চিতে পৌঁছনোর পর, বেশ অনেকেই আমাদের বলেছিলেন, সন্ধের পর যেন বার না হই। আমরা কথাটার তেমন আমল দিইনি। তবে, একদিনের কথা আমার খুব পরিষ্কার মনে আছে। আমি সেদিন শুটিং প্যাক-আপ একটু তাড়াতাড়িই করে ফেলি। কারণ পরে রাত্রে আরও কিছু করার কথা ছিল। সমস্ত কিছু দেখেশুনে লোকেশন থেকে ফেরার জন্য যখন আমি জিপে উঠি, তখন সূর্য ডুবতে খুব একটা দেরি নেই। আমি নিজেই আমার জিপ চালাতাম। সেদিন একাই ক্যাম্প অভিমুখে পাড়ি দিলাম। হঠাৎ, দূরে হেডলাইটের আলোয় দেখলাম, কে যেন রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর যতদূর বুঝতে পারছি ওই মূর্তিটা আমার জিপের দিকেই আসছে। এক মুহূর্তের জন্য বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল, মনটা টলে উঠল, মাথাটা কেমন গুলিয়ে গেল। সত্যিই, ভয় পেয়েছিলাম সেদিন। খুব কাছে এসে গেছে। এবং দেখলাম ওটি একটি মেয়ে, যার গায়ে একটাও কাপড় নেই—। টলছে আর হাসছে। আমি পাশ কাটিয়ে সোজা জিপ নিয়ে চলে গেলাম। সেইদিন আমি ভূত দেখিনি বটে, তবে ভূতের ভয় পেয়েছিলাম।

এসে মালিশ করে গেল!

মৃণাল সেন

আমি নিজেকে একজন সাহসী লোক বলেই মনে করি। তবে তিনটে জিনিসে আমার খুব ভয়। চোর, পাওনাদার আর ভূত।

বাড়ির হইচইতে কাজের অসুবিধে হতো বলে স্ক্রিপ্ট লেখার কাজ থাকলেই, আমি বেরিয়ে পড়তাম নির্জন নিরালা কোনও জায়গার উদ্দেশে। সেবার গিয়েছিলাম দীঘায়। একটা স্ক্রিপ্ট লেখার কাজ নিয়ে। আমি যখনকার কথা বলছি, তখন দীঘায় সরকারি হোটেল টোটেল ছিল না। উঠেছিলাম একটা প্রাইভেট হোটেলে।

সন্ধে পেরিয়ে রাত হয়ে গেল। মনে কোনও ভয় নেই। জানি এখানে পাওনাদার আসার কোনও সম্ভাবনা নেই, চোর এসেই বা কী নেবে, কিছুই তো সঙ্গে নেই, আর কাজের চাপে ভূতের কথাটা মাথায় আসেনি। তাই একেবারে নির্ভীক আমি, একা বসে কাজ করে যাচ্ছি। দূর থেকে পাওয়ার হাউসের আওয়াজ আসছে। একটা চেয়ারে বসে আছি চুপ করে। এমনই সময় কে ডাকল 'বাবু'! তাকিয়ে দেখি একজন মানুষের অবয়ব। হাসল সে। ঝকঝকে দাঁত আর সাদা চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না নিকষ কালো অন্ধকারে। বলল 'মালিশ করাবেন?' তখন আমি নিশ্চিত ও ভূত। ভূতের সঙ্গে ঝগড়া করে, তর্ক করে কোনও গোলমালে যেতে আমি রাজি নই। তাই চুপ করে রইলাম। তখন ভূতটি আমাকে বলল শুয়ে পড়তে। আমি শুয়ে পড়ার পর সে মালিশ শুরু করল। এমনিতে ম্যাসাজ আমার ভালই লাগে তবে তখন মনে হচ্ছিল এই বুঝি মরে যাবো। আরামের চেয়ে ভয়ের পাল্লাটা অনেক বেশি ভারি। ম্যাসাজ করতে করতে, বুক পিঠ ছেড়ে যেই গলার কাছে আসছে ভয় হচ্ছে এই বুঝি ঘাড় মটকে দিল। তারপর প্রায় আধঘণ্টা পরে আমায় ছেড়ে দিল। এই আধঘণ্টা আমি মুখ বুজে মড়ার মতো পড়েছিলাম। ভূতের ম্যাসাজ করার কোনও প্রতিবাদ করিনি। আধঘণ্টা ম্যাসাজ করার পর ভূত বললো, 'দুটো টাকা'। ভূত যে আমার ঘাড়ও মটকালো না, বুকের রক্তও শুষে নিল না, এই কৃতজ্ঞতা-বোধে আমি তাকে দু' টাকার বদলে পাঁচ টাকা দিলাম। আর বলাই বাহুল্য পরের দিন সকালেই তল্পি-তল্পা গুটিয়ে ও বাড়ি ছেড়ে সোজা হোটেলে। ভূতের চাইতে মেয়েদের সান্নিধ্য অনেক ভাল। যতই অসুবিধে হোক না কেন তাতে।

হুতোম প্যাঁচারা সাধারণত গাছের কোটরে অথবা বাড়ির এঁদো জায়গায় থাকে। কিন্তু এই প্যাঁচাটি উত্তর কলকাতায় থাকতেন প্রায় দুশো বছর আগে। তিনি যদি কালিপ্রসন্ন সিংহ হন, তবে জোড়াসাঁকোর বাসিন্দা ছিলেন। সেখানেই ভূত নামানো হয়েছিল। ভূতের মন্ত্র আমি ভূমিকায় জানিয়েছি। পাঠক, নামাবার চেষ্টা করতে পারেন।

ভূত নাবানো

হুতোম প্যাঁচা

আর একবার যে আমরা ভূত নাবানো দেখেছিলাম, সেও বড় চমৎকার! আমাদের পাড়ার এক স্যাকরাদের বাড়িতে একজনের বড় ভয়ানক রোগ হয়; স্যাকরারা বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন, সুতরাং রোগের চিকিৎসা কত্তে ত্রুটি করে না, ইংরেজি ডাক্তার বদ্দি্য ও হাকিমের মেলা করে ফেল্লে; প্রায় তিন বৎসর ধরে চিকিৎসে হলো, কিন্তু রোগের কেহ কিছুই কত্তে পাল্লে না, রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি হচ্ছে দেখে বাড়ির মেয়েমহলে—তুলসী দেওয়া—কালীঘাটে সত্তেন—কালভৈরবের স্তব পাঠ—তুক্‌তাক্—সাফরিদ্—নারাণ—বালওড—বাল্‌সি—শোপুর—নলপুর ও হালুমপুর প্রভৃতি বিখ্যাত বিখ্যাত জায়গার চন্নামেত্তো ও মাদুলি ধারণ হলো—তারকেশ্বরে হত্যে দিতে লোক গ্যালো—বাড়ির বড় গিন্নি কালীঘাটে বুক চিরে মাথায় ও হাতে ধুনো পোড়াতে গেলেন—শেষে একজন ভূতচালা আনা হয়।

ভূত চালার ভূতের ডাক্তারি পর্যন্ত করা আছে। আজকাল দু-এক বাঙালি ডাক্তার মধ্যে মধ্যে পেশেণ্টের বাড়ি ভূত সেজে দ্যাখা দ্যান—চাদরের বদলে দড়ি ও পেরেক সহিত মশারি গায়ে কখন বা উলঙ্গ হয়েও আসেন, কেবল মন্ত্রের বদলে চার-পাঁচজন রোজায় ধরাধরি করে আনতে হয়। এঁরা কল্‌কেতা মেডিকেল কালেজের এজুকেটেড ভূত।

ভূতচালা চণ্ডীমণ্ডপে বাসা পেলেন, ভূত আস্‌বার পোগ্রাম স্থির হলো—আজ সন্ধ্যার পরেই ভূত নাব্বেন, পাড়ার দু-চার বাড়িতে খবর দেওয়া হলো—ভূত মনের কথা ও রুগীর ঔষধ বলে দেবে। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে গ্যালো, কুটিওয়ালারা ঘরে ফিল্লেন—বারফট্‌কারা বেরুলেন, বিগ্রহরা উত্তরাঢ়ি কায়েতদের মত (দর্শন মাত্র) শেতল খেলেন, গির্জের ঘড়িতে টুং টাং ঢং করে ন'টা বেজে গ্যালো, গুম্ করে তোপ পড়লো। ছেলেরা "ব্যোম্ কালী কল্‌কেতাওয়ালী" বলে হাততালি দে উঠ্‌লো—ভূতনাবানো আসরে নাবলেন।

আমাদের প্রতিবাসী ভূত নাবানোর কথা প্রমাণ ও বাড়ির গিন্নিদের মুখে শুনে ভূতের আহার জন্য আয়োজন কত্তে ত্রুটি করে নাই; বড়বাজারের সস্ত উত্তমোত্তম মেঠাই, ক্ষীরের নানা রকম পেয় ও লেহ্যরা পদার্পণ করেন—বোধহয়, আমাদের মত প্রকৃত ফলার্য্যের দশ জনে তাঁদের শেষ কত্তে পারে না, রোজা ও তাঁর দুই চেল্লায় কি কর্ব্বেন! রোজা ঘরে ঢুকে একটি পিঁড়েয় বসে ঘরের ভিতরে সকলের পরিচয় নিতে লাগলেন—অনেকের আপাদমস্তক ঠাউরে দেখে নিলেন—দুই একজন কলেজবয় ও মোটা মোটা লাঠিওয়ালা নিমন্ত্রিতদের প্রতি তাঁর যে বড় ঘৃণা জন্মেছিল, তা তাঁর সে সময়ের চাউনিতেই জানা গ্যালো।

রোজার সঙ্গে দুটি চ্যালা মাত্র, কিন্তু ঘরে প্রায় জন চাল্লিশ ভূত দেখবার উমেদার উপস্থিত, সুতরাং ভূত প্রথমে আসতে অস্বীকার করেছিলেন, তদুপলক্ষে রোজাও

"কাল ও কৃশ্চানীর" উপলক্ষে একটু বক্তৃতা কত্তে ভোলেন নাই—শেষে দর্শকদের প্রগাঢ় ভক্তি ও ঘরের আলো নিবিয়ে অন্ধকার করবার সম্মতিতে রোজা ভূত আনতে রাজি হলেন—চ্যালার খাবার দাবার সাজানো থালা ঘেঁষে বসলেন, দরজার হুড়্কো পড়লো—আলো নিবিয়ে দেওয়া হলো; রোজা কোশাকুশি ও আসন নিয়ে শুদ্ধাচারে ভূত ডাকতে বসলেন, আমরা ভূতের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বারোইয়ারির গুদামজাত সংগুলির মত অন্ধকারে বসে রইলেম!

পাঠক! আপনার স্মরণ থাকতে পারে, আমরা পূর্বেই বলেছি যে, আমাদের ঠাকুরমা ভূত ও পেত্নির ভয় নিবারণের জন্য একটি ছোট জয়ঢাকের মত মাদুলিতে ভূকৈলেশের মহাপুরুষের পায়ের ধুলো পুরে আমাদের গলায় ঝুলিয়ে দ্যান—তা সওয়ায় আমাদের গলায় গুটি বারো রকমারি পদক ও মাদুলি ছিল, দুটি বাঘের নখ ছিল, আর কুমীরের দাঁত, মাছের আঁশ ও গণ্ডারের চামড়া ও কোমরের গোটে সাবধানে রাখা হয়। আর হাতে একখানা বাজুর মত কবচ ও তারকেশ্বরের উদ্দেশ্যে সোনার তাগা বাঁধা ছিল। খুব ছেলেবেলা আমাদের একবার বড় ব্যারাম হয়, তাতেই আমাদের পায়ে একটি চোরের সিঁদের বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হয় ও মাথায় পঞ্চানন্দের একটি জট্ থাকে, জটটি তেল ও ধুলোতে জড়িয়ে গিয়ে রামছাগলের গলার নুন্নড়ির মত ঝুলতো, কিন্তু আমরা ইস্কুলের অবস্থাতেই অল্প বয়সে অ্যাম্‌বিশনের দাস হয়ে ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে একখানা ছাবানো হেডিংওয়ালা কাগজে নাম সই করি; তাতেই শুনলাম যে, আমাদের ব্রাহ্ম হওয়া হলো, সুতরাং তারই কিছু পূর্বে ইস্কুলের পণ্ডিতের মুখে মহাপুরুষের দুর্দশা শুনে সেগুলি খুলে ফেলেছিলাম, আজ সেইগুলির আবার স্মরণ হলো, মনে কল্লেম যদি ভূত নাবানো সত্যই হয়, তা হলে সেইগুলি পরে আসতে পাল্লে ভূতে কিছু কত্তে পার্ব্বে না—এই বিবেচনা করে সেইগুলির তত্ত্ব কল্লেম, কিন্তু পাওয়া গ্যালো না—সেগুলি আমাদের পৌত্তুরের ভাতের সময় একটা চাকর চুরি করে; চুরিটি ধরবার জন্য চেষ্টারও ত্রুটি হয়নি—গিন্নি শনিবারে একটি সুপুরি, পয়সা ও সওয়া কুন্‌কে চেলের মুদো বাঁদেন, ন্যেঁপীর মা বলে আমাদের বহুকালের এক বুড়ি দাসী ছিল, সে সেই মুদোটি নে জানের বাড়ি যায়—জান গুণে বলে দেয় যে "চোর বাড়ির লোক, বড় কালও নয় বড় সুন্দরও নয়— শ্যামবর্ণ, মানুষটি একহারা, মাঝারি গোঁপ, মাথায় টাঁক্ থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে।" জানের গোণাতে আমাদের ও চাকরটিকেই বোঝায়, সুতরাং চাকরকেই চোর স্থির করে ছাড়িয়ে দেওয়া যায়, সুতরাং সে মাদুলিগুলি পাওয়া গ্যালো না, বরং ভূতের ভয় বেড়ে উঠলো।

ব্রাহ্ম হলেও যে ভূতে ধরবে না, এটিরও নিশ্চয় নাই—সেদিন কল্‌কেতার ব্রাহ্মসমাজের একজন ডাইরেক্টরের স্ত্রীকে ডাইনে পায়—নানা দেশ দেশান্তর থেকে রোজা আনিয়ে কত কাড়ান ঝোড়ান, সরষে পড়া, জল পড়া ও লঙ্কা পড়া দিতে, তবে ভাল হয়—অনেক ব্রাহ্মর বাড়িতে ভূতচতুর্দশীর প্রদীপ দিতে দেখা যায়!

এদিকে রোজা খানিকক্ষণ ডাক্‌তে ডাক্‌তে ভূতের আসবার পূর্বলক্ষণ হতে লাগ্‌লো; গোহাড়, ঢিল, ইট ও জুতো হাঁড়ি বাড়ির চতুর্দিকে পড়তে লাগ্‌লো, ঘরের ভেতর গুপ্ গুপ্ য্যান কে নাচ্চে বোধ হতে লাগলো, খানিকক্ষণ এই রকম ভূমিকার পর মড়াস্ করে একটা শব্দ হলো, ভূতের বসবার জন্য ঘরের ভিতর যে পিঁড়েখানা রাখা হয়েছিল, শব্দে বোধ হলো সেইখানি দুচির হয়ে ভেঙে গ্যালো—রোজা সভয়ে বলে উঠলেন—শ্রীযুত এসেচেন!

আমরা ছেলেব্যালা আমাদের বুড়ো ঠাকুরমার কাছে শুনেছিলাম যে, ভূতে ও পেত্নীতে খোনা কথা কয়, সেটি আমাদের সংস্কারবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল; আজ তার পরীক্ষা হলো—ভূত পিঁড়ে ফাটিয়েই খোনা কথা কইতে লাগলেন, প্রথমে এসেই কলেজবয়েদের দলের দুই এক জনের নাম ধরে ডাকলেন, তাদের নাস্তিক ও কৃশ্চান বলে গাল দিলেন, শেষে ভূতত্বনিবন্ধন ঘাড় ভাঙবার ভয় পর্যন্ত দ্যাখাতে ত্রুটি করেন নাই, ভূতের খোনা কথা ও অপরিচিতের নাম বলাতেই বাড়ির কর্তা বড় ভয় পেলেন, জোড়হাত করে (অন্ধকারে জোড়হাত দেখা অসম্ভব, জোড়হস্তে কথা কয়েছিলেন এ আমাদের কেবলভাবে বোধ হলো) ক্ষমা চাইলেন, কিন্তু ভূত সব মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌সের মত যা ধরেন, তার সমূলচ্ছেদ না করে ছাড়েন না, সুতরাং আমাদের ঘাড় ভাঙবার প্রতিজ্ঞা অন্যথা হলো না, শেষে রোজা ও বুড়ো বুড়ো দর্শক ও বাড়িওয়ালার অনেক সাধ্য সাধনার পর ভূত মহোদয় ষষ্ঠীবাঁটায় আগত নূতন জামাইয়ের মত যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ কত্তে সম্মত হলেন, আমরাও পালাবার পথ আঁচতে লাগ্‌লেম্!

লুচির চট্‌কানো ও চিবোনোর চপর চপর ও সাপ্টা ফলারের হাপুর হুপুর শব্দ থামতে প্রায় আধঘণ্টা লাগলো, শেষে ভূত জলযোগ করে গাঁজা ও তামাক খাচ্ছেন, এমন সময় পাশ থেকে ওলাউঠো রুগির বমির ভূমিকার মত উকির শব্দ শোনা যেতে লাগলো, ক্রমে উকির চোটে ভূতের বাক্‌রোধ হয়ে পড়্‌লো—বমি! হুড় হুড় করে বমি! গৃহস্থ মনে কল্লেন, ভূত মহাশয় বুঝি বমি কচ্চেন, সুতরাং তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়ে আনালেন, শেষে দেখি কি চ্যালা ও রোজা খোদই বমি কচ্চেন, ভূত সরে গ্যাচেন—আমরা পূর্বে শুনি নে যে গেরস্তর অগোচরে একজন মেডিকেল কালেজের ছোকরা ভূতের জন্য সংগৃহীত উপচারে টারটামেটিক্ মিশিয়ে দিয়েছিলেন, রোজা ও চ্যালারা তাই প্রাসাদ পাওয়াতেই তাঁদের এই দুর্দশা; সুতরাং ভূত নাবানোর উপর আমাদের যে ভক্তি ছিল, সেটুকু উপে গ্যালো। সুতরাং শেষে আমরা এই স্থির কল্লেম যে, ইংরাজি ভূতদের কাছে দিশি ভূত খবরে আসে না।

এ সওয়ায় আমরা আরও দু' চার জায়গায় ভূত নাবানো দেখেচি, পাঠকরাও বিস্তর দেখেচেন, সুতরাং সে সকল এখানে উত্থাপন করা অনাবশ্যক, "ভূত নাবানো" ও "হোসেন খাঁ" কেবল জুচ্চুরি ও হুজুকের আনুষঙ্গিক বলেই আমরা উল্লেখ করি।

কলকাত্তাইয়া ভূতের গল্প

মহেশের মহাযাত্রা

পরশুরাম

কেদার চাটুজ্যে মহাশয় বলিলেন—'আজকাল তোমরা সামান্য একটু বিদ্যে শিখে নাস্তিক হয়েছ, কিছুই মানতে চাও না। যখন আরও একটু শিখবে তখন বুঝবে যে আত্মা আছেন। ভূত, পেত্নী—এঁরাও আছেন। বেম্মদত্যি, কঙ্ককাটা—এঁনারাও আছেন।'

বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানায় গল্প চলিতেছিল। তাঁহার শালা নগেন বলিল—'আচ্ছা বিনোদদা, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?'

বিনোদ বলিলেন—'যখন প্রত্যক্ষ দেখব তখন বিশ্বাস করব। তার আগে হাঁ-না কিছুই বলতে পারি না।'

চাটুজ্যে বলিলেন—'এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ওকালতি কর! বলি, তোমার প্রপিতামহকে প্রত্যক্ষ করেছ? ম্যাকডোনাল্ড, চার্চিল আর বাল্‌ডুইনকে দেখেছ? তবে তাদের কথা নিয়ে অত মাতামাতি কর কেন?'

'আচ্ছা আচ্ছা, হার মানছি চাটুজ্যে মশায়।'

'আপ্তবাক্য মানতে হয়। আরে, প্রত্যক্ষ করা কি যার তার কম্ম? শ্রীভগবান কখনও কখনও তাঁর ভক্তদের বলেন—দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ। সেই দিব্যদৃষ্টি পেলে তবে সব দেখতে পাওয়া যায়।'

নগেন জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি দেখতে পেয়েছেন চাটুজ্যে মশায়?'

'জ্যাঠামি করিসনি। এই কলকাতা শহরে রাস্তায় যারা চলাফেরা করে—কেউ কেরানী, কেউ দোকানী, কেউ মজুর, কেউ আর কিছু—তোমরা ভাব সবাই বুঝি মানুষ। তা মোটেই নয়। তাদের ভেতর সর্বদাই দু-দশটা ভূত পাওয়া যায়। তবে চিনতে পারা দুষ্কর। এই রকম ভূতের পাল্লায় পড়েছিলেন মহেশ মিত্তির।'

'কে তিনি।'

'জান না। আমাদের মজিলপুরের চরণ ঘোষের মামার শালা। এককালে তিনি কিছুই মানতেন না, কিন্তু শেষ দশায় তাঁকেও স্বীকার করতে হয়েছিল।'

সকলে একবাক্যে বলিলেন—'কি হয়েছিল বলুন না চাটুজ্যে মশায়।'

চাটুজ্যে মহাশয় হুঁকাটি হাতে তুলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগেকার কথা। মহেশ মিত্তির তখন শ্যামবাজারের শিবচন্দ্র কলেজে প্রফেসরি করতেন। অঙ্কের প্রফেসর, অসাধারণ বিদ্যে, কিন্তু প্রচণ্ড নাস্তিক। ভগবান আত্মা পরলোক কিছুই মানতেন না। এমনকি, স্ত্রী মারা গেলে আর বিবাহ

পর্যন্ত করেননি। খাদ্যাখাদ্যের বিচার ছিল না, বলতেন—শুয়োর না খেলে হিঁদুর উন্নতির আশা নেই, ওটা বাদ দিয়ে কোনও জাত বড় হ'তে পারেনি। মহেশের চালচলনের জন্য আত্মীয়স্বজন তাঁকে একঘরে করেছিল। কিন্তু যতই অনাচার করুন তাঁর স্বভাবটা ছিল অকপট, পারতপক্ষে মিথ্যা কথা কইতেন না। তাঁর পরম বন্ধু ছিলেন হরিনাথ কুণ্ডু, তিনিও ঐ কলেজের প্রফেসর, ফিলসফি পড়াতেন। কিন্তু বন্ধু হ'লে কি হয়, দু'জনে হরদম ঝগড়া হ'ত, কারণ হরিনাথ আর কিছু মানুন না-মানুন ভূত মানতেন। তাছাড়া মহেশবাবু অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, কেউ তাঁকে হাসতে দেখেনি, আর হরিনাথ ছিলেন আমুদে লোক, কথায় কথায় ঠাট্টা ক'রে বন্ধুকে উদ্‌ব্যস্ত করতেন। তবু মোটের উপর তাঁদের পরস্পরের প্রতি খুব একটা টান ছিল।

তখন রাজনীতি চর্চার এত রেওয়াজ ছিল না, আর ভদ্রলোকের ছেলের অন্নচিন্তাও এমন চমৎকারা হয়নি, দু-একটা পাস করতে পারলে যেমন-তেমন চাকরি জুটে যেত। লোকের তাই উঁচু দরের বিষয় আলোচনা করবার সময় ছিল। ছোকরারা চিন্তা করত—বউ ভালবাসে কি বাসে না। যাদের সে সন্দেহ মিটে গেছে, তারা মাথা ঘামাত—ভগবান আছেন কি নেই। একদিন কলেজে কাজ ছিল না, অধ্যাপকেরা সকলে মিলে গল্প করছিলেন। গল্পের আরম্ভ যা নিয়েই হোক, মহেশ আর হরিনাথ কথাটা টেনে নিয়ে ভূতে আর ভগবানে হাজির করতেন, কারণ এই নিয়ে তর্ক করাই তাঁদের অভ্যাস। এদিনও তাই হয়েছিল।

আলোচনা শুরু হয় ঝি-চাকরের মাইনে নিয়ে। কলেজের পণ্ডিত দীনবন্ধু বাচস্পতি মশায় দুঃখ করছিলেন—'ছোটলোকের লোভ এত বেড়ে গেছে যে আর পেরে ওঠা যায় না।' মহেশবাবু বললেন—'লোভ সকলেরই বেড়েছে, আর বাড়াই উচিত, নইলে মনুষ্যত্বের বিকাশ হবে কিসে।' পণ্ডিতমশায় উত্তর দিলেন—'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।' মহেশবাবু পাল্টা জবাব দিলেন—'লোভ ত্যাগ করলেও মৃত্যুকে ঠেকানো যায় না।'

তর্কটা তেমন জুতসই হচ্ছে না দেখে হরিনাথবাবু একটু উসকে দেবার জন্য বললেন—'আমাদের মতন লোকের লোভ হওয়া উচিত মৃত্যুর পর। মাইনে তো পাই মোটে পৌনে দু-শ, তাতে ইহকালের ক'টা শখই বা মিটবে। তাইতো পরকালের আশায় বসে আছি, আত্মাটা যদি স্বর্গে গিয়ে একটু ফূর্তি করতে পারে।'

দীনবন্ধু পণ্ডিত বললেন—'কে বললে তুমি স্বর্গে যাবে? আর স্বর্গের তুমি জানই বা কি?'

'সমস্তই জানি পণ্ডিত মশায়। খাসা জায়গা, 'না গরম না ঠাণ্ডা। মন্দাকিনী কুলুকুলু বইছে, তার ধারে ধারে পারিজাতের ঝোপ। সবুজ গাছের মধ্যিখানে কল্পতরু গাছে আঙ্গুর, বেদানা, আম, রসগোল্লা, কাটলেট সব রকম ফলে আছে, ছেঁড় আর খাও। জনাকতক ছোকরা দেবদূত গোলাপী উড়ুনি গায়ে দিয়ে সুধার

বোতল সাজিয়ে বসে রয়েছে, চাইলেই ফটাফট খুলে দেবে। ওই হেথা কুঞ্জবনে ঝাঁকে ঝাঁকে অপ্সরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, দু'দণ্ড রসালাপ কর, কেউ কিছু বলবে না। যত খুশি নাচ দেখ, গান শোন। আর কালোয়াতি চাও তো নারদ মুনির আস্তানায় যাও।'

মহেশবাবু বললেন—'সমস্ত গাঁজা। পরলোক আত্মা ভূত ভগবান কিছুই নেই। ক্ষমতা থাকে প্রমাণ কর।

তর্ক জমে উঠল। প্রফেসররা কেউ এক পক্ষে কেউ অপর পক্ষে দাঁড়ালেন। পণ্ডিতমশায় দারুণ অবজ্ঞায় ঠোঁট উল্টে বসে রইলেন। বৃদ্ধ প্রিন্সিপাল যদু সাণ্ডেল রফা করে বললেন—'ভূতের তেমন দরকার দেখি না, কিন্তু আত্মা আর ভগবান বাদ দিলে চলে না।' মহেশ মিত্তির বললেন—'কেউ-উ নেই, আমি দশ মিনিটের মধ্যে প্রমাণ ক'রে দিচ্ছি।' হরিনাথ কুণ্ডু মহা উৎসাহে বন্ধুর পিঠ চাপড়ে বললেন—'লেগে যাও।'

তারপর মহেশবাবু ফুলস্কেপ কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে একটি বিরাট অঙ্ক কষতে লেগে গেলেন। ঈশ্বর আত্মা আর ভূত—এই তিন রাশি নিয়ে অতি জটিল অঙ্ক, তার গতি বোঝে কার সাধ্য। বিস্তর যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ক'রে হাতির শুঁড়ের মতন বড় বড় চিহ্ন টেনে অবশেষে সমাধান করলেন—ঈশ্বর $= 0$ আত্মা $=$ ভূত $= \sqrt{0}$।

বাচস্পতি বললেন—'বদ্ধ উন্মাদ।'

মহেশবাবু বললেন—'উন্মাদ বললেই হয় না। এ হল গিয়ে দস্তুরমত ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলস। সাধ্য থাকে তো আমার অঙ্কের ভুল বার করুন।'

হরিনাথ বললেন—'অঙ্ক-টঙ্ক আমার আসে না। বাচস্পতি মশায় যদি ভগবান দেখাবার ভার নেন তো আমি মহেশকে ভূত দেখাতে পারি।'

বাচস্পতি বললেন—'আমার বয়ে গেছে।'

মহেশবাবু বললেন—'বেশ তো হরিনাথ, তুমি ভূতই দেখাও না। একটার প্রমাণ পেলে আর সমস্তই মেনে নিতে রাজি আছি।'

হরিনাথবাবু বললেন—'এই কথা? আচ্ছা আসছে হপ্তায় শিবচতুর্দশী পড়ছে। সেদিন তুমি আমার সঙ্গে রাত বারোটায় মানিকতলায় নতুন খালের ধারে চল, পষ্টাপস্টি ভূত দেখিয়ে দেব। কিন্তু যদি কোনও বিপদ ঘটে তো আমাকে দুষতে পারবে না।'

'যদি দেখাতে না পার?'

'আমার নাক কান কেটে দিও। আর যদি দেখাতে পারি তো তোমার নাক কাটব।'

প্রিন্সিপাল যদু সাণ্ডেল বললেন—'কাটাকাটির দরকার কি, সত্যের নির্ণয় হলেই হ'ল।

শিবচতুর্দশীর রাত্রে মহেশ মিত্তির আর হরিনাথ কুণ্ডু মাণিকতলায় গেলেন। জায়গাটা তখন বড়ই ভীষণ ছিল, রাস্তায় আলো নেই, দু'ধারে বাবলা গাছে আরও অন্ধকার করেছে। সমস্ত নিস্তব্ধ, কেবল মাঝে মাঝে প্যাঁচার ডাক শোনা যাচ্ছে। হোঁচট খেতে খেতে দু'জনে নতুন খালের ধারে পৌঁছিলেন। বছর দুই আগে ওখানে প্লেগের হাসপাতাল ছিল, এখনও তার গোটাকতক খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে।

মহেশ মিত্তির অবিশ্বাসী সাহসী লোক, কিন্তু তাঁরও গা ছমছম করতে লাগল। হরিনাথ সারা রাস্তা কেবল ভূতের কথাই কয়েছেন—তারা দেখতে কেমন, মেজাজ কেমন, কি খায়, কি পরে। দেবতারা হচ্ছেন উদার প্রকৃতি দিলদরিয়া, কেউ তাঁদের না মানলেও বড় একটা কেয়ার করেন না। কিন্তু অপদেবতারা পদবীতে খাটো ব'লে তাঁদের আত্মসম্মানবোধ বড়ই উগ্র, না মানলে ঘাড় ধরে তাঁদের মর্যাদা আদায় করেন। এই সব কথা।

হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ শোনা গেল, যেন কোনও অশরীরী বেড়াল তার পলাতকা প্রণয়িনীকে আকুল আহ্বান করছে। একটু পরেই মহেশবাবু রোমাঞ্চিত হয়ে দেখলেন, একটা লম্বা রোগা কুচকুচে কালো মূর্তি দু-হাত তুলে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে একটু দূরে ঐ রকম আরও দুটো।

হরিনাথবাবু থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—'রাম রাম সীতারাম! ও মহেশ, দেখছ কি, 'তুমিও বল না!'

আর একটু হলেই মহেশবাবু রামনাম উচ্চারণ করে ফেলতেন, কিন্তু তাঁর কনসেন্স বাধা দিয়ে বললেন—'উঁহু, একটু সবুর কর, যদি ঘাড় মটকাবার লক্ষণ দেখ তখন না হয় রামনাম করা যাবে।'

এঁরা একটা পাকুড় গাছের নিচে ছিলেন। হঠাৎ ওপর থেকে খানিকটা কাদা-গোলা জল মহেশের মাথায় এসে পড়ল।

তখন সামনের সেই কালো মূর্তিটা নাকি সুরে বললে—'মহেশবাবু, আপনি নাকি ভূত মানেন না?'

এ অবস্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই বলে থাকেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, মানি বই কি। কিন্তু মহেশ মিত্তির বেয়াড়া লোক, হঠাৎ তাঁর কেমন একটা খেয়াল হল, ধাঁ করে এগিয়ে গিয়ে ভূতের কাঁধ খামচে ধ'রে জিজ্ঞাসা করলেন—'কোন্ ক্লাস?'

ভূত থতমত খেয়ে জবাব দিলে—'সেকেণ্ড ইয়ার স্যার!'

'রোল নম্বর কত?'

ভূত করুণ নয়নে হরিনাথের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—'বলি স্যার?'

হরিনাথের মুখে রাম নাম ভিন্ন কথা নেই। পিছনের দুটো ভূত অদৃশ্য হয়ে গেল। পাকুড় গাছে যে ছিল সে টুপ করে নেমে এসে পালিয়ে গেল। তখন বেগতিক দেখে সামনের ভূতটি ঝাঁকুনি দিয়ে মহেশের হাত ছাড়িয়ে চোঁচা দৌড় মারলে।

মহেশ মিত্তির হরিনাথের পিঠে একটা প্রচণ্ড কিল মেরে বললেন—'জোচ্চোর।'

হরিনাথও পাল্টা কিল মেরে বললেন—'আহম্মক!'

নিজের নিজের পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে দুই বন্ধু বাড়িমুখো হলেন। আসল ভূত যারা আশেপাশে লুকিয়ে ছিল তারা মনে মনে বললে—আজি রজনীতে হয়নি সময়?

পরদিন কলেজে হুলস্থূল বেধে গেল। সমস্ত ব্যাপার শুনে প্রিন্সিপ্যাল ভয়ঙ্কর রাগ করে বললেন—'অত্যন্ত শেমফুল কাণ্ড। দু'জন নামজাদা। অধ্যাপক একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে হাতাহাতি! হরিনাথ তোমার লজ্জা নেই?'

হরিনাথবাবু ঘাড় চুলকে বললেন—'আজ্ঞে আমার উদ্দেশ্যটা ভালই ছিল। মহেশকে রিফর্ম করবার জন্য যদি একটু ইয়ে ক'রেই থাকি তাতে দোষটা কি—হাজার হোক আমার বন্ধু তো?'

মহেশবাবু গর্জন করে বললেন—'কে তোমার বন্ধু?'

প্রিন্সিপ্যাল বললেন—'মহেশ তুমি চুপ কর। উদ্দেশ্য যাই হোক, কলেজের ছেলেদের এর ভেতর জড়ানো একেবারে অমার্জনীয় অপরাধ। হরিনাথ তুমি বাড়ি যাও, তোমায় সাসপেণ্ড করলুম। আর মহেশ তোমাকেও সাবধান করে দিচ্ছি—আমার কলেজে ভুতুড়ে তর্ক তুলতে পারবে না।'

মহেশবাবু উত্তর দিলেন—'সে প্রতিশ্রুতি দেওয়া শক্ত। সকল রকম কুসংস্কার দূর করাই আমার জীবনের ব্রত।'

'তবে তোমাকেও সাসপেণ্ড করলুম।'

অন্যান্য অধ্যাপকরা চুপ করে সমস্ত শুনছিলেন। তাঁরা প্রিন্সিপ্যালের হুকুম শুনে কোনও প্রতিবাদ করলেন না, কারণ সকলেই জানতেন যে তাঁদের কর্তার রাগ বেশিদিন থাকে না।

মহেশবাবু তাঁর বাসায় ফিরে এলেন। হরিনাথের ওপর প্রচণ্ড রাগ—হতভাগা একটা গভীর তত্ত্বের মীমাংসা করতে চায় জুয়োচুরির দ্বারা! সে আবার ফিলসফি পড়ায়! এমন অপ্রত্যাশিত আঘাত মহেশবাবু কখনও পাননি।

মানুষের মন যখন নিদারুণ ধাক্কা খায় তখন সে তার ভাব ব্যক্ত করবার জন্য উপায় খোঁজে। কেউ-কাঁদে, কেউ তর্জন-গর্জন করে, কেউ কবিতা লেখে। একটা তুচ্ছ কোঁচবকের হত্যাকাণ্ড দেখে মহর্ষি বাল্মীকির মনে যে ঘা লেগেছিল তাই প্রকাশ করবার জন্য তিনি হঠাৎ দু-ছত্র শ্লোক রচনা করে ফেলেন—মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বম্ ইত্যাদি। তারপর সাতকাণ্ড রামায়ণ লিখে তাঁর ভাবের বোঝা নামাতে পেরেছিলেন। আমাদের মহেশ মিত্তির চিরকাল নীরস অঙ্কশাস্ত্রের চর্চা করে এসেছেন, কাব্যের কিছুই জানতেন না। কিন্তু আজ তাঁরও মনে সহসা একটা কবিতার অঙ্কুর গজগজ করতে লাগল। তিনি আর বেগ সামলাতে পারলেন না, কলেজের পোশাক না ছেড়েই বড় একখানা আলজেব্রা খুলে তার প্রথম পাতায় লিখলেন—

হরিনাথ কুণ্ড
খাই তার মুণ্ডু।

কবিতাটি লিখে বারবার ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখে আদি কবি বাল্মীকির মতন ভাবলেন, হাঁ, উত্তম হয়েছে।

কিন্তু একটা খটকা বাধল। কুণ্ডুর সঙ্গে মুণ্ডুর মিল আবহমান কাল থেকে চলে আসছে, এতে মহেশের কৃতিত্ব কোথায়? কালিদাসই হ'ন, আর রবীন্দ্রনাথই হন, কুণ্ডুর সঙ্গে মুণ্ডু মেলাতেই হবে—এ হ'ল প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। মহেশ একটু ভেবে ফের লিখলেন—

কুণ্ডু হরিনাথ,
মুণ্ডু করি পাত।

হাঁ, এইবার মৌলিক রচনা বলা যেতে পারে। মহেশের মনটা একটু শান্ত হল। কিন্তু কাব্যসরস্বতী একবার যদি কাঁধে ভর করেন তবে সহজে নামতে চান না। মহেশবাবু লিখতে লাগলেন—

হরিনাথ ওরে,
হবি তুই ম'রে
নরকের পোকা
অতিশয় বোকা।

উঁহু, নরকই নেই তার আবার পোকা। মহেশবাবু স্থির করলেন—কাব্যে কুসংস্কার নাম দিয়ে তিনি শীঘ্রই একটা প্রবন্ধ রচনা করবেন; তাতে মাইকেল রবীন্দ্রনাথ কাকেও রেহাই দেবেন না। তারপর তাঁর কবিতার শেষের চার লাইন কেটে নিয়ে ফের লিখলেন—

ওরে হরিনাথ,
তোরে করি কাত,
পিঠে মারি চড়—

এমন সময় মহেশের চাকরটা এসে বললে—'বাবু চা হবে কি দিয়ে? দুধ তো ছিঁড়ে গেছে।'

মহেশবাবু অন্যমনস্ক হয়ে বললেন—'সেলাই করে নে।'

পিঠে মারি চড়,
মুখে গুঁজি খড়।
জ্বেলে দেশলাই
আগুন লাগাই।

কিন্তু আবার এক আপত্তি। হরিনাথকে পুড়িয়ে ফেললে জগতের কোন লাভ হবে না, অনর্থক খানিকটা জান্তব পদার্থ বরবাদ হবে। বরং তার চাইতে—

হরিনাথ ওরে

পোড়াব না তোরে।
নিয়ে যাব ধাপা
দেব মাটি চাপা।
সার হয়ে যাবি
ট্যাড়স ফলাবি।

মহেশবাবু আরও অনেক লাইন রচনা করেছিলেন, তা আমার মনে নেই। কবিতা লিখে খানিকটা উচ্ছ্বাস বেরিয়ে যাওয়ায় তাঁর হৃদয়টা বেশ হালকা হ'ল, তিনি কাপড়-চোপড় ছেড়ে ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়লেন।

তিনদিন যেতে না যেতে প্রিন্সিপ্যাল মহেশ আর হরিনাথকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা আবার নিজের নিজের কাজে বহাল হলেন, কিন্তু তাঁদের বন্ধুত্ব ভেঙে গেল। সহকর্মীরা মিলনের অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনও ফল হ'ল না। হরিনাথ বরং একটু সন্ধির আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু মহেশ একেবার পাথরের মতন শক্ত হয়ে রইলেন।

কিছুদিন পরে মহেশবাবুর খেয়াল হ'ল—প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে একতরফা বিচার করাটা ন্যায়সঙ্গত নয়, এর অনুকূল প্রমাণ কে কে দিয়েছেন তাও জানা উচিত। তিনি দেশি বিলাতি বিস্তর বই সংগ্রহ করে পড়তে লাগলেন, কিন্তু তাতে তাঁর অবিশ্বাস আরও প্রবল হ'ল। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছুই নেই, কেবল আছে—অমুক ব্যক্তি কি বলছেন আর কি দেখেছেন। বাঘের অস্তিত্বে মহেশের সন্দেহ নেই, কারণ জন্তুর বাগানে গেলেই দেখা যায়। ভূত যদি থাকেই তবে খাঁচায় পুরে দেখ না বাপু। তা নয়, শুধু ধাপ্পাবাজি। প্রেততত্ত্ব চর্চা করে মহেশবাবু বেজায় চটে উঠলেন। শেষটায় এমন হ'ল যে ভূতের গুষ্টিকে গালাগাল না দিয়ে তিনি জলগ্রহণ করতেন না।

পড়ে পড়ে মহেশের মাথা গরম হয়ে উঠল। রাত্রে ঘুম হয় না, কেবল স্বপ্ন দেখেন ভূতে তাঁকে ভেংচাচ্ছে। এমন স্বপ্ন দেখেন বলে নিজের উপরও তাঁর রাগ হতে লাগল। ডাক্তার বললে—পড়াশুনা বন্ধ করুন, বিশেষ করে ঐ ভুতুড়ে বইগুলো—যা মানেন না তার চর্চা করেন কেন। কিন্তু ঐ সব পড়া মহেশের এখন একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পড়লেই রাগ হয়, আর সেই রাগই তাঁর সুখ।

অবশেষে মহেশ মিত্তির কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। দিন দিন শরীর ক্ষয়ে যেতে লাগল, কিন্তু রোগটা ঠিক নির্ণয় হ'ল না। সহকর্মীরা প্রায়ই এসে তাঁর খবর নিতেন। হরিনাথও একদিন এসেছিলেন, কিন্তু মহেশ তাঁর মুখদর্শন করলেন না।

সাত আট মাস কেটে গেল। শীতকাল, রাত দশটা। হরিনাথবাবু শোবার উদ্‌যোগ করছেন এমন সময় মহেশের চাকর এসে খবর দিলে যে তার বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন, অবস্থা বড় খারাপ। হরিনাথ তখনই হাতিবাগানে মহেশের বাসায়

ছুটলেন।

মহেশের আর দেরি নেই, মৃত্যুর ভয় নেই। বললেন—'হরিনাথ তোমায় ক্ষমা করলুম। কিন্তু ভেবো না যে আমার মত কিছুমাত্র বদলেছে। এই রইল আমার উইল, তোমাকে অছি নিযুক্ত করেছি। আমার পৈতৃক দশ হাজার টাকার কাগজ ইউনিভার্সিটিকে দান করেছি, তার সুদ থেকে প্রতি বৎসর একটা পুরস্কার দেওয়া হবে। যে ছাত্র ভূতের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লিখবে সে ঐ পুরস্কার পাবে। আর দেখ—খবরদার, শ্রাদ্ধ-ট্রাদ্ধ করো না। ফুলের মালা চন্দন-কাঠ ঘি এসব দিও না, একদম বাজে খরচ। তবে হ্যাঁ, দু-চার বোতল কেরোসিন ঢালতে পার। দেড় সের গন্ধক আর পাঁচ সের শোরা আনানো আছে, তাও দিতে পার, চটপট কাজ শেষ হয়ে যাবে। আচ্ছা, চললুম তা হ'লে।

রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা। মহেশের আত্মীয়স্বজন কেউ কলকাতায় নেই, থাকলেও বোধহয় তারা আসত না। বড়দিনের বন্ধ, কলেজের সহকর্মীরা প্রায় সকলেই অন্যত্র গেছেন। হরিনাথ মহা বিপদে পড়লেন। মহেশবাবুর চাকরকে বললেন পাড়ার জনকতক লোক ডেকে আনতে।

অনেকক্ষণ পরে দু'জন মাতব্বর প্রতিবেশী এলেন। ঘরে ঢুকলেন না, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—'চুপ ক'রে বসে আছেন যে বড়? সৎকারের ব্যবস্থা কি করলেন?'

হরিনাথ বললেন—'আমি একলা মানুষ, আপনাদের ওপরেই ভরসা।'

'ওই বেলেল্লা হতভাগার লাশ আমরা বইব? ইয়ার্কি পেয়েছেন নাকি!' এই কথা বলেই তাঁরা সরে পড়লেন।

হরিনাথের তখন মনে পড়ল, বড় রাস্তার মোড়ে একটা মাটকোঠায় সাইনবোর্ড দেখেছেন—বৈতরণী সমিতি, ভদ্রমহোদয়গণের দিবারাত্র সস্তায় সৎকার। চাকরকে বসিয়ে রেখে তখনই সেই সমিতির খোঁজে গেলেন।

অনেক চেষ্টায় সমিতি থেকে তিনজন লোক যোগাড় হ'ল! পনের টাকা পারিশ্রমিক, আর শীতের ওষুধ বাবদ ন' সিকে। সমস্ত আয়োজন শেষ হলে হরিনাথ আর তাঁর তিন সঙ্গী খাট কাঁধে নিয়ে রাত আড়াইটার সময় নিমতলায় রওনা হলেন।

অমাবস্যার রাত্রি, তার ওপর আবার কুয়াশা। হরিনাথের দল কর্নওয়ালিস স্ট্রিট দিয়ে চললেন। গ্যাসের আলো মিটমিট করছে, পথে জনমানব নেই। কাঁধের বোঝা ক্রমেই ভারি বোধ হতে লাগল, হরিনাথ হাঁপিয়ে পড়লেন। বৈতরণী সমিতির সর্দার ত্রিলোচন পাকড়াশি বুঝিয়ে দিলেন—এমন হয়েই থাকে, মানুষ ম'রে গেলে তার ওপর জননী বসুন্ধরার টান বাড়ে।

হরিনাথ একলা নয়, তাঁর সঙ্গীরা সকলেই সেই শীতে গলদঘর্ম হয়ে উঠল। খাট

নামিয়ে খানিক জিরিয়ে আবার যাত্রা।

কিন্তু মহেশ মিত্তিরের ভার ক্রমশই বাড়ছে, পা আর এগোয় না। পাকড়াশি বললেন—'ঢের ঢের বয়েছি মশাই, এমন জগদ্দল মড়া কখনও কাঁধে করিনি। দেহটা তো শুকনো, লোহা খেতেন বুঝি? পনের টাকায় হবে না মশায়, আরো পাঁচ টাকা চাই।'

হরিনাথ তাতেই রাজি, কিন্তু সকলে এমন কাবু হয়ে পড়েছে যে দু-পা গিয়ে আবার খাট নামাতে হ'ল। হরিনাথ ফুটপাথে এলিয়ে পড়লেন, বৈতরণীর তিনজন হাঁপাতে হাঁপাতে টানতে লাগল।

ওঠবার উপক্রম করছেন এমন সময় হরিনাথের নজর পড়ল—কুয়াশার ভিতর দিয়ে একটা আবছায়া তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এলে দেখলেন—কালো র‍্যাপার মুড়ি দেওয়া একটা লোক। লোকটি বললে—'এঃ আপনারা হাঁপিয়ে পড়েছেন দেখছি। বলেন তো আমি কাঁধ দিই।'

হরিনাথ ভদ্রতার খাতিরে দু-একবার আপত্তি জানালেন, কিন্তু শেষটায় রাজি হলেন। লোকটি কোন জাত তা আর জিজ্ঞাসা করলেন না, কারণ মহেশ মিত্তির ও-বিষয়ে চিরকাল সমদর্শী, এখন তো কথাই নেই। তাছাড়া যে লোক উপযাচক হয়ে শ্মশানযাত্রার সঙ্গী হয় সে তো বান্ধব বটেই।

ত্রিলোচন পাকড়াশি বললেন—'কাঁধ দিতে চাও দাও, কিন্তু বখরা পাবে না, তা ব'লে রাখছি।'

আগন্তুক বললে—'বখরা চাই না।'

এবার হরিনাথকে কাঁধ দিতে হ'ল না, তাঁর জায়গায় নতুন লোকটি দাঁড়াল। আগের চেয়ে যাত্রাটা একটু দ্রুত হ'ল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আর পা চলে না, ফের খাট নামিয়ে বিশ্রাম।

পাকড়াশি বললেন—'কুড়ি টাকার কাজ নয় বাবু, এ হ'ল মোষের গাড়ির বোঝা। আরও পাঁচ টাকা চাই।'

এমন সময় আবার একজন পথিক এসে উপস্থিত—ঠিক প্রথম লোকটির মতন কাল র‍্যাপার গায়ে। এও খাট বইতে প্রস্তুত। হরিনাথ দ্বিরুক্তি না ক'রে তার সাহায্য নিলেন। এবার পাকড়াশি মশায় রেহাই পেলেন।

খাট চলেছে, আর একটু জোরে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার ক্লান্তি। মহেশের ভার অসহ্য হয়ে উঠেছে, তার দেহে কিছু ঢোকেনি তো? খাট নামিয়ে আবার সবাই দম নিতে লাগল।

কে বলে শহুরে লোক স্বার্থপর? আবার একজন সহায় এসে হাজির, সেই কালো র‍্যাপার গায়ে। হরিনাথের ভাববার অবসর নেই, বললেন, চল চল।

আবার যাত্রা, আরও একটু জোরে। তারপর ফের খাট নামাতে হ'ল। এই যে চতুর্থ বাহক এসে হাজির, সেই কালো র‍্যাপার। এরা কি মহেশকে বইবার জন্যই

এই তিন পহর রাতে পথে বেরিয়েছে? হরিনাথের আশ্চর্য হবার শক্তি নেই, বললেন—'ওঠাও খাট, চল জলদি।'

চারজন অচেনা বাহকের কাঁধে মহেশের খাট চলেছে, পিছনে হরিনাথ আর বৈতরণী সমিতির তিন জন। এইবার গতি বাড়ছে, খাট হনহন করে চলছে। হরিনাথ আর তার সঙ্গীদের ছুটতে হ'ল।

আরে অত তাড়াতাড়ি কেন, আস্তে চল। কেই বা কথা শোনে! ছুট-ছুট। 'আরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ, থাম থাম, বিডন স্ট্রিট ছাড়িয়ে গেল যে। লোকগুলো কি শুনতে পায় না? ওহে পাকড়াশী, থামাও না ওদের? কোথায় পাকড়াশি? তিনি বিচক্ষণ লোক, ব্যাপারটা বুঝে টাকার মায়া ত্যাগ করে সদলে পালিয়েছেন।

মহেশের খাট তখন তীর বেগে ছুটছে, হরিনাথ পাগলের মতন পিছু পিছু দৌড়চ্ছেন। কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, গোলদীঘি, বউবাজারের মোড়—সব পার হয়ে গেল। কুয়াশা ভেদ করে সামনের সমস্ত পথ ফুটে উঠেছে—এ পথের কি শেষ নেই? রাস্তা কি ওপরে উঠেছে না নীচে নেমেছে? একি আলো না অন্ধকার? দূরে ও কি দেখা যাচ্ছে—সমুদ্রের ঢেউ, না চোখের ভুল?

হরিনাথ ছুটতে ছুটতে নিরন্তর চিৎকার করছেন—'থাম, থাম।' ও কি, খাটের ওপর উঠে বসেছে কে? মহেশ? মহেশই তো। কি ভয়ানক। দাঁড়িয়েছে, ছুটন্ত খাটের উপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। পিছন ফিরে লেকচারের ভঙ্গীতে হাত নেড়ে বলছে?

দূর-দূরান্তর থেকে মহেশের গলার আওয়াজ এল—'হরিনাথ—ও হরিনাথ—ওহে হরিনাথ—'

'কি, কি? এই যে আমি।'

'ও হরিনাথ—আছে, আছে, সব আছে, সব সত্যি—'

মহেশের খাট অগোচর হয়ে এল, তখনও তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে—'আছে আছে....'

হরিনাথ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে ওয়েলস্‌লি স্ট্রিটের পুলিস তাঁকে দেখতে পেয়ে মাতাল বলে চালান দিলে। তাঁর স্ত্রী খবর পেয়ে বহু কষ্টে তাঁকে উদ্ধার করেন।

.

বংশলোচনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'গয়ায় পিণ্ডি দেওয়া হয়েছিল কি?'

'শুধু গয়ায়! পিণ্ডিদানখাঁ-এ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোন ফল হয়নি, পিণ্ডি ছিটকে ফিরে এল।'

'তার মানে?'

'মানে—মহেশ পিণ্ডি নিলেন না, কিংবা তাঁকে নিতে দিলে না।'

'আশ্চর্য! মহেশ মিত্তিরের টাকাটা?'

'সেটা ইউনিভার্সিটিতে গচ্ছিত আছে। কিন্তু কাজ কিছুই হয়নি, ভূতের বিপক্ষে প্রবন্ধ লিখতে কোনও ছাত্রের সাহস নেই। এখন সেই টাকা সুদে-আসলে প্রায় পঁচিশ হাজার হয়েছে। একবার সেনেটে প্রস্তাব ওঠে টাকাটা প্রত্নবিভাগের জন্য খরচ হোক। কিন্তু ছাদের ওপর এমন দুপদাপ শব্দ শুরু হলো যে সব্বাই ভয়ে পালালেন। সেই থেকে মহেশফান্ডের নাম কেউ করে না।'

হানাবাড়ির খপ্পরে

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

বাগবাজারে গোবর্ধনের বাড়িতেই আড্ডাটা আমাদের প্রায় জমতো। গোবর্ধন বড়লোক নয়, অতি সামান্য গৃহস্থ। একটি ছোটখাট কারখানা চালায় আর চালায় এই আড্ডা। সদাহাস্যময় রোগা ছিপছিপে মানুষ, আপনজনদের দেশে রেখে একটি বন্ধুর বাড়ির বৈঠকখানা ভাড়া নিয়ে সে থাকে এবং সেই বৈঠকখানায় আড্ডা দিতে আসে হরেক রকমের মানুষ।

বড় রাস্তার ঠিক ধারেই ঘরখানি। সন্ধে হতে না হতেই গোবর্ধন ধুনো গঙ্গাজল দিয়ে আড্ডার উদ্বোধন করে, তারপর একে একে লোক জমায়েত হতে থাকে। সেখানে আসে গাইয়ে, বাজিয়ে, উকিল, ব্যবসাদার, ডাক্তার ও আরও নানান ধরনের লোক। বৈঠকখানার একটি কোণে চায়ের জল চড়ানোই থাকে, মাঝে মাঝে আড্ডাধারীদের পয়সায়, মাঝে মাঝে বা গোবর্ধনের খরচায় চা, মুড়ি, বেগুনি, ফুলুরি আসে, আর সেই বস্তুগুলির সদ্ব্যবহার করতে করতে দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। গোবর্ধনের সময় সময় চায়ের খরচ বেড়ে যায় কিন্তু তাতে তার দুঃখ নেই—পাঁচটা লোক এসে তার ভাঙা তক্তাপোষে বসে যে গল্প গুজব করে যায় এতেই তার আহ্লাদ ধরে না। কোনদিন লোকসমাগম কম হলে সে রাস্তা দিয়ে একটু চেনা-মুখ দেখলে তাকে ধরে এনে বৈঠকখানায় বসায়, চা দেয় ও একটু আড্ডা দিয়ে নেয়।

আষাঢ়ের সন্ধে তার ওপর আবার ছুটির দিন, টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে—ঘরের মধ্যে কুণ্ডুমশাই তাঁর নেয়াপাতি ভুঁড়িটি নিয়ে ভূপাল ঘোষালের সঙ্গে গীতার চর্চা করছেন—

কেষ্ট আর মাখনলাল পাড়ার কবরেজ মশায়ের সঙ্গে একজন সিনেমা-শিল্পীর পেটের অসুখ হতে ক'জন ডাক্তার এসে সারাদিন তার বাড়িতে বসেছিল, তাই নিয়ে তর্ক জুড়ে দিয়েছে—গোবর্ধন চা করছে, এমন সময় বৃদ্ধ সন্তোষবাবু সেখানে ছাতি নিয়ে ঢুকলেন।

সন্তোষবাবু প্রবেশ করতেই সকলে আলোচনা বন্ধ করে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ব্যস্ত হওয়ার কারণ ছিল। সন্তোষবাবু এলে আড্ডাটা জমতো খুব, যেহেতু সন্তোষবাবু এমন সব উদ্ভট খবর আনতেন যা কেউ বিশ্বাস করতো না মোটেই, কিন্তু মজাদার বলে সেগুলো শুনতে ভাল লাগতো সবারই। নবাগত কোন লোক এলে কিন্তু তার পক্ষে বিভ্রান্ত হয়ে পড়া ছাড়া উপায় ছিল না,

কারণ সন্তোষবাবুর হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, গাম্ভীর্য ও প্রাচীন বয়সের একটা ব্যক্তিত্ব লোককে বুঝতেই দিত না যে, বক্তা যা বলেছেন তা সবই গাঁজাখুরি গল্প, এর মধ্যে সত্যের ভাগ আদৌ আছে কিনা সন্দেহজনক। বিশ্বাস না করলেও সময় সময় অবিশ্বাস্য ব্যাপার শুনতে ভাল লাগে এবং তাতে আড্ডাও জমে ওঠে। তাই আড্ডার একটি স্তম্ভ ছিলেন এই ভদ্রলোক।

তবে সময় সময় সন্তোষবাবু এমন মাত্রাতিরিক্ত আজগুবি কাহিনী ফাঁদতেন যা শুনলেই বোঝা যেত ডাহা বাজে এবং এটি সন্তোষবাবুর স্ব-কপোলকল্পিত। কিছুদিন আগে তখন আসামে নাগাদের খুব উৎপাত চলছে, সেই সময় একদিন অতি গম্ভীর মুখে সন্তোষবাবু আড্ডায় প্রবেশ করলেন। গোবর্ধন জিজ্ঞেস করলে, কি ব্যাপার কি সন্তোষবাবু? আজ এত গম্ভীর কেন?

সন্তোষবাবু চেয়ারে গা এগিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, আর গম্ভীর, অবস্থা খুব গুরুতর। নাগারা বোধহয় এসে পড়লো!

কেষ্ট জিজ্ঞেস করলে, কোথায় আসছে মশাই, আসামে?

সন্তোষবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলে উঠলেন, আসামে হলে তো বাঁচা যেত, খাস কলকাতায় পাকিস্থানীদের নিয়ে ঢুকে পড়বার চেষ্টা করছে, সাত আট দিনের মধ্যে যে কি হবে বোঝা যাচ্ছে না।

কুণ্ডুমশাই তাকিয়া ঠেস দিয়ে এতক্ষণ বসেছিলেন। সন্তোষবাবুর কথা শুনে একটু মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, খবরটা কি টেলিগ্রামে আপনাকে কেউ দিয়ে গেছে?

সন্তোষবাবু বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, টেলিগ্রামে কেন দেবে, খাস্ মিলিটারি ডিপার্টমেণ্টের খবর মশাই। গভর্ণমেণ্ট খুব ভাবিত হয়ে পড়েছে।

কুণ্ডুমশাই সে কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন। তাই দেখে সন্তোষবাবু চটে বলে উঠলেন, আচ্ছা মশাই, হাসছেন হাসুন, ব্যবসাদার মানুষ তাই আপনার সবেতে অবিশ্বাস, কিন্তু বুঝবেন ঠেলা—যখন দেবে এসে নাগারা খোঁচা, তখন গাঁ গাঁ করে চেঁচাতে থাকবেন। ঐ নেয়াপাতি ভুঁড়ি নিয়ে আর গদিতে বসতে হবে না, পিটিয়ে অর্ধেক করে দিয়ে যাবে।

কুণ্ডুমশাই প্রত্যুত্তরে ঠাট্টা করে তখুনি বলে উঠলেন, যাক্, আপনি আছেন যখন তখন আমার আর ভয় কি? মিলিটারি নিয়ে এসে আমার যেটুকু থাকবে সেটুকুকে একটু তদারকি করে বাঁচিয়ে দেবেন। আর কারুর ওপর তো নির্ভর করতে পারবো না, আপনার ভরসাতেই থাকবো।

কথাটা শুনে কেষ্ট আর ভূপাল হেসে উঠল। আর যায় কোথা, সন্তোষবাবু ক্ষেপে, যাবার সময় শুধু 'আচ্ছা' বলে বেরিয়ে গেলেন। গোবর্ধন চায়ের পেয়ালা নিয়ে ছুটে এসে বললে, ও দাদা, চা-টা খেয়ে যান, এর মধ্যে যাচ্ছেন কোথায়?

ততক্ষণে সন্তোষবাবু রাস্তার অর্ধেক চলে গেছেন। দূর থেকে হাত নেড়ে

জানিয়ে দিলেন যে, ও জিনিস খাবার ইচ্ছা তাঁর নেই। তারপর আর দিন পনেরো তিনি আড্ডায় আসেননি। সম্ভবতঃ নাগারা না আসাতে তিনি মনে মনে খুবই দাগা পেয়েছিলেন।

কিন্তু একবার যিনি আড্ডাধারী হয়েছেন তিনিই জানেন যে আড্ডার মোহ ছাড়া কী কঠিন! সন্তোষবাবুও বাড়িতে বসে থাকতে পারলেন না—বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়লেন। তিনি আসতেন অনেক দূর থেকে, কিন্তু আষাঢ়ের এই বর্ষার সন্ধ্যায় আড্ডা ছেড়ে বাড়িতে পড়ে থাকা মানে নির্বাসনের সামিল, তাই চৌরঙ্গীর কাছাকাছি জায়গা থেকে বাগবাজারের দূরত্বটা বেশি ঠেকলো না, তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

সন্তোষবাবুকে আসতে দেখে কুণ্ডুমশাই সেদিন একটু অধিক আপ্যায়ন শুরু করলেন, বললেন, বসুন বসুন সন্তোষবাবু, নতুন কি খবর আছে বলে ফেলুন।

নাগাদের প্রসঙ্গ পাছে উঠে পড়ে সেই জন্যেই বোধহয় সন্তোষবাবু একেবারে ভিন্ন লাইনের কথা পেড়ে বসলেন। চোখ দুটি বড় করে বললেন, মশাই, আজ একটা আশ্চর্য ঘটনার কথা শুনে এলাম। আমাদের পাশের বাড়িতে একটি বৌ হঠাৎ মালকোচা মেরে তার শ্বশুর, দেওর আর স্বামী তিন তিনটে ষণ্ডাকে ঘুষি মেরে শুইয়ে দিয়েছে! হৈ হৈ কাণ্ড! ঘোমটা দেওয়া বাড়ির বৌ তার গায়ে হঠাৎ অসুরের শক্তি কি করে এলো রে বাবা! পাড়া প্রতিবেশী সবাই ছুটে এলো, আমাদের বাড়ির ছেলেগুলোও গিয়েছিল, তারা এসে বললে, বাবাঃ, তার কাছে এগোয় কার সাধ্যি, অনবরত হিন্দি বলছে আর তাল-ঠুকে সকলকে চ্যালেঞ্জ করছে, আও হামারা সাথ কোন্ লড়ে গা আও, একদম জানমে খতম্ কর দেগা! তাই শুনে ডিগ্‌ডিগেগুলো সবাই পালিয়েছে, এখন সাতটা জোয়ান এসে তাকে কোনমতে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে বটে, কিন্তু চিৎকারে লোকের কান ঝালাপালা হবার উপক্রম!

গোবর্ধন টিয়া পাখির মত নাকটি নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছিল। খবর শুনে তার নাক খেঁদা হয়ে যাবার যোগাড়। সে হাঁ করে বলে উঠলো, বলেন কি?

কুণ্ডুমশাই, ভূপাল ঘোষাল, দেবেন উকিল—সবাই খবরটা শুনে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলেন। সন্তোষবাবু বলে চললেন, এখন পুলিস, ডাক্তার সব এসেছে, কেউ কিছু করতে পারছে না।

ভূপাল ঘোষাল বললে, বোধ হয় পাগল হয়ে গেছে হঠাৎ। পাগলদের গায়ে বায়ুর প্রকোপে খুব জোর হয় শুনেছি।

সন্তোষবাবু বিরক্ত সুরে বলে উঠলেন, দূর তোর্ পাগল—একটা বৌ পাগল হলে বাড়ির লোক সামলাতে পারতো না?

কুণ্ডুমশাই হেসে বলে উঠলেন, একটা স্ক্রু আল্‌গা থাকলে সামলানো মুস্কিল, তার ওপর যদি আবার বৌয়ের মাথা খারাপ হয় তাহলে তো সাতগুষ্টির কেউ

সামলাতে পারবে না!

সন্তোষবাবু প্রতিবাদ করে বলে উঠলেন, আরে মশাই পাগল নয়, পাগল নয়, ভূতে ধরেছে। শোনা গেল বাড়ির পাশে একটা পোড়ো বাড়ির উঠোন আছে, সেইখানে আগে নাকি কুস্তির আখড়া ছিল। বৌটা জানতো না, দুপুরবেলায় সেখানে ঘর ঝাঁট দিয়ে জঞ্জাল ফেলেছিল, তারপরই এই ব্যাপার! কোন্ বেটা পালোয়ান ভূত কাঁধের ওপর চেপে বসেছে।

ভূপাল বলে উঠলো, যত সব বোগাস্ ব্যাপার! ভূতে ধরেছে না ছাই—হিস্টিরিয়া-টিস্টিরিয়া হবে।

সন্তোষবাবু কথাটায় আহত হয়ে বলে উঠলেন, আমি জানি, আমি বললেই সেটা বোগাস ব্যাপার বলে আপনারা উড়িয়ে দেবেন, কিন্তু এ আর অপরের মুখ থেকে উড়ো খবর শুনে আসা নয়, খাস্ আমার বাড়ির পাশে স্বচক্ষে দেখে-আসা খবর, একে বোগাস বলেন তো আমি আর কি বলবো? বিশ্বাস না হয়, আমার সঙ্গে গিয়ে দেখবেন চলুন, মেয়েছেলে কি চোখ পাকিয়ে, এক একটা রদ্দায় সবাইকে কাৎ করে ফেলছে!

কুণ্ডুমশাই হঠাৎ সন্তোষবাবুকে সমর্থন করে বলে উঠলেন, না, আজকের ঘটনাটা অবিশ্বাস করবার মত নয় ভূপাল—এ রকম হতে পারে। ভূতের ভর হলে অতি প্যাংলা লোকও থরহরি কাঁপিয়ে দিতে পারে! বৌটাকে হয়তো ভূতেই ধরেছে।

ভূপাল তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে উঠলো—ধূর ভূত-ফূত সব বাজে। ভূত যদি থাকেও তা হলে সে কখনও মানুষের অনিষ্ট করতে পারে না—কারণ তোমার আমার মত দেহ ধারণের ক্ষমতা ভগবান তাকে দেননি।

সন্তোষবাবু একটু উষ্ণস্বরে বললেন, দেহ ধারণ না করেও তারা অন্য দেহের ভেতর ঢুকতে পারে না বলছেন?

ভূপাল নির্বিকারভাবে বললে, আমার তাই ধারণা! ভূত মানেই মনের ভুল। চিরকালের সহজাত সংস্কার থেকে মানুষের মনে ভয়ের উৎপত্তি হয়, তাই থেকে মানুষের মনে নানা প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে। লোকে সেইটেকেই ভূতে ধরেছে-টরেছে বলে। আসলে ওটা মনের একটা বিকৃত অবস্থা।

গোবর্ধন এতক্ষণ কোন কথা কয়নি—সে কিন্তু এবার বলে উঠলো, না ভাই ভূপাল, মনের অবস্থার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই, কারণ আমি কয়েকটা ঘটনা জানি যা নিছক ভূতের ব্যাপার।

ভূপাল চায়ের একটা পেয়ালায় খানিকটা চা ঢেলে নিয়ে বলে উঠলো, ও আমিও অনেক জানি—বলি নিজে কখনও ভূত দেখেছ?

—না তা দেখিনি, তবে অতি বিশ্বাসী লোকের মুখে শুনেছি, তাঁরা নিজেরা দেখে এসে বলেছেন।

ভূপাল বললে, থাম, ঐ কথাই সবাই বলে, কেউ নিজের চোখে কিছুই দেখেনি, শুধু শুনেই এসেছে।

এরপর কুণ্ডুমশাই নিজের এক ভৌতিক দর্শনের গল্প করলেন। কবরেজ মশাইও একটি ছাড়লেন, কিন্তু অবিশ্বাসী ভূপাল ঘোষাল গল্পগুলো মন দিয়ে শুনলেও মুখ টিপে টিপে যে ভাবে হাসতে লাগল, তাতে বেশ বোঝা গেল যে ও কারুর গল্পই ঠিকমত বিশ্বাস করছে না। কিন্তু ভূতের গল্প শুরু হলে আর থামে না, তার ওপর বাদলার দিনে সন্ধেবেলায় শুরু হলে তার জের অনেকক্ষণ টেনে নিয়ে যেতে শ্রোতা ও বক্তার বেশ ভালই লাগে। গল্প যখন খুব জমে উঠেছে ঠিক এই সময় দীনেশবাবু বলে আমাদের এক পুরোনো বন্ধু সেখানে প্রবেশ করলেন, তাঁর সঙ্গে এলেন একজন কোট প্যাণ্ট পরিহিত প্রৌঢ় ভদ্রলোক, অতি সৌম্যমূর্তি ও লম্বা-চওড়া মানুষটি।

পরিচয়ে জানা গেল ভদ্রলোক দীনেশবাবুর খুবই পরিচিত একজন ডাক্তার, দক্ষিণ কলিকাতায় থাকেন, এইদিকে কোন বৈষয়িক কাজে এসেছিলেন হঠাৎ দীনেশবাবু আমাদের আড্ডাটাকে দেখাবার জন্যে তাঁকে জোর করে টেনে এনেছেন।

দীনেশবাবু আলাপ করিয়ে দিতেই সকলে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলে। গোবর্ধন একটা চেয়ার টেনে এনে তাঁকে বসিয়ে চা দিলে, দীনেশবাবুও তক্তাপোষের একধারে আসন গ্রহণ করলেন।

যে প্রসঙ্গ চলছিল সেটা আগন্তুকের সামনে চালানো ঠিক সঙ্গত হবে কি হবে না ভাবতে ভাবতে সবাই চুপ করে গেলেন। কিন্তু দীনেশবাবুই একটা সিগারেট ধরিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন, কি, সবাই চুপচাপ হয়ে গেলেন কেন—আমি ডাক্তার মুখার্জিকে নিয়ে এলুম আমাদের বাগবাজারের আড্ডা দেখাতে—আর সেই আড্ডাধারীরাই চুপ হয়ে গেল।

গোবর্ধন সহাস্য বদনে বলে উঠলো, না এই আজেবাজে ভূতের গল্প হচ্ছিল, আপনারা আসতে—

গোবর্ধনকে কথা শেষ না করতে দিয়েই দীনেশবাবু বলে উঠলেন, আরে এ তো খুব ভাল বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, থামলে কেন চালাও।

সেই সময় ভূপাল হঠাৎ বলে বসলো, না, না ও-সব কি আজেবাজে কথা, ঐ নিয়ে শুধু সময় নষ্ট করে লাভ নেই, তার চেয়ে পলিটিক্স আলোচনা ঢের ভাল। সময় না কাটলেই লোক ভূতের গল্প করে বুঝছেন না?

দীনেশবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, ভূপাল, তুমি ভূত বিশ্বাস কর না মোটেই?

ভূপাল সহাস্যে বললে, বিলকুল—না।

দীনেশবাবু ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে একবার চেয়ে বলে উঠলেন—এ বলে কি মশাই! আপনার সেই কাহিনী শুনলে তো এরা থ হয়ে যাবে!

ডাক্তার মুখার্জি ও-প্রসঙ্গ চাপা দেবার অভিপ্রায়ে বলে উঠলেন, না, না ও বিশ্বাস না-করাই ভাল, কেন আবার ও-সব আলোচনা? অন্য বিষয়ই চলুক না।

দীনেশবাবু বললেন, না মশাই, এরা ভূত বিশ্বাস করে না এ তো মেনে নিতে পারা যায় না। আপনি অন্ততঃ তা স্বীকার করবেন না নিশ্চয়?

ডাক্তার মুখার্জি একটু চিন্তিতভাবে বলে উঠলেন, দেখুন, ভূত সত্যি আছে কি নেই ঠিক বুঝি না। বিজ্ঞান ও যুক্তি বলে ও-সব চোখের ভ্রম, কিন্তু আবার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখি উল্টো এক রহস্য। হয় তো ভুলই হবে—কে জানে, ও সত্যি একটা মিস্ট্রি। যাক্ ও প্রসঙ্গ থাক্।

ডাঃ মুখার্জির কথা বলার ধরনে সকলেই বুঝতে পারলে একটা কি ব্যাপার তিনি চেপে যেতে চাইছেন। তাছাড়া দীনেশবাবু ঘরে ঢুকেই বলেছিলেন যে, সে ব্যপার শুনলে 'থ' হয়ে যাবে, সে কথা শোনা অবধি সবারই কৌতূহল বেড়ে উঠেছিল খুব।

কুণ্ডুমশাই, সন্তোষবাবু, গোবর্ধন মায় ভূপাল ঘোষাল পর্যন্ত যখন ডাক্তারবাবুকে সেই কাহিনী বলার জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু করে দিলে, তখন ডাঃ মুখার্জি বাধ্য হয়ে সেই কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন। ডাঃ মুখার্জি বললেন, দেখুন, ভূত আমি কোনদিনই বিশ্বাস করতুম না, আজও যে পুরোপুরি করি তাও নয়, তবে আমার জীবনে এমন একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল, যার হদিস আমি আজও পাইনি এবং যার জন্যে আমার জীবনের মহামূল্য কয়েকটা বছর খেসারত দিতে হয়েছিল।

সকলে উদগ্র আগ্রহে ডাঃ মুখার্জির মুখের দিকে চেয়ে তাঁর কাহিনী শুনতে লাগলেন। সমস্ত ঘরটায় তখন বেশ থম্‌থমে ভাব। ওদিকে ঘরের বাইরেও চেপে বৃষ্টি আসাতে পরিবেশটা আরও জমাটি হয়ে উঠল। ডাঃ মুখার্জি বলতে লাগলেন—

বছর পনেরো কুড়ি আগে মেডিকেল কলেজ থেকে আমি পাস করে বেরিয়েছিলুম এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই ডাক্তার হিসেবে সুনামও অর্জন করেছিলুম, তাই রোগীর সমাবেশ আমার কর্মজীবনের প্রথম অধ্যায় থেকেই বেশ ভালোভাবে শুরু হল। দিবারাত্রি নানান ধরনের রোগী নানা ব্যাধি নিয়ে আমার কাছে আসতো এবং আমি তাদের যথাসাধ্য রোগমুক্তির জন্যে চেষ্টা করতুম।

বোধহয় নিরাময় সংখ্যা বেশি হওয়াতেই সকাল সন্ধ্যে নানাস্থান থেকে আমার ডাক আসতো। অনেক সময় বাধ্য হয়ে বলে দিতে হত যে যাবার সময় হবে না, আপনারা অন্য কোন চিকিৎসককে ডাকুন। তাতে লোকে ক্ষুণ্ণ হত ঠিকই, কিন্তু উপায় ছিল না।

সকলে বলে উঠলো, বটেই তো!

ডাক্তারবাবু আবার বলতে শুরু করলেন, আমার বাড়ি আর ডিসপেনসারি ছিল ভবানীপুরে—বিকেল বেলায় রোগী দেখে রাত আটটার মধ্যেই সেখানে ফিরে

আসতুম, তারপর ঘণ্টাখানেক ঐখানে রোগী দেখে ন'টা সাড়ে ন'টায় ওপরে চলে যেতুম আর নামতুম না। এই ছিল সাধারণতঃ প্রাত্যহিক নিয়ম—খুব জরুরি কেস থাকলে অবশ্য দেরি হয়ে যেত বা রাত্রিতেও বেরুতে হত, কিন্তু সে কালেভদ্রে।

একদিন এমনি বর্ষা, তবে সারাদিনই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, ডাক্তারখানায় রোগীর সংখ্যাও বেশি নয়, সাড়ে আটটার মধ্যেই কাজ চুকে গেল—ডিসপেনসারি থেকে কম্পাউণ্ডারকে সকাল সকাল ছুটি দিয়ে বলে দিলুম, তুমি যাও, আজ আর এখন কেউ আসবে না মনে হচ্ছে।

কম্পাউণ্ডার চলে গেল—সেদিনের খবরের কাগজটা একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে ওপরে উঠে যাব ভেবে আমি কাগজটা পড়ছি, এমন সময় হঠাৎ একটা লোক ডিসপেনসারির বাইরেতে দাঁড়িয়ে আমায় ডেকে বললে, ডাক্তারবাবু একটু দয়া করে যদি আমাদের বাড়ি আসেন বড় ভাল হয়—আমার এক আত্মীয় মর-মর, কোন ডাক্তারকে পাচ্ছি না, একবার চলুন।

বাইরে যেখানে লোকটি দাঁড়িয়েছিল সেখানটায় আলো তত স্পষ্ট ছিল না, লোকটিকে বললুম, ভেতরে এসে বসুন, কি ব্যাপার আগে শুনি, তারপর যাওয়ার কথা হবে'খন।

লোকটি অনুনয় করে বললে, তার একটা পা খোঁড়া। বেশি উঁচু নিচু করলে কষ্ট হয়, তাই তাকে মাপ করতে হবে—নেহাৎ বিপদে পড়েই সে আমার কাছে ছুটে এসেছে। আমার কি মনে হলো,—ড্রাইভারকে ডেকে গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করতে বললুম। লোকটি বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলো।

গাড়ি এসে দাঁড়াতেই—লোকটি সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসলো। আমি চাকরকে ডিসপেনসারি বন্ধ করতে বলে গাড়ির পেছনে গিয়ে বসলুম। গাড়ি স্টার্ট দিলে জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় যেতে হবে?

লোকটি বললে, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড। গাড়ি সেই দিকেই এগিয়ে চললো। যেতে যেতে পাশ থেকে লোকটির মুখ দেখে আমি শিউরে উঠলুম। এ কি বিশ্রী চেহারা—মানুষের এ রকম চেহারা হতে পারে এ আমার ধারণার বাইরে ছিল! তাই তো, এই কদর্য লোকটার কথা শুনে যাওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে, গাড়িটাকে ঘোরাতে বলবো নাকি, ইত্যাদি নানা কথা আমার মনে হতে লাগলো, আবার সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলও হল, দেখা যাক না কি হয়!

সন্তোষবাবু এই সময়ে বলে উঠলেন—ওঃ, আপনার সাহস আছে মশাই, রাত্তিরে একটা অপরিচিত লোকের সঙ্গে এইভাবে যাওয়া খুব বাহাদুরির কথা!

ডাক্তারবাবু একটু হেসে বললেন, দেখুন আমরা ডাক্তার মানুষ—মানুষ বিপদে পড়েছে শুনলে মনটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। যদি সময়মত গেলে একটা প্রাণ বেঁচে যায়, এই ভাবনাটাই তখন বেশি হয়। তাছাড়া বরাবরই আমার সাহস ছিল খুব। গভীর রাত পর্যন্ত কতদিন একা কলেজে মড়া নিয়ে কাটাকাটি করেছি, কোন ভয়

হয়নি—রাত্রে কত অন্ধকার ঘরে মুমূর্ষু রোগীকে দেখতে গেছি, চোখের সামনে কত মৃত্যু হয়েছে, তবু ভয় পাইনি কোনদিন। তবে আজকের মত ডাক কোনদিনই আসেনি—বিশেষত একেবারে একটা অপরিচিত জায়গা থেকে, আর এই রকম রাতে।

গোবর্ধন চোখ বড় বড় করে বলে উঠলো, তার ওপর আবার ঐ বিকট মূর্তির সঙ্গে যেতে হচ্ছে।

ডাক্তারবাবু বললেন, হ্যাঁ, তা যা বলেছেন—তবে আমার মনের জোরটা ছিল খুব, সেই জন্যে ওকেও গ্রাহ্যের মধ্যে আনলুম না। চুপচাপ বসে রইলুম গাড়িতে।

তখন বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে এত বাড়ি ছিল না—অধিকাংশ জায়গায় ছিল ডোবা আর জঙ্গল—দূরে দূরে বড় বড় লোকের এক-একটা বাড়ি—তাও রাস্তার ওপরে নয়, সামনে অনেকখানি ছাড়া জায়গার পর। রাস্তার আলো এত দূরে দূরে যে হেডলাইট জ্বালিয়ে ছাড়া গাড়ি নিয়ে এগোনো মুস্কিল।

জনহীন অন্ধকার পথ দিয়ে ঘুরে ঘুরে একটা বাগানের সামনে লোকটা গাড়ি রাখতে বলে নামলে। আমিও তার পিছু পিছু চলতে লাগলুম। বললুম, এখানে আলো-টালো নেই দেখছি। লোকটি শুধু অস্ফুট স্বরে জবাব দিলে 'হুঁ!'

আমার কিন্তু তখন মনটা বেশ দমে গেছে। ভাবলুম তাই তো লোকটার সঙ্গে রাত্রিবেলায় এসে বোধহয় ভাল করলুম না—কি জানি ওর মনে কি আছে? গুণ্ডা, ডাকাতও হতে পারে— অবশ্য দু' একজন আক্রমণ করলে পালাতে পারবো, কিন্তু অজানা জায়গায় রাতের অন্ধকারে যদি বেশি লোক আসে তাহলে? পকেট হাতড়ে দেখলুম একটা ছুরি আছে আর আছে একটা টর্চ। তাড়াতাড়ি দুটো জিনিসই দু'হাতে বাগিয়ে ধরে টর্চটা জ্বেলে ফেললুম, কিন্তু দুর্ভাগ্য এমনি যে তার ব্যাটারির শক্তি প্রায় নিঃশেষিত হয়ে এসেছে তখন—অতি মিট্‌মিট্ করে আলো বেরুতে লাগল তা থেকে—তাই জ্বালিয়ে লোকটির অনুসরণ করলুম।

বাগানের শেষ প্রান্তে একটি জীর্ণ প্রকাণ্ড বাড়ি, কিন্তু সমস্ত চুপচাপ—একটা আলোও জ্বলছে না কোথাও। তখন আমার সত্যি কেমন গা-টা ছমছম করতে লাগল—যাক্, দেখি কতদূর কি হয় বলে সেই লোকটাকে অনুসরণ করতে করতে একটা প্রকাণ্ড ভাঙা সিঁড়ির সামনে এসে পড়লুম।

নির্বাক সঙ্গীটি অন্ধকারেই তর তর করে ওপরে দোতলায় উঠে গেল, আমি টর্চের ক্ষীণ আলোয় ধীরে ধীরে পা ফেলে ওপরে উঠে গিয়ে একটা বারান্দার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। বারান্দার মধ্যিখানে একটা হলঘরের দরজা—মনে হল সেই প্রকাণ্ড হলটার শেষদিকে মিট্ মিট্ করে একটা পিদ্দিম জ্বলছে, আর তারই পাশেতে একজন কে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে প'ড়ে আছে। যাই হোক সেই রোগী কি না—কে জানে!

আবার মনে হ'ল খুন-টুন হয়নি তো? শেষকালে আমাকে ফ্যাসাদে ফেলবার

জন্যে হয় তো কোন ষড়যন্ত্র করে নিয়ে এসেছে—এ তো মহা বিপদে পড়লুম! কি করি তখন, ভেবে পাচ্ছি না—বর্ষার ঝিম্ ঝিম্ শব্দ ছাড়া মানুষের কণ্ঠের একটি আওয়াজও কোথাও নেই—আর লোকটি যে দোতলায় উঠে কোথায় গেল তারও কোন হদিস পেলুম না। তখন আমার শরীরে কুল্ কুল্ করে ঘাম দেখা দিয়েছে—কিন্তু তবু জোর মনে সাহস আনবার চেষ্টা করছি, আর ডাকছি, ও মশাই কোথায় গেলেন? ও মশাই....?

কোন সাড়া নেই কারুর। ঠিক এই সময় আবার টর্চের আলোটুকুও নিভে গেল। আমি তখন বুঝতে পারছি না যে এটা স্বপ্ন দেখছি না, বিংশ শতাব্দীতে কলকাতার এক প্রান্তে একটি ভাঙা বাড়িতে অসহায় নির্বান্ধব অবস্থায় একমাত্র একটি জীবিত মানুষ আমি দাঁড়িয়ে আছি।

সমস্ত শরীর তখন ঠক্ ঠক্ ককের কাঁপছে। কেবল মনে হচ্ছে চতুর্দিক থেকে যেন অশরীরী মানুষরা চাপা সুরে ফিসফাস কথা কইতে কইতে চলে যাচ্ছে। আবার তারপরেই মনে হল—দূর এসব মনের ভুল, নিজের মনের ভয়ের ছায়া—আসলে কোন দুষ্টু লোকের পাল্লায় পড়েছি আমি, তবু একবার ডাক দিই। ডাক দিলুম, কিন্তু সে লোকটা কোন সাড়া দিল না। আমার গলার আওয়াজ শুনে হলঘরের মধ্যে সেই কম্বল ঢাকা লোকটি শুধু ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, ডাক্তারবাবু এসেছেন, আসুন এখানে, আমায় একটু দেখে যান তো।

মানুষের কণ্ঠের সেই ক্ষীণ আওয়াজ পেয়ে আমি যে কী স্বস্তি পেলুম তা বলতে পারি না। সমস্ত ভয় আমার নিমেষে দূর হয়ে গেল। মনে হল ঐ অসহায় রোগীই আমার আজকের দিনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু।

দ্রুতপদে আমি হলঘরের প্রদীপের কাছে এগিয়ে গিয়ে রোগীর সামনে দাঁড়িয়ে দেখলুম লোকটি আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে, এর ভেতর থেকে কি করে কথা বললে তাও তো বুঝছি না। কাছে কোন বসবার টুল বা চেয়ার ছিল না, উবু হয়ে বসে জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে আপনার, বলুন তো?

কম্বলের ভেতর থেকে একটু বিকৃত স্বরে আওয়াজ এল, কি হয়েছে জানি না—একবার নাড়িটা দেখুন তো, বলেই সে একটি শীর্ণ হাত কম্বলের পাশটা থেকে বাড়িয়ে দিলে।

আমি তখনও বিশেষ লক্ষ্য করিনি যে, যে-হাতটি ধরতে যাচ্ছি সেটি কী!

কিন্তু হাত ধরেই আমি চমকে উঠে পিদ্দিমের আলোয় দেখলুম, এ কার হাত? এ যে কঙ্কাল—শুধু চর্মহীন সাদা সাদা হাড়ের আঙুল আর কব্জি আমার দিকে তুলে ধরেছে।

ব্যস!—সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে আমি সেইখানেই পড়ে গেলুম। তার পরের ঘটনাগুলি কিছুই জানি না, সবই অপরের মুখ থেকে শোনা।

কাহিনী শুনে সবার নিঃশেষ বন্ধ হয়ে আসবার উপক্রম হল। কিন্তু তারপর কি

হল? সবারই ঐ এক প্রশ্ন।

ডাক্তারবাবু বললেন, তারপর আমি তো সেইখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছি, ওদিকে আমার ড্রাইভার শিউশরণ আমাকে এক ঘণ্টার মধ্যেও আসতে না দেখে খুব চঞ্চল হয়ে উঠলো। তাই তো এ রকম তো কখনও হয় না। ডাক্তারবাবু অন্ধকারে এই বাগানের মধ্যে তাহলে কোথায় গেলেন!

এই ভাবতে ভাবতে অবশেষে সে পাশের একটি বড় বাড়িতে গিয়ে সমস্ত ব্যাপার খুলে বললে। সে বাড়ির লোকেরা বললে, তোমার মনিব পাশের ঐ ভাঙা বাড়িতে যেতেই পারেন না, ও বাড়ি বহুদিন ধরে তালা-দেওয়া পড়ে আছে—বাড়িতে দুটো খুন হয়, তাই ওর ভাড়াও জোটেনি, অতএব ডাক্তারবাবু ওখানে যাননি অপর কোথাও গেছেন, তুমি বিলকুল ভুল দেখেছ। ও হানাবাড়িতে ডাক্তারবাবু যাবেন কেন? শিউশরণ হলপ করে বললে, ডাক্তারবাবু ঐখানেই গেছেন। আমার গাড়ি ঐ বাগানের গেটে রয়েছে, আপনারা দেখবেন চলুন। সকলে তার কাকুতি-মিনতি শুনে দশ বারোজন চাকর দারোয়ান নিয়ে দু-তিনটে বড় টর্চ জ্বালিয়ে সেইখানে গেল। গিয়ে দেখলে সত্যিই তো বাড়িতে তালা দেওয়া নেই, দরজা খোলা পড়ে রয়েছে। তখন তারা একটু অবাক হয়েই সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেল।

হলঘরে ঢুকেই তারা দেখলে আসবাবহীন শূন্য সেই কক্ষে শুধু আমি একা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছি। এরপর আমায় ধরাধরি করে সকলে বাড়ি নিয়ে আসে। শুনেছি তিন চারদিন আমার কোন জ্ঞানই ছিল না।

তারপর ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এলেও প্রায়ই আমি অজ্ঞান হয়ে যেতুম। তারও কিছুদিন পরে ভাল হয়ে উঠলেও আমার স্মৃতিশক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। বাইরে থেকে সুস্থ দেখালেও মনে মনে কি রকম অস্বস্তি বোধ করতুম, কিন্তু কাউকে কিছু না বলে চুপচাপ থাকতুম।

এখানকার চিকিৎসকেরা দেখে ফতোয়া দিলেন যে মেলাঙ্কোলিয়া বা বিষাদ রোগে ভুগছি আমি—কাজকর্ম আবার শুরু করলেই ধীরে ধীরে ভাল হয়ে যাব। সকলে আমায় ডাক্তারখানায় বসবার জন্যে জেদ করতে লাগলো, কিন্তু আমার সেখানে বসবার আর ইচ্ছে হল না। বাড়িতে আমার এক ভাইপো তখন সবে ডাক্তারি পাশ করেছে—সে বললে, কাকা চল তোমাতে আমাতে রুগী দেখবো। তার কথায় বাধ্য হয়ে ডাক্তারখানায় আমি সকালবেলায় বসে রুগী দেখতে লাগলুম, কিন্তু কোন প্রেস্‌ক্রিপশান লিখতুম না।

একদিন সে কোথায় বেরিয়ে গেছে, তখন দু'জন রুগী বুকের অসুকের চিকিৎসা করতে আমার কাছে এল। আমি পরীক্ষা করে তাদের দু'জনকে প্রথমে একটা মিকশ্চার খাবার জন্যে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিয়ে বললুম, কম্পাউণ্ডারকে এই প্রেসক্রিপশান দেখান, দিয়ে দেবে।

রুগীরা প্রেসক্রিপশান নিয়ে কম্পাউণ্ডারকে দিয়ে এল, বললে একটু পরে ওষুধ নিয়ে যাবে। তারপর আরও কয়েকজন রুগীকে দেখে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলুম। খানিকক্ষণ পরে কম্পাউণ্ডার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে আমায় পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে বললে, ডাক্তারবাবু আপনি এ কি করছেন! প্রত্যেকটি খাবার ওষুধের সঙ্গে যে সব ওষুধ মিশিয়ে দিতে বলেছেন সেগুলি তো প্রত্যেকটি সাংঘাতিক বিষ! এ কি ক'রে দেওয়া যায়?

তখন আমি আরও ভয় পেয়ে গেলুম—কি যে করবো বুঝতে পারলুম না। কম্পাউণ্ডার তখন আমার ভাইপোর ফিরে না-আসা পর্যন্ত রুগীদের ওষুধ দিতে পারবো না বলে জানিয়ে দিলে। তারা তখনকার মতো বিদায় নিয়ে চলে গেল।

এরপর থেকে আমায় আর ডিসপেনসারিতে বসতে দেওয়া বোধহয় কারুরই সঙ্গত মনে হল না।

আমায় ভিয়েনায় পাঠিয়ে দেবার জন্যে বাড়ির সকলে মতলব করলে এবং আমার ভাইপো কোন এক বিখ্যাত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে আমাকে সেখানে নিজে গিয়ে রেখে দিয়ে এল।

তিন বছর ধরে সেখানকার একজন সুবিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তারের পর্যবেক্ষণে ও চিকিৎসাধীনে আমি রইলুম। তিনি শেষের এক বছর আমাকে নিয়ে রুগী দেখতে বেরোতেন ও প্রেসক্রিপশান লিখতে বলতেন। ঠিক ঠিক লিখলে তিনি খুব উৎসাহ দিতেন আমায়। তারপর তিনি আমাকে প্রকৃত রোগমুক্ত করে ছেড়ে দিলেন—আশ্চর্য! স্মৃতিশক্তিও আমার ধীরে ধীরে ফিরে এল।

আবার চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করলুম—আজও করছি। তবে রাত্রে পরিচিত লোক এসে ডাকলেও আমি আর সহজে যাই না—যদিও বা যেতে হয় তখন সঙ্গে লোক নিই।

সকলে হাঁ করে ডাক্তারবাবুর এই অলৌকিক কাহিনী যেন গিলছিল। ডাক্তারবাবু থামতে ভূপাল অনুসন্ধিৎসু হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, এটা কি সম্পূর্ণ ভৌতিক ব্যাপার বলে আপনি মনে করেন?

ডাক্তারবাবু বললেন—কি যে এ ব্যাপার তা আজও বুঝতে পারিনি মশাই, তবে এ ব্যাপার নিতান্ত সত্য আর আমার জীবনে ঘটেছে তারও প্রমাণ আপনারা আমার বাড়ির লোকের কাছ থেকে শুনতে পারেন—শিউশরণ ড্রাইভারও রয়েছে, সেও অনেকটা বলতে পারে। ....এ ভৌতিক কিনা জানি না তবে অলৌকিক।

দীনেশবাবু এই সময় বলে উঠলেন—যাক ভাই, এ নিয়ে আর তোমরা বেশি মাথা ঘামিও না, শেষকালে তোমাদেরও হয় তো ভিয়েনায় যেতে হতে পারে।

সকলে হেসে উঠলো। বাইরে তখন বৃষ্টি ধরে গেছে।

ডাক্তারের সাহস

প্রবোধকুমার সান্যাল

বরাহনগর জায়গাটার নাম সকলেই জানে। কলকাতার উত্তরে মাইল দুয়েক গেলেই বরাহনগর। আজকাল শ্যামবাজার থেকে মোটর-বাসে যাওয়া যায়—আগে যেতে হত হেঁটে কিংবা 'শেয়ারের' গাড়িতে। শেয়ারের গাড়ি ছাড়ত কোম্পানির বাগানের মোড় থেকে, এক-একজনের চার আনা ভাড়া। কলকাতায় যাতায়াত করতে গেলে এ ছাড়া আর উপায় ছিল না।

বরানগরের বড় রাস্তার দু'ধারে তখন কলকারখানা, মুটে-মজুর, দোকান-বাজার, পাট আর ভূষিমালের আড়ৎ—এইসবের ভিড় ছিল বেশি। এদের ধারে ধারে শ্রমিকদের বস্তিগুলো দেখা যেত। দিনের বেলায় পথে সোরগোল, হৈ-চৈ, গরুর গাড়ির দল, জন-মজুরের হল্লা, মালগাড়ির আমদানি-রপ্তানি, এমনকি মারামারি পর্যন্ত লেগে থাকত। কিন্তু সন্ধে হলেই তাদের আর চিহ্ন পর্যন্ত নেই, পথ হয়ে যেত নির্জন মরুভূমি, রাতের বেলা সে পথে হেঁটে যাওয়াও নিরাপদ ছিল না; মাঝে মাঝে এক-আধটা কুকুর কেবল ডাকতে ডাকতে চলে যেত। অনেক অসতর্ক পথিক নাকি অনেকদিন রাতে এই পথে গুণ্ডাদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছে।

ভদ্রলোক কয়েকজন যে পাড়ায় থাকতেন, সে পাড়াটা গঙ্গার কাছাকাছি। তাঁরা স্টিমারে কলকাতায় আনাগোনা করতেন। সকালের দিকে বেরোতেন, আবার ফিরে আসতেন দিনের আলো থাকতে। তার একটা কারণ ছিল। যে পথটা দিয়ে তাঁরা পাড়ার ভিতরে ঢুকতেন, সেই পথের দক্ষিণদিকে একটা প্রকাণ্ড পুরানো বাড়ি অনেকদিন থেকে পড়ে ছিল, এবং সেই বাড়ির ধার দিয়ে সন্ধ্যার পর হেঁটে যাওয়া তাঁরা উচিত মনে করতেন না। বাড়িটা এখানকার পূর্বকালের জমিদার বংশের। এখন সে জমিদারও নেই, তাদের আগেকার ঐশ্বর্যও নেই— কেউ মরে গেছে, কেউ গেছে ছেড়ে। কিন্তু এই অট্টালিকা এখনো তার ভগ্ন দেহ নিয়ে অতীতকালের স্থবির প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাড়িটা জনহীন, নানা আগাছায় পরিপূর্ণ বাদুড় আর চামচিকের বাসা, শেয়াল আর সাপের অবাধ লীলাভূমি। শুধু তাই নয়, লোকের বিশ্বাস এ বাড়িতে নাকি কোনো কোনো গভীর রাত্রে মানুষের কান্না শোনা যায়। আগেকার সেই জমিদারের দুইটি মেয়ে নাকি গলায় দড়িয়ে দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। অর্থাৎ এ বাড়ির অন্দর-মহলে ভূত আছে।

ভূতের কথা শুনলে আর রক্ষা নেই। ভগবানের চেয়ে ভূতকে ও-পাড়ার লোক

বেশি মানে আর ভয় করে। সুতরাং অন্ধকার হলে ও-পথ দিয়ে আর কেউ হাঁটে না।

কিন্তু চাটুজ্যেদের জামাই এ-সব আজগুবি কথা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। তিনি নতুন ডাক্তারি পাশ করেছেন। কুস্তী-করা দেহ, বিশাল তাঁর বুকের ছাতি, শিলং পাহাড় থেকে সেদিন একটা প্রকাণ্ড বাঘ শিকার ক'রে এনেছেন। তাঁর ভয়ানক সাহস। ভূত-টূত তিনি গ্রাহ্য করেন না।

বড়দিন উপলক্ষে তিনি শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে এসেছেন। এ-পাড়ার সকলের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় হয়েছে, সবাই তাঁকে ডাক্তার বলে ডাকে।

ছেলে-ছোকরাদের দলে তাঁর নাম-ডাক খুব। একদিন ভূতের বাড়ির আলোচনায় তিনি উৎসাহভরে বললেন—যদি একটা রাত আমি ও-বাড়িতে কাটিয়ে আসতে পারি, তাহলে তোমরা আমাকে কি খাওয়াবে?

ছেলেরা অবাক হ'য়ে বললে,—একটা রাত? আপনি বলেন কি ডাক্তারবাবু? দু'ঘণ্টার বেশি যদি আপনি থাকতে পারেন, তবে কি বলেছি।

ডাক্তার প্রথমটা হেসেই অস্থির। তারপর বললেন—কত বাজি ধরবে বলো।

ছেলেরা বললে—বাজি? আপনি যা চাইবেন ফিরে এলে পাবেন।

—আচ্ছা সেই ভালো।

কথাটা ছড়িয়ে পড়তে দেরি হলো না। পাড়ার বিজ্ঞ লোকেরা এসে বাধা দিয়ে বললেন—অল্প বয়সে আমরাও জল চিবিয়ে খেয়েছি কিন্তু ভূতকে মেনেছি চিরকাল। তুমি ও-বাড়িতে যেয়ো না, বাবা। একটা ভালোমন্দ ঘটলে তখন—

ডাক্তার হেসে বললেন—আমাদের জাতের অবনতির একটা কারণ, আমাদের ভূতের ভয়।

—আমাদের কথা তবে শুনবে না?

—আজ্ঞে না।

শ্বশুরবাড়ির সকলে কান্নাকাটি ক'রে অস্থির। এমন সর্বনেশে ডাকাত-জামাই তাদের না হলেই ভাল ছিল। ডাক্তার বললেন—আমাকে যদি আপনারা বাধা দেন, তাহলে ভবিষ্যতে আপনাদের সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

শাশুড়ি বললে—বাঁচলে তো সম্পর্ক! সম্পর্ক যাক্ বাবা, তুমি প্রাণে বেঁচে থাকো।

ডাক্তার কোনো কথা শুনলেন না। তাঁর বন্দুক আছে, কুকুর আছে, দেহে অপরিসীম শক্তি আছে—তাঁর ভয় কি? সকলের বাধা-নিষেধ অগ্রাহ্য করে তিনি প্রস্তুত হতে লাগলেন।

সেদিন ছিল অমাবস্যা। ডাক্তার কোট-প্যাণ্ট পরে বন্দুক হাতে নিয়ে টর্চটা পরীক্ষা করে হেসে বললেন—রেডি।

রাত তখন দশটা বাজে। পাড়ার ছেলেরা দল বেঁধে লাঠিসোঁটা হাতে নিয়ে

সোরগোল করে একবার সেই প্রকাণ্ড বাড়িটার ভিতরে তন্ন তন্ন করে দেখে এল। শীতের দিন, সুতরাং বিছানা এবং আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রও দিয়ে আসা হলো। বড় একটা ঘড়ি রইল টেবিলের ওপর; একটা জলের কুঁজো আর কাচের গেলাস, একটা লাঠি। এবং বলা বাহুল্য, কার্বাইডের একটা উজ্জ্বল আলো। টমি—চিরবিশ্বস্ত টমি ছিল সঙ্গে সঙ্গে। কুকুরটা প্রকাণ্ড, বাঘ শিকার করতে সাহায্য করে।

দশটার পরে একসঙ্গে সবাই বিদায় নিলে। তারা তখন এই বাড়ির ভয়ানক অন্ধকার গহ্বর থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। কেউ আর কোনোদিকে তাকাতে সাহস করলে না—পাছে কিছু বিভীষিকা তাদের চোখে পড়ে যায়। ডাক্তার যে একা এই জনহীন অন্ধকার প্রাসাদের মধ্যে নির্বাসিত হয়ে রইলেন, এবং তাঁর ভাগ্যে যে কিছু একটা ঘটবেই, এই কথা ভাবতে ভাবতে সবাই যে যার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল।

ঘরের দরজা-জানালা ডাক্তার একে একে সব বন্ধ করে দিলেন। কোথাও আর এতটুকু ফাঁক নেই, বাইরে বাতাস জোরে বইলেও আর কোথাও শব্দ হবে না। চারদিক নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ। এই বিশাল অট্টালিকার বাইরে যে রাস্তাঘাট আছে, লোকালয় ও মানুষ আছে, কর্ম-কোলাহলময় জগৎ আছে তা কিছুই বোঝবার উপায় নেই। এখানে শত শত মানুষের মৃত্যু ঘটলেও কেউ কোনোদিন জানতেও পারবে না। অমাবস্যার অন্ধকার যেন এই প্রেতপুরীকে উদরসাৎ করেছে।

ঘড়িটায় টিক্ টিক্ শব্দ হচ্ছে। এগারোটা বাজল। নিজের নিঃশ্বাসটা যে ইতিমধ্যে কখন ভারী হয়ে উঠেছে ডাক্তার বুঝতে পারেননি। পাঁচজনে আগে থাকতে ভয় দেখিয়ে দিয়েছে, তাই এই দুর্বলতা। মনে হল, ঘড়িটায় যেন আরো একটু আস্তে শব্দ হলে ভাল হয়। ওটা ভয়ানক জীবন্ত, অবাধ্য। বিছানার ওপর বসে ডাক্তার একবার এদিক-ওদিক তাকালেন। দেওয়ালগুলো জীর্ণ, তার গায়ে নানারকম আঁকিবুঁজি কাটা—অনেকটা যেন মানুষের কঙ্কালের মতো।

খুট্ খুট্—

ডাক্তার চমকে ফিরে তাকালেন। না, কেউ নয়,—বাতাসের শব্দ। না, বাতাসের নয়—বোধহয় কোনো পোকামাকড়ের আওয়াজ। কিন্তু কোন্ দিকে? জানালায় না দরজায়?

খট্ খট্—

কে ধাক্কা দিল দরজায়? টমি মুখ তুলে তাকালে। একবার সে একটু গোঁ গোঁ করে উঠল, সে যেন বাঘের সন্ধান পেয়েছে। না, কেউ নয়—বাতাস। পুরানো দরজা, বাতাসে একটু নড়ে বৈকি। টমি তার প্রভুর কোলের কাছে আবার মুখ নিচু করে পড়ে রইল। ডাক্তার হাত বুলিয়ে দেখলেন, তাঁর বন্দুকটা ঠিক আছে কিনা। নিজের হাতটা যেন সহজে আর নড়তে চাইছে না। কেমন যেন মনে হতে লাগল, নিজের ওপর কর্তৃত্ব তিনি হারিয়ে ফেলছেন। তবু অনেক চেষ্টায় তিনি গায়ে ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

চোখ বন্ধ করবার চেষ্টা করলেও কিন্তু পলক পড়ছে না, চোখের তারা যেন স্থির হয়ে গেছে, পাথরের মতো প্রাণহীন। ঘড়িটা টিক্ টিক্ করছে। ওটা যেন জীবন্ত মানুষের মাথা, যেন ওর চোখ কান নাক আছে, ডাক্তারের দিকে চেয়ে হাসছে। প্রেতের মতো হাসি। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল দেওয়ালের গায়ে। ও কি? দেওয়ালের সেই আঁকিবুঁজি, সেই মানুষের কঙ্কালটা নড়ছে কেন? ডাক্তারের বুকের ভিতরকার রক্ত জমাট বেঁধে এল। কঙ্কালের গায়ে মাংস লাগছে একটু একটু করে। হাত, পা, বুক, মাথা, মুখ। উজ্জ্বল আলোয় সেই কঙ্কাল বিরাট দানবের চেহারা নিয়ে দেওয়ালে উঠে দাঁড়াল। এবার হাত বাড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে।

হাত বাড়িয়ে ডাক্তার বন্দুকটা ধরবার চেষ্টা করলেন কিন্তু হাত উঠল না। কই, বন্দুকটা তো তাঁর কাছে নেই? কে নিলে? ডাক্তারের গলাটা কে টিপে ধরেছে! স্বর নেই, চীৎকার নেই, নিঃশ্বাস নেই। তিনি নড়বার চেষ্টা করলেন কিন্তু সম্ভব হলো না, খাটের সঙ্গে তাঁকে বেঁধে দিয়েছে।

ডাক্তার জ্ঞান হারাননি, খুব সাহসী লোক তিনি। চেয়ে দেখলেন আশ্চর্য, জলের, কুঁজোটা ঘরের মেঝের ওপর পায়চারি করে বেড়াচ্ছে, কাচের গেলাসটা দুটো ডানা মেলে প্রজাপতির মতো উড়ছে। হ্যাঁ, এইবার ডাক্তার একটু ভয় পেয়েছেন। ভয়ে তাঁর রোমকূপগুলো আর্তনাদ করে উঠল।

খট্ খট্ খট্—

কিসের শব্দ? কই, টমি তো আর গোঁ গোঁ করে উঠল না? ডাক্তার প্রাণপণে টমির গায়ে একটা চিমটি কাটলেন; এত জোরে যে টমির গায়ের মাংস খানিকটা তাঁর আঙুলে ছিঁড়ে উঠে এল। কিন্তু কই, টমি তো জাগল না? তবে? তবে? বেঁচে আছে তো? টমি বেঁচে নেই, তার নিঃশ্বাস পড়ছে না, তার সর্বশরীরে এক বিন্দু প্রাণ নেই—ম'রে সে কাঠের মতো পড়ে রয়েছে। এ-পাশে বন্দুক নেই, ও-পাশে টমি নেই।

ঘড়িটায় আর টিক্ টিক্ শব্দ হচ্ছে না, সেটা থেমে গেছে। কে দিলে থামিয়ে? টেবিলটা এইবার নড়ে উঠল, পায়া চারটে ছড়িয়ে নাচতে লাগল। টমি, টমি? টমি বেঁচে নেই—বাঁ হাতের কাছে তার মৃতদেহ অসাড়, অচেতন। জলের কুঁজোটা ঘুরছে, কাচের গেলাসটা উড়ছে, টেবিলটা নাচছে। আর—আর সেই দানবটা হাসছে তাঁর দিকে চেয়ে।

হঠাৎ সশব্দে দরজা-জানালাগুলো খুলে গেল। ডাক্তার শিউরে উঠলেন। কারা ঢুকছে ঘরে? বড় বড় মাথা, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল,—পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারের মতো। মানুষ নয়, দানব নয়—এরা যেন আরো বিচিত্র। গভীর রাত্রির অন্ধকারে এরা এসেছে কঙ্কালটার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে।

আলো কই, আলো? কার্বাইডের আলোটা যেন পাগলের মতো ঘরের চারদিকে ছুটছে। কে তাঁকে তাড়া করেছে, কিন্তু পালাতে পারছেন না, যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্

করছেন। যারা ঘরে ঢুকেছে তারা নিঃশ্বাস ফেলছে, দ্রুত নিঃশ্বাস, ঝড়ের মতো তার শব্দ।

ডাক্তারের সর্বাঙ্গ হিম হয়ে এল। তিনি কেঁদে ওঠবার চেষ্টা করলেও পারলেন না। গলা তাঁর বন্ধ, হাত-পা বন্দী, চোখ দুটো অচেতন। দেখতে দেখতে সেই দানবের হাতখানা তাঁর মাথার দিকে এগিয়ে এল। আস্তে আস্তে মাথাটা ছুঁয়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল, মাথার সব চুলগুলো দাঁড়িয়ে উঠেছে।

আঃ আঃ—খাটখানা কে নাড়ছে! ডাক্তার আবার চীৎকার করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেই হিংস্র প্রেতের দল তাঁর বুকের ওপর চেপে বসেছে—তাঁকে নিয়ে শূন্যে উঠতে লাগল। ডাক্তারের মাথাটা ঘুরছে! টমি, টমি? টমি ম'রে গেছে কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, টমির মুখটাও দানবের মতো বদলে গেছে, টমি নখর বিস্তার করে তাঁর দিকে মুখব্যাদন করে এগিয়ে আসছে।

বিশ্বাসঘাতক! তোমার এই কাজ?

টমি-দানব হেসে উঠল। ধারালো দাঁত দিয়ে ডাক্তারের পাঁজর কামড়ে ধরল।

খাটখানা শূন্যে উঠছে। মহাশূন্যের ঘন অন্ধকার দেশে। আরো—আরো উঁচুতে দানবের দেশে তাঁকে নিয়ে যাবে, ভূত-প্রেতের রহস্য রাজ্যে উর্ধ্বদেশে খাটখানা উড়ে যাচ্ছে, দূরে,—ওই যা, তাদের হাত থেকে খাট খ'সে গেল! ডাক্তার বেগে নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছেন, হয়ত কোনো মহাসমুদ্রের জলে তিনি আছাড় খেয়ে পড়ে তলিয়ে যাবেন। গেল, গেল,—

ডাক্তারবাবু, ও ডাক্তারবাবু?

দরজায় ধাক্কা পড়তেই ডাক্তারের ঘুম ভাঙল। বুকটা ধড়ফড় করছে! চোখ চেয়ে দেখলেন, সকালের আলো জানালা-দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতরে এসে পড়েছে! সর্বশরীর তাঁর তখনো কাঁপছে। ডাক্তার চেয়ে দেখলেন, সব ঠিক আছে। সেই আলো, ঘড়ি, টেবিল, কুঁজো ও গেলাস, তাঁর বন্দুক আর টমি। গলার আওয়াজ দিয়ে তিনি বললেন—যাই হে, দাঁড়াও।

দুই বন্ধু

বুদ্ধদেব বসু

নাঃ, ঘুম পাচ্ছে—বর্বর ঘুম। হাত শিথিল, কলম চলে না, মন ঝাপসা। তার মন যেন গোধূলি, সেখানে কোনো রেখা নেই, সব থমথমে, মস্ত কালো থমথমে মেঘের মতো ঝুলে আছে—ঘুম। যেমন সন্ধ্যায় মশা, পোকা, বাদুড় ছিটকে-ছিটকে উড়ে বেড়ায়, তেমনি তার মনের মধ্যে ধূসরভাবে নড়ে বেড়াচ্ছে কবিদের নাম, কবিতার লাইন, পড়ার স্মৃতি—এতদিন ধরে যা কিছু পড়েছে, শুনেছে, ভেবেছে, তার চাপা, একটানা, অর্থহীন ঝিঁঝির মতো আওয়াজ। অসম্ভব তাদের এখন স্পষ্ট করে তোলা। অসম্ভব কোনো এক লক্ষ্যের দিকে চিন্তার সিঁড়ি গড়ে তোলা ঘুম। ঘুমোতেই হবে। আর পরীক্ষা তো এসে গেল।

খাতা বন্ধ করে উঠতে যাবে, এমন সময় ঘুমের চেয়েও ভারি চাপে তার শরীর অবশ হয়ে এলো। ঘরে আর-একজন আছে, আর-একজন এসেছে। দরজার ধার থেকে আস্তে এগিয়ে আসছে তার দিকে, খুব আস্তে, যেন অতি কষ্টে, আর একেবারে, একেবারে নিঃশব্দে। সুকুমারের ঘুম ছুটে গেল মুহূর্তে, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ফিরে এলো; যদিও একটু আঙুল নাড়ার ক্ষমতাও সে খুঁজে পেল না নিজের মধ্যে, বিদ্যুৎবেগে সে অনেক কিছুই দেখে ফেললো। লোকটি চোর নয়, গুণ্ডা নয়—দেখেই বোঝা যায়। পায়ে কার্পেটের চটি, ধবধবে কোঁচানো ধুতি পরণে, গিলে-করা মিহি পাঞ্জাবি, আর পাঞ্জাবির ওপরে এক অতি ম্লান যুবকের মুখ বসানো। দেখে ভয় পাবার কিছু নেই, কিন্তু সেটাই সবচেয়ে ভয়ের। লোকটি এমন সুসজ্জিত ধীর নিঃশব্দ আর পরিপাটি যে সত্যি সে কোনো 'লোক' কিনা সেটাই সন্দেহ করা যায়। যেন পুতুল, যেন যন্ত্র, কোনো জাদুকর চালাচ্ছে।

মেঝের কয়েক গজ পার হ'তে যতটুকু সময় লাগল এই অতিথির সুকুমারের সেটা মনো হলো অনন্তকাল। সে চ্যাঁচাতে চাইল, গলা বন্ধ; উঠতে চাইল, পায়ে যেন শেকল বাঁধা। অবশেষে দেখতে পেল তার টেবিলের পাশের ইজি-চেয়ারটিতে 'লোকটি' বসে আছে। এত হালকা হয়ে বসেছে, এত কম জায়গা নিয়ে, যেন তার শরীরের কোন ওজন নেই। আর কী ফ্যাকাসে তার মুখ।

ক্ষীণ আওয়াজ শুনল, 'ভয় পেলে নাকি?'

সুকুমার কথা শুনে একটু আশ্বস্ত হলো, কিন্তু জবাব জোটাতে পারল না। তার জিভ তখনও কাঠ।

'ভয় নেই। নির্জনে থাকি আমরা, একটু কথা বলতে এলাম।'

'আমরা' শুনেই সুকুমার ব্যাপারটা বুঝে ফেললো। স্বপ্ন দেখছে? না সত্যি? ঘুমিয়ে আছে? না জেগে? সত্যি ভয় পাবার কিছু নেই? না, ভয় কিসের। কী করতে পারে আমাকে ঐ....ঐ...।

'কথা বলতে এলাম। কিন্তু আসা কি সহজ? অনেক, অনেক, অনেক চেষ্টায়—তুমি কলেজে পড়ো?'

'তা পড়ি বলা যায়', এতক্ষণে আওয়াজ ফিরে পেল সুকুমার।

'বলা যায়, মানে? হয় পড়ো, নয়—পড়ো না—এর মাঝামাঝি কিছু তো নেই।'

'আমি এবার এম.এ. পরীক্ষা দিচ্ছি।'

'ও, এম.এ. দিচ্ছো। কোন সাবজেক্টে?'

'বিষয়টার নাম কম্প্যারেটিভ লিট্‌রেচার।'

'কী বললে? কম্-প্যা-রে-টিভ...সে আবার কী?'

'নতুন হয়েছে।'

'তা ব্যাপারটা কী? কী পড়তে হয়?'

'এই—সাহিত্য আর কি...নানা দেশের সাহিত্য। বলতে পারো বিশ্ব সাহিত্য।' সুকুমার থামল, কিন্তু নিজের নতুন জ্ঞানের একটু নমুনা দেবার লোভ সামলাতে পারল না শেষ পর্যন্ত—'নানা দেশের সাহিত্য না-পড়লে তো কোনো দেশের সাহিত্যই বোঝা যায় না।'

'নানা দেশের সাহিত্য? অনেক অলৌকিক গল্প পড়ো তাহ'লে?'

'অলৌকিক মানে?'

'মানে—দেহ থেকে মুক্ত হ'য়ে আত্মা কোথায় যায়, কী করে, এই সব কথা। মানে—আমি এখন যে অবস্থায় আছি, সেই অবস্থার বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা। এ সব পড়ো না?'

সুকুমার স্থির চোখে তাকালো এই অদ্ভুত আগন্তুকের দিকে। না, আমরা যাকে শরীর বলি তার কোনো চিহ্ন নেই, ফাঁপা একটা আকৃতি শুধু, যেন কাগজে তৈরি, নাক-চোখ-মুখ সবই আছে, কাপড়-চোপড়ও দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ও-সবের পেছনে কোনো বাস্তব নেই যেন, এক ঝাপটা হাওয়া এলেই ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে যাবে। বেচারার জন্য কষ্ট হলো সুকুমারের—কষ্ট হলো এ-কথা ভেবে যে একে এক পেয়ালা চা খাইয়েও সুখী করা যাবে না—খাদ্য, পানীয়, বিশ্রাম, জ্ঞান—কিছুরই আর প্রয়োজন নেই এর।'

'জবাব দিচ্ছো না যে?'

'ও—হ্যাঁ। তা পড়েছি বইকি কিছু-কিছু।'

'হ্যামলেট?'

'ও আর কে না পড়েছে।' একটু ঠাট্টার হাসি ফুটলো সুকুমারের ঠোঁটে। 'আমি দশ বছর বয়সে প্রথম পড়েছিলাম।'

'দান্তে?'

'পড়েছি।'

'কী মনে হয়েছে তোমার?'

'কোন বিষয়ে?'

'দান্তের পাপীদের বিষয়ে। কখনো কি মনে হয়েছে যে সব ধাপ্পা, বুজরুকি, ওপর-চালাকি?

'মানে?'

'যারা দেহ থেকে মুক্ত হয়েছে তাদের আবার শারীরিক শাস্তি দেবে কেমন ক'রে? তাদের কি মাথা আছে যে মাথা ফাটিয়ে দেবে? চোখ আছে যে পাতার ফাঁকে পোকা ঢুকিয়ে দেবে? নাক আছে যে যন্ত্রণা দেবে দুর্গন্ধ ছিটিয়ে? না কি মাংসপেশী আছে যে আগুনের হ্রদে ডুবিয়ে রাখবে? কাকে খাওয়াবে ডালকুত্তা দিয়ে? কাকে ভাজবে গরম তেলে? কার গলা থেকে বের করবে আর্তনাদ? সে তো অনেক আগেই ভস্ম হয়ে গেছে, বা মিশে গেছে মাটির তলায়, মাটির মধ্যে। এ-সব কথা ভেবেছো কখনো?'

'এ তো তুমি গীতা বলছো। নতুন কিছু না।'

'গীতা? ঐ আর-একটি অতিকায় ধাপ্পা, বিরাট বুজরুকি। দেহের খাঁচা থেকে বেরুনোমাত্র আত্মাটি টুপ ক'রে পরম ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়, এত বড় মিথ্যে কথা আর কিছু নেই। যত বই পৃথিবীতে লেখা হয়েছে সব মিথ্যে। কেন জানো?'

'বোধহয় এইজন্য যে শুধু জীবিতেরাই বই লেখে, আর না-মরা পর্যন্ত পুরো সত্য জানা যায় না।'

'ব্রাভো! ঠিক বলেছো। বেশ বুদ্ধিমান ছেলে তুমি।'

'ধন্যবাদ। —যদিও জানি না আমার পরীক্ষক মশায়েরও তাই মত হবে কিনা। একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তুমি কে? কোনো আত্মা? প্রেত? বিশ্রী বাংলায় যাকে ভূত বলি, তা-ই? আমাকে বলছো, গীতা ভুল, দান্তে ভুল। সত্য কথাটা তাহলে কী?'

'দ্যাখো ছোকরা, অতিচালাকি কোরো না—পরীক্ষায় ফল ভালো হবে না তাতে। যেটুকু জানো তার বাইরে ছায়া মাড়াবে না।'

'আমি প্রতিবাদ করছি। তুমিও আমার পরীক্ষক নও, আর আমিও কিছু অতিচালাকি করিনি। আমি শুধু জানতে চাচ্ছি তোমার কাছে। নচিকেতা যেমন যমের কাছে—তেমনি।'

'সেটি হচ্ছে না', একটা হাসির মতো আওয়াজ শুনলো সুকুমার। 'আমরা মরে গিয়ে যা জেনেছি তুমি ভাবছো বেঁচে থেকেই তা জেনে নেবে? না হে না, সে-আশা নেই।'

'তা বেশ। আমার জ্ঞানের স্পৃহা এত প্রবল নয় যে, তার জন্য ছটফটিয়ে এই

দেহ থেকে বেরিয়ে যাবো। নশ্বর দেহের সঙ্গে এক হয়ে থাকতে নেহাৎ মন্দ লাগছে না আপাতত।'

'স্বার্থপর! নিষ্ঠুর! জীবিতেরা সকলেই তা-ই। যারা মরে গেছে, কে আর ভাতে তাদের কথা?'

'যুধিষ্ঠির ভেবেছিলেন। দান্তে ভেবেছিলেন। কবিরা অনেকেই ভেবেছিলেন।'

'তোমার বই-পড়া জঞ্জাল ভুলে যাও। আমার কথা শোনো। জানো, আমি ডাক্তারি পড়তুম?'

'আচ্ছা! আমিও একবার ভর্তি হয়েছিলাম মেডিকেল কলেজে।'

'মড়া কাটার ভয়ে পালিয়েছিলে তো?'

কিছু আগেই পালিয়েছিলুম। শুরু করার আগেই।'

'কত ছেলেকে ভয় পেতে দেখেছি। কেউ অপারেশন থিয়েটারেই বমি করে ফেলেছে। কেউ বাড়ি ফিরে ঘেন্নায় ভাত খেতে পারেনি। রাত্রে স্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে উঠেছে কেউ-কেউ। আমার কিন্তু প্রথম থেকেই ভালো লাগতো।'

'ভালো-মন্দ তো বাইরে কিছু নেই; সবই আমাদের মনে।'

'দ্যাখো ছোকরা, আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না। কত বয়স তোমার, শুনি? কুড়ি? একুশ? আমারও তাই ছিলো—কিছু বেশি—সেই সময়ে। কিন্তু সে কতদিন আগে, জানো? তোমাদের হিসেবে পঞ্চাশ বছর। তাহলে আমার বয়স কত হলো ভেবে দ্যাখো।'

সুকুমার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'পঁচাত্তর?'

'তাও বলতে পারো, অনন্তকাল বললেও ভুল হয় না। এই অনন্তকালের মধ্যে কখনো কি তার সঙ্গে আবার দেখা হবে?'

'কার কথা বলছো?'

'আঃ—বাধা দিও না বারবার। আমাকে বলতে দাও।'

সুকুমার বুঝলো ইনি আত্মজীবনীর একটি অংশ তাকে শোনাতে চান। সকলেই তা-ই চায়, সকলেই ভাবে তার জীবনের সুখ-দুঃখ শুনতে অন্যদেরও গরজ খুব। মরে গিয়েও এ রোগ মরে না।

'বলছিলাম আমার ভালো লাগতো ডাক্তারি পড়া। ভালো লাগতো মড়া কাটতে—ঐ ফোলা, শক্ত, ঠাণ্ডা মৃতদেহগুলোর পেটের মধ্যে ছুরি চালিয়ে শরীরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কলকব্জা যখন চোখের সামনে দেখতে পেতাম, নিজেকে আমার মস্ত কেউ-কেটা মনে হতো। ভালোবাসতাম মুমূর্ষুর পাশে পাহারা দিতে, তাদের নাভিশ্বাসের যন্ত্রণা লক্ষ্য করতে—আর কয়েক ঘণ্টা, কয়েক মিনিটের মধ্যে এরা আর মানুষ থাকবে না, একটা জিনিসে পরিণত হবে, নেহাৎ জড়পদার্থ, যার পেটের মধ্যে ছুরি চালিয়ে জ্ঞানী হওয়া যায়।'

একটু থেমে দম নিয়ে আবার শুরু করলো, 'গর্ব হতো আমার উঁচু দরের জীব

ব'লে মনে হতো নিজেকে—কেন, জানো? আর কোনো কারণে নয়, শুধু বেঁচে আছি ব'লেই। এরা মরে যাচ্ছে, মরে গেছে—আর আমি বেঁচে আছি। একটি সপ্রাণ সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ শরীর আছে আমার। নিতে পারি খাদ্যের স্বাদ, সূর্যের স্বাদ, শরতের শিউলির গন্ধ, ভোরবেলার ভৈরবীর সুর। পারি সাঁতার কাটতে, আড্ডা দিতে, ঘুমের অলস বিছানায় জেগে উঠতে। ...আর এখন? এই তুমি চোখের সামনে যা দেখছো, তার মধ্যে স্বচ্ছন্দে হাত চালিয়ে দিতে পারো। এই ধুতি-পাঞ্জাবি, কার্পেটের চটি, সিঁথি-কাটা চুল, নাকের তলায় পাতলা সরু গোঁফ—এ সব কিছু না, কিছুই না—হাওয়া, মায়া। অনেক—অনেক—অনেক কষ্টে এটুকু মাত্র জোটাতে পারি এখন। সেই তখন আমি যা ছিলাম তার একটা স্মৃতি মাত্র, ছায়া মাত্র, ভান মাত্র। যদি আমাকে ধরতে যাও মুঠোর মধ্যে, হাওয়া ছাড়া আর কিছু পাবে না। দ্যাখো—দ্যাখো একবার হাত দিয়ে।'

'মাপ করো, তোমাকে স্পর্শ করতে লুব্ধ হচ্ছি না আমি। কিন্তু সবই যদি মায়া, তাহলে তোমার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি কেমন করে?'

'ঐ শুনতে পাওয়াটাও মায়া।' এই জ্ঞানগর্ভ ঘোষণার পরেই আগন্তুক আমাকে আলগোছে জিগ্যেস করলো, 'তোমার কোনো বন্ধু আছে কি?'

'বন্ধু? অনেক আছে।'

'অনেক না—একজন, এক বন্ধু, অনন্য বন্ধু, প্রাণের বন্ধু? সবসময় থাকো যার সঙ্গে— কাজে, খেলায়, দুঃখে, আনন্দে, চিন্তায়? যাকে একবেলা না দেখলে নিজের অস্তিত্ব অর্থহীন মনে হয়?'

'এমন বন্ধুতা হয় নাকি কখনো—মধ্যযুগের কাহিনীতে ছাড়া?'

'হয় না? আমি বলছি, হয়। আমার ছিল তেমনি এক বন্ধু। তার নাম ছিল বিনয়েন্দ্র। আমার সহপাঠী, আমার প্রতিযোগী, আমার চিরসঙ্গী। কলেজে যতগুলো পরীক্ষা হয়—আর জানো তো, মেডিকেল কলেজে পরীক্ষার চাপ অনেক বেশি। —কোনোবার সে ফার্স্ট, আমি সেকেণ্ড—আর কোনোবার আমি ফার্স্ট, সে সেকেণ্ড। এর কোনো নড়চড় হয়নি কখনো। ক্লাশে আমরা পাশাপাশি বসি, হাসপাতালে কাজ করি একসঙ্গে, একসঙ্গে বেড়াই, ছুটির দিনে একসঙ্গে যাই চন্দননগরের বাগানে, মাছ ধরি, খিচুড়ি রাঁধি, শীতের বিকেলে গাছের তলায় বসে বসে ওথেলো কিংবা ম্যাকবেথ আওড়াই।

'একটা বিষয়ে শুধু তফাৎ ছিল ওর সঙ্গে আমার; বিনয়ের হৃদয় ছিল মেয়েদের মতো কোমল, আর আমি ছিলাম কোনো কোনো বিষয়ে পাথরে গড়া। কষ্ট, আর্তনাদ, মৃত্যু—এ সব নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার আমার পক্ষে ছিল কৌতূহলের বা গবেষণার বিষয়, কিন্তু রোগীর যন্ত্রণা দেখে বিনয়ের চোখে জল আসে, মৃত্যুর দৃশ্যে মুখ করুণ হয়ে যায়। এ নিয়ে আমি অনেক ঠাট্টা করেছি তাকে।

'আর একটা বিষয়ে তফাৎ ছিল।

'আমি, শ্রীশিবশঙ্কর চৌধুরি, কলকাতার বনেদি বাড়ির দুলাল, আর বিনয় ছিল গরিবের ছেলে। জোড়াবাগানে তিন পুরুষের বাড়ি আমাদের, তার দেউড়িতে দারোয়ান, আস্তাবলে জুড়িগাড়ি। আর বিনয় বীরভূম জেলার বিধবা মায়ের ছেলে, থাকে বৌবাজারের মেস-এ, তার পড়া খরচ চালাতে লাটে উঠেছে দেশের ছিটেফোঁটা জমিজমা, মা'র দু-চারটি গয়না গলে যাচ্ছে। এ সব কথা তারই কাছে শুনতাম, কিছুই সে লুকোতো না আমার কাছে, তাহলে কি আর বন্ধুত্ব হয়?

'খুব বেশিদিন মানুষের সংসারে আমি ছিলাম না। কিন্তু যদি একশো বছর বেঁচে থাকার মতো ভাগ্য আমার হতো, তাহলেও আমি জানি, বিনয়ের মতো নির্মল চরিত্রের মানুষ আর একটিও দেখতাম না। এমন সহজভাবে চেষ্টাহীনভাবে, অনলসভাবে ভাল ছিল বিনয়! তার উচ্চাশায় লুব্ধতা নেই, আত্মসম্মানে দম্ভ নেই, তার স্বাবলম্বিতা ভালোবাসাকে অপমান করে না। আমি পারি এক পলকে তার সব অভাব মিটিয়ে দিতে, পারি তাকে আমারই বাড়িতে আমারই মতো আরামে রাখতে, আর—কী বোকা আমি! —প্রথম-প্রথম ও-রকম কথা বলেছি তাকে, কান পাতেনি বলে অভিমান করেছি।

'শেষে একদিন বললো, "আমি যদি তোমাদের বাড়িতে থাকি, তাহলে তুমি তোমার বাড়ির কাছে ছোট হয়ে যাবে। আর তুমি যাতে ছোট হয়ে যাবে তেমন কাজ তুমি বললেও আমি করতে পারি না।" হাসিমুখে বলেছে কথাটা, অথচ গম্ভীরভাবেই। গম্ভীর হলে কালো দেখায় না তাকে, হাসলে হালকা মনে হয় না। প্রায় সব কথাতেই সায় দেয়, আর যখন 'না' বলে তাও যেন পালকের মতো নরম, তবু গলার সুরে বুঝিয়ে দেয় যে 'না' মানে সত্যি 'না'। এমনি মানুষ ছিল বিনয়, আমার বন্ধু সে।

'প্রায়ই সে আসে আমাদের বাড়িতে। মা যখন আমাদের দু'জনকে পাশাপাশি বসিয়ে খাওয়ান খুব আনন্দ করেই খায় ও; ষষ্ঠীতে আর পুজোর সময় মা যে কাপড় দেন, নেয় মাথা পেতে তা; কিন্তু এটুকুর বেশি যদি আর কিছু করতে চেয়েছি তার জন্য, তাহলে নিজের ভুলের জন্য নিজেকেই লজ্জা পেতে হয়েছে। আর সত্যিও—তার জন্য কিছু 'করা'র প্রশ্ন যেন অবান্তর, নিজের মধ্যে এমন সম্পূর্ণ, এমন আত্মস্থ ও অনাবিল ছেলে বিনয়! দরকারমতো আমার বই নিয়ে পড়তে তার কুণ্ঠা নেই, কিন্তু আমার কোনো শৌখিন জামা একদিনও পরাতে পারিনি তাকে। কম খরচে পরিচ্ছন্ন থাকার উপায় সে জানে, ভালো পুরোনো বই সস্তায় জোগাড় করতে সে ওস্তাদ। তার কখনো অসুখ করলেও আমার একটা সুযোগ হতো, কিন্তু তার ছিপছিপে মজবুত শরীরে সর্দিরও প্রবেশের অধিকার ছিল না। বরং আমারই নিউমোনিয়ার সময় রাত জেগে শুশ্রূষা করেছিল সে।

'অতএব আমার দিক থেকেই চেষ্টা করলাম তার সঙ্গে ব্যবধান কমিয়ে আনতে। মেডিকেল কলেজে বাবুগিরিটাই রেওয়াজ ছিল তখন, ছেলেরা সবাই সেন্ট মাখে,

ডবল আস্তিনের বিলেতি কামিজ গায়ে দেয়, শীতকালে পশমি কোট, রেশমি মাফলার, ব্লেজার পরে টেনিস খেলতে যায়। ক্রমে বিলাসিতা কমিয়ে আনলাম। বাড়ির গাড়ি পারতপক্ষে চড়ি না, বিনয়ের সঙ্গে হেঁটে-হেঁটে বেড়াই, দূরে যেতে হলে ভাড়া-গাড়ি নিই। রাত্রে মাঝে মাঝে বিনয়ের মেস-এ খেয়ে বাড়ি ফিরি, কখনো বা রাত্তির দুটো অবধি তার তক্তায় বসে ফিজিওলজির মর্মোদ্ধার করি। এমন আস্তে-আস্তে, স্বাভাবিকভাবে অভ্যেসগুলো বদলেছিলাম যে বাড়ির কেউ তা লক্ষ্য করতে পারেনি। বিনয় হয়তো বুঝেছিল, কিন্তু আমাকে বুঝতে দেয়নি যে সে বুঝেছে। সবই সহজভাবে নিয়েছে সে, আর আমিও তাই সহজ হতে পেরেছি। এমনি করে ছ'-বছর কাটলো, কাছে এলো ফাইনাল পরীক্ষা।

'কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন ও'ব্রায়েন। নিম্নতম জমাদার থেকে উচ্চতম প্রফেসার পর্যন্ত সবাই তাঁর নাম দিয়েছিল পাগলা সাহেব।

'এই ও'ব্রায়েন আমাদের ফাইনাল পরীক্ষার তিন মাস আগে এক অদ্ভুত বিজ্ঞাপন দিলেন। জানালেন, এই পরীক্ষায় যে ছাত্র ফার্স্ট হবে তাকে তিনি নিজে স্কলারশিপ দিয়ে চার বছরের জন্য এডিনবরায় পাঠাবেন, আর সেখানে পড়াশুনো ভালো করলে আরো এক বছর জার্মানিতে। শোনা গেল, পরের বছর তিনি দেশে ফিরে যাচ্ছেন—আর ফিরবেন না, যাবার আগে ভারতের জন্য এটুকু তিনি করতে চান।

'খবরটা বেরোনো মাত্র সারা কলেজে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেল; কে পাবে এই স্কলারশিপ? বিনয়েন্দ্র? না শিবশঙ্কর? তৃতীয় নাম ভুলেও উচ্চারিত হয় না, কিন্তু দু'জনের মধ্যে একজনের বিষয়ে কখনোই নিশ্চিন্ত হতে পারে না কেউ। দেখা গেল, ঘোড়দৌড়ের মতো উত্তেজনা, ভারি মজা। কেউ এসে আমাকে বলে—আমাকে ডুবিয়ো না, শঙ্কর, পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বাজি রেখেছি ভূতনাথের সঙ্গে। আর অন্য কেউ পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে-যেতে চেঁচিয়ে ওঠে—বিনয়, ঠিক আছো তো? দেবেনের রুপোর ছড়িটা জিতিয়ে দেবে তো আমাকে?

'কিন্তু যে দু'জনকে নিয়ে এত কথা তাদের ওপর এর ফল কিছুই বোঝা গেল না। যেমন আগে ছিল এখনো তেমনি রইলো আমাদের বন্ধুত্ব। বন্ধু, অবিচ্ছেদ্য, নিরন্তর। —কিন্তু মনে মনে এ নিয়ে যে আমি ভাবিনি তাও নয়।'

একটানা অনেকক্ষণ কথা বলার পর একটু জিরিয়ে নিয়ে আগন্তুক আবার আরম্ভ করল শোনো এবার মন দিয়ে, বিনয়ের আর আমার কথাবার্তাগুলো। বন্ধুর কথাগুলো অবশ্য আমিই শোনাবো তোমাকে।

একদিন আমি তাকে বললাম—ও'ব্রায়েন এই এক মজার ফন্দি করেছে, তোমার আমার ছাড়াছাড়ি ঘটাবার।

—বিনয় বলল, সে আর ক'দিনের জন্য।

—পাঁচ বছর, কম কী? ততদিনে কত কিছু বদলে যেতে পারে।

—তুমি কি বিলেতে যেতে চাও না?

—চাই না তা নয়, কিন্তু এখনই চাই না।

—বিলেতে তো যেতেই হবে। তাড়াতাড়ি সেরে নিতে পারলে মন্দ কী।

—যেতেই হবে কেন?

—বিলেতে না গিয়ে কেউ তো বড় হয়নি, আমাদের দেশে।

—কেন? বিদ্যাসাগর? বঙ্কিমচন্দ্র?

—তাঁদের কথা আলাদা। তাঁরা সরস্বতীর বরপুত্র, আর আমরা হিপক্রেটিস-এর বংশধর। ভালো ডাক্তার হতে হলে বিলেতে যাওয়াই চাই।

—তা তুমি যাই বলো এই মেডিকেল কলেজের ওপর আমার মায়া পড়ে গেছে। আর একটা কথা মনে এনেও মুখে বললাম না, বিনয়কে ছেড়ে অত দূর দেশে যেতে হবে সে কথা ভাবতে ভালো লাগে না আমার।

আগন্তুক বলতে লাগল, আমি পরীক্ষার জন্য তৈরিও হচ্ছি আর এই কথাটা নিয়ে তোলপাড়ও করছি মনে মনে। শেষে একদিন লজ্জা কাটিয়ে বললাম—বিনয়, আমি যত ভাবছি ততই মনে হচ্ছে তোমাকে ছেড়ে বিলেতে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

হয়তো একটু অভিমানের সুর ছিল আমার কথায়। বিনয় যদিও মুখে কিছু বলেনি, আমি বুঝেছিলাম যে এ-বিষয়ে তার মনের ভাব ঠিক আমার মতো নয়। বিলেতে সে যেতে চায়। বন্ধুকে ছেড়ে যাওয়া, বিধবা মাকে ছেড়ে যাওয়া—এ সব কষ্ট সেখানে বড় হয়ে ওঠে না তার কাছে। সেটাই ঠিক, সেটাই স্বাভাবিক, আমার এই দুর্বলতাটাই দোষের—সব বুঝেও মনে মনে আমি ঈষৎ ব্যথিত হই।

বিনয় বলল—এসব ভেবে এখন সময় নষ্ট করা কি ভালো? পরীক্ষা এসে গেছে। মনকে তৈরি করে ফ্যালো বিলেতে যাবার জন্য, আর ঠেশে পড়। আর কিছু ভাবতে হবে না।

—আমি বললাম—বিনয়, আমার একটা প্রস্তাব আছে।

—বলো।

—আমি যদি স্কলারশিপ পাই, তুমিও আমারই সঙ্গে একই জাহাজে বিলেতে যাবে? এডিনবরায়। খরচ আমি যে করে হয় দেবো।

বিনয় সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—তা হতে পারে না।

—কেন পারে না? আমি চাইলেই বাবা আমাকে ধার দেবেন।

—তিনি হয়তো দান দিতেও পারেন। কিন্তু—

আমি তার চোখের দিকে তাকালাম। সে চোখ কালো আর গভীর আর শান্ত। আমার মনের কথাটা গলা ছিঁড়ে বেরিয়ে এলো এতক্ষণে—এত কম ভালোবাসো আমাকে।

—এত বেশি ভালোবাসি তোমাকে। ...থাক, এ নিয়ে আর—

একটু চুপ করে থেকে আমি আবার বললাম—আমি এ বছর পরীক্ষা দেবো না, বিনয়।

আমার চোখের দিকে এক পলক তাকিয়ে বিনয় বললো—কী বোকার মতো কথা বলছো তুমি!

জানতাম না, তখন কী সর্বনাশের বীজ আমি বপন করেছিলাম।

পুজোর ছুটিতে বিনয় মা'র কাছে গেল, আমি বাড়ির হট্টগোল এড়াবার জন্য বই-খাতা নিয়ে চন্দননগরের বাগানে আশ্রয় নিলাম। স্থির করলাম, একেবারে কালীপুজো কাটিয়ে ফিরবো, কিন্তু লক্ষ্মীপুজোর আগেই বাড়ির ব্যাপারে একদিন আসতে হলো। বিকেলবেলা কলেজের লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখি, বিনয় সেখানে বসে আছে।

তাকে দেখে আমার বুকের ওপর হাতুড়ি পড়লো। কথা ছিল, লক্ষ্মীপুজোর পরের দিন সে দেশ থেকে ফিরবে। চন্দননগর স্টেশনে নেমে সোজা আসবে আমার কাছে, কালীপুজো পর্যন্ত সেখানেই থাকবো আমরা, তারপর একসঙ্গে ফিরবো কলকাতায়।

বিনয় খুব নিবিষ্ট হয়ে পড়ছিল, আমাকে দেখতে পায়নি। আমি নিঃশব্দে তার কাছে গয়ে খুব আস্তে পিঠের ওপর হাত রাখলাম। হয়তো আমার কল্পনা, কিন্তু আমার মনে হলো, মুখ তুলে আমাকে দেখে মুহূর্তের জন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেল সে। জিগ্যেস করলাম—কী ব্যাপার, কখন এলে? চন্দননগরে যাওনি যে?

বিনয় বললো—সঙ্গে আমার এক খুড়ো এলেন, তিনি আগে কখনো কলকাতায় আসেননি। প্রথমে তাঁকে নিয়ে মেস-এ তুলতে হলো। কাল কালীঘাট দেখিয়ে পরশু সকালে হাওড়ায় তাঁকে ট্রেনে তুলে দেবো, আর আমিও সেই ট্রেনে—

—আসছো তো বাগানে?

—হ্যাঁ, আসবো।

দু'জনে ফিরে এলাম লাইব্রেরীতে। বিনয়ের পাশের জায়গা খালি ছিল না, আমি একই টেবিলে একটু দূরে বসলাম। আমার সামনে অ্যানিস্থেটিক্স-এর বই, কিন্তু আমার চোখ বারে বারে বিনয়ের মুখের ওপর পড়ছে, আর বারে-বারে আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ এক বিষাদ নেমেছে আমার মনের ওপর; কেন এই বিষাদ, তাও জানি না। দেখছিলাম, বিনয় তার বইয়ের মধ্যে ডুবে গেছে, মাঝে-মাঝে নোট নিচ্ছে খাতায়।

আমার কিছু পড়া হলো না; শুধু সামনে বই খুলে বসে থাকলাম, বিনয়ের পড়া শেষ হবার অপেক্ষায়। প্রায় দু'ঘণ্টা পরে বই বন্ধ করলো বিনয়। যেন হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে ইশারা করল। একসঙ্গে বেরোলাম দু'জনে, কিন্তু—আশ্চর্যের বিষয় —দু'জনেই চুপ। বাইরে তখন কার্তিকের সন্ধ্যা, আকাশে রঙ নেই, বাতাস শিরশিরে ঠাণ্ডা। কলেজের গেট পর্যন্ত এসে আমি দাঁড়ালাম। জিগ্যেস করলাম—

কোথায় যাবে এখন?

—মেস-এ ফিরবো।

—আমাকে একবার যেতে হবে দিদির বাড়ি। আটটা নাগাদ ফিরবো। এসে তখন।

—আজ তো পারবো না।

—তবে কাল সকালে?

—কাল খুড়োকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবো। পরশু সকালে আটটা-কুড়িতে সিউড়ির গাড়ি। তুমি কি—

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি ঐ একই ট্রেনে যাবো। কিন্তু কাল কি সারাদিনই তুমি খুড়োকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে? না-হয় আমিও বেরোবো তোমার সঙ্গে—কী বলো?

বিনয় চোখ নামিয়ে নিল। আর তার সেই ভঙ্গিটা ছুরির মতো বিঁধলো আমাকে। মনের কথা আর লুকিয়ে রাখতে পারলাম না; তার হাত চেপে ধরে বলে উঠলাম—

বিনয় তোমার কি হয়েছে?

—কিছু তো হয়নি। বিনয় হাসলো, কিন্তু সে হাসিও ম্লান।

—নিশ্চয় কিছু হয়েছে। কোনো অসুখ?

—অসুখ কেন করবে?

—দেশের বাড়িতে কোনো বিপদ?

—কিছু না।

—তাহলে তুমি মনে-মনে ভাবছো? বিনয় চুপ।

—বলো! আমাকে বলো! বলতেই হবে আমাকে!

বিনয় আস্তে-আস্তে আমার হাত ছাড়িয়ে চোখে চোখ রেখে বললো—তোমার কথাই ভাবছি, কত ভাগ্যে তোমার মতো বন্ধু পাওয়া যায়।

এ-কথা শুনে আমি গলে জল হয়ে গেলাম।

এবারে সে বললো—চলো আমাকে এগিয়ে দেবে একটু।

হাঁটতে হাঁটতে একটি ছোট আলোচনা হলো তার সঙ্গে। এবার দেশে গিয়ে তার মনে হয়েছে—আগেও হয়নি তা নয়—যে ডাক্তারি পেশা সবচেয়ে যেখানে সার্থক হতে পারে সে হলো বাংলাদেশের গ্রাম। কলকাতার শহরে—যেখানে বড় ডাক্তার অনেকেই আছেন—সেখানে আর-একজন বড় ডাক্তার হয়ে বসাটা তার পক্ষে কি এতই জরুরি, যখন তারই গ্রাম উচ্ছন্নে যাচ্ছে ম্যালেরিয়ায়, ডিসেন্ট্রিতে, কুসংস্কারে, অশিক্ষায়? তার তো মনে হচ্ছে ওখানেই তার স্থান—যদি পারে মানুষগুলোকে বাঁচাতে—শুধু স্বাস্থ্য দিয়ে নয়, জ্ঞান দিয়েও।

বিনয়ের কথা শুনে আমার হাসি পেল।

—বিলেতে থেকে ফিরে পাড়াগাঁয়ে মন টিকবে কি তোমার?

ততক্ষণে তার মেস-র দরজায় এসে পড়েছি আমরা। আমার প্রশ্নটার কোনো

জবাব না দিয়ে বললো—তাহলে পরশু দেখা হচ্ছে হাওড়ায়?

—সে তো হচ্ছে, কিন্তু কালও এসো একবার। যে কোনো সময়ে।

আমি হালকা মনে দিদির বাড়ি গেলাম, কিন্তু পরের দিন সত্যি যখন সারাদিনেও বিনয় একবার এলো না, রাত্রে আবার মেঘ করে এলো আমার মনে। ওর কিছু হয়েছে, যা লুকিয়ে রাখছে আমার কাছ থেকে? কেমন যেন আনমনা। আনমনা? তা নয় তো কী। আগের দিনের সমস্ত ঘটনা ভেসে উঠলো আমার মনে : লাইব্রেরিতে আমাকে দেখে চমকে ওঠা, পড়তে- পড়তে একবারও না তাকানো, আমার কথার উত্তরে চোখ নামিয়ে নেওয়া। না, না, এটা তার স্বাভাবিক অবস্থা নয়, নিশ্চয়ই কোনো গোপন দুশ্চিন্তায় সে কষ্ট পাচ্ছে। কী? ওর অসুখ? ওর মা-র? জমিদারের খাজনা বাকি পড়েছে? বসতবাড়ি নিয়ে টানাটানি। না কি কোনো বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছে গোপনে? যদি কিছু হয়ে থাকে আমাকে বলছে না কেন? আমাকে বলতে পারে না এমন কিছু আছে নাকি ওর? না কি সবই আমার কল্পনা?

এই সব ভাবতে-ভাবতে অনেক রাত্রে ঘুম এলো। আ—সেই ঘুমিয়ে পড়ার সুখ! ভাবনাগুলো যেন পরস্পর গলে যায়, শান্তি নামে কালো হয়ে। —কিন্তু তুমি ঘুমিয়ে পড়লে না তো? শুনছো?

সুকুমার সাড়া দিল, শুনছি। তারপর?

আগন্তুক আবার বলতে লাগল, পরের দিন হাওড়া থেকে গাড়ি ছাড়ল। প্যাসেঞ্জার গাড়ি, থার্ড ক্লাশ কামরা, ছুটির পরে বেজায় ভিড় হয়েছে। বিনয়ের আধ-বুড়ো খুড়োকে কোনোরকমে বসিয়ে আমরা দু'জন দরজার ধারে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই চলে যাওয়া যাবে।

ভিড়, গোলমাল, ট্রেনের শব্দে কথা বলার সুবিধে নেই, কিন্তু চলতি ট্রেনে ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতেই ভালো লাগছে আমার। ওকে দেখতেই ভালো লাগছে। আজ সকালে ওর মুখে কোনো মালিন্য নেই, চোখ উজ্জ্বল, ঠোঁটের কোণে হাসি। একের পর এক সরে যাওয়া টেলিগ্রাফের তারগুলো দেখতে-দেখতে আমার কালকের সব দুর্ভাবনা যেন বাষ্পের মতো মিলিয়ে গেল।

লিলুয়ার পরে ট্রেন যখন বেশ স্পিড নিয়েছে, বিনয় তখন বললো—দরজাটা খটখট করছে কেন? ভালো বন্ধ নেই?

আমি উদাসভাবে বললাম—ঠিকই আছে।

—নাঃ, ঠিক মনে হচ্ছে না। একটু সরো তো। বাইরে হাত বাড়িয়ে হুড়কোটা আঁট করতে গেল বিনয়, আর হঠাৎ আমি কানের মধ্যে শোঁ শোঁ হাওয়ার আওয়াজ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে তার জোরালো হাত জড়িয়ে ধরলো আমাকে।

—আঃ! ও-রকম করে দাঁড়াতে হয় কখনো? তুমি কী!

আমি তাকিয়ে দেখলাম বিনয়ের মুখে আর রং নেই, ঠোঁট কাঁপছে, আর গাড়ির

খোলা দরজাটা ঠকাশ-ঠকাশ করছে হাওয়ায়।

—ও-রকম দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াতে হয় কখনো! ধমক দিয়ে উঠলো বিনয়—সরো! সরে দাঁড়াও!

আমাকে ছেড়ে দিয়ে ভালো করে এঁটে দিল দরজাটা। বাকি পথ দরজাটা আগলে রইলে যেন—যাতে আমি কাছে ঘেঁষতে না পারি। তার অতি-সাবধানতায় আমার হাসি পেল।

'চন্দননগরে চমৎকার কাটলো দিনগুলি', একটু চুপ করে থেকে আবার আরম্ভ করলো আগন্তুক। 'একসঙ্গে পড়া, খাওয়া, বেড়ানো, একই সময়ে ঘুমিয়ে পড়া আর জেগে ওঠা। বাগানে স্থলপদ্ম, নদীতে ভরা জল, বাঁধানো বটতলায় ছায়া, বিকেলে মাঝে মাঝে ব্যাডমিণ্টন। যেমন ছ'বছর ধরে হয়েছে, তেমনি করেই পরস্পরের সাহায্যে হু-হু করে এগিয়ে গেল আমাদের পরীক্ষার পড়া।'

তবু মাঝে মাঝে হঠাৎ যেন কেমন হয়ে যায় বিনয়। পড়া বন্ধ করে উঠে গিয়ে পাইচারি করে বাগানে, বটতলায় চুপচাপ বসে থাকে, নয়তো দূরে ঘোষালের ঘাটে চলে যায়—আমি তাকে খুঁজে বের করি।

—কী হয়েছে তোমার? বলো না, কী হয়েছে?

বিনয়ের সেই এক উত্তর—কিছু তো হয়নি। যত চেষ্টা করি, কিছুতেই সেই পর্দা সরে না। পর্দা নয়, দেয়াল। আর সেই দেয়ালে মাথা ফাটাতে ইচ্ছে করে আমার। কিন্তু পরের দিন সে যখন আবার হাসে, সব ভুলে যাই।

সারাদিন ধরে পড়ে বিকেলের দিকে মাথা যেন ঝিমঝিম করে, মাঝে-মাঝে নদীতে বেড়াতে যাই। বাবা একটা বিলিতি শ্যালপ আনিয়েছিলেন, যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি বাইতে আরাম। একদিন সূর্যাস্তের সময় চলেছি দু'জনে; নদীর জলে সোনা, মস্ত উঁচু আকাশ, জগৎ জুড়ে শান্তি। খেয়াল ছিল না, কত দূরে চলে এসেছি। বিনয় মনে করিয়ে দিল—এবার ফেরো, শঙ্কর। অনেকখানি এসে পড়েছি আমরা আজকে।

আমি বললাম—এবার তুমি বাইবে।

বিনয় দাঁড় হাতে নিল, আমি লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। তারা-ফোটা আকাশের তলায় ঠাণ্ডা বাতাসে, জলের ছলছল শব্দে, আমার মনে ঘুমের মতো আবেশ নামলো। হঠাৎ কী-রকম একটা শব্দে চমকে উঠে বসলাম। অন্ধকার, দূরে মিটমিট করছে আলো, কালো আকাশ ভরে ঝকঝকে তারা। আর শোঁ-শোঁ একটা শব্দ। আর সেই শব্দের ফাঁকে-ফাঁকে বিনয়ের বড়-বড় ভারি নিঃশ্বাস।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—বিনয়!

—কিছু ভয় নেই। দাঁড় ধরো ওদিকে!

—আমাকে আগে ডাকলে না কেন? এসে গেল যে! বলতে-বলতে হালকা শ্যালপ দুলে উঠলো, গর্জনে ভরে গেল আমার কান। চারদিকে জল—অন্ধকার—

নিঃশ্বাস নেই—তারপর দু'খানা সবল হাত বেষ্টন করলো আমাকে, পাটাতনে শুয়ে হাঁপাতে লাগলাম।

ফিরে এলাম যখন, তখন রাত প্রায় ন'টা; রামরতন লণ্ঠন নিয়ে খুঁজতে বেরিয়েছে। সে কিছু লক্ষ্য করার আগেই তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে ভিজে জামা-কাপড় ছেড়ে নিলাম দু'জনে। গরম-গরম লুচি আর মাংস খাবার পরে দেহের তেজ ফিরে এলো। হেসে বললাম—খুব একটা অ্যাডভেঞ্চার হলো আজ।

—হুঁ।

—আমারই ভুল। আমারই জানা উচিত ছিল আজ অমাবস্যা, বান আসবে।

—এখন ভালো বোধ করছো তো?

—আমার কিছুই হয়নি। জানো তো, এই বানের ওপর দিয়ে কতবার সাঁতরে গেছি আমি। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বলেই—আর একেবারে হঠাৎ—। তোমারই কত কষ্ট হলো। কতক্ষণ একলা উজান বাইলে।

বিনয় খুব নিচু গলায় বললো—আজ আর কথা না। ঘুমিয়ে পড়ো তাড়াতাড়ি।

এরপর যে ক'দিন বাগানে ছিলাম, বিনয় আনন্দে উৎসাহে সাহচর্যে একেবারে ভরে রাখলো আমাকে। কালীপুজোর দিন কলকাতায় ফিরে এলাম দু'জনে।

আর এক মাস—আর কুড়ি দিন—পনেরো দিন—এমনি করে-করে সেই সোমবার। যার পরের সোমবার পরীক্ষা আরম্ভ।

শেষ সপ্তাহটি একসঙ্গে রাত জেগেছি আমরা—ঠিক তুমি যেমন এখন রাত জেগে পড়ছে, মা আর-একটা খাট আনিয়ে দিয়েছেন আমার ঘরে, দেয়াল ঘেঁষে কঙ্কাল, কাচের আলমারিতে মড়ার খুলি, হাড়ের টুকরো, টেবিলে মোটা-মোটা বই-খাতা, অঙ্কের আর ল্যাটিন ভাষার হিজিবিজি। বারান্দায় রামরতন শোয়, তোলা উনুনে কাঠকয়লা জ্বলে, আমাদের দরকার মতো গরম চা তৈরি করে এনে দেয়।

শুক্রবার রাত্রে আমি বললাম—বিনয়, আমার মনে হচ্ছে, তুমি আর আমি ব্র্যাকেটে ফার্স্ট হবো। ডবল খরচ হবে ও-ব্রায়েন সাহেবের।

বিনয়ের মুখে ছায়া পড়লো। ভুরু কুঁচকে বললো, তা কি আর হবে। দু-চার নম্বরের হলেও তফাৎ থাকবেই।

—আর সে-তফাৎ তোমার দিকেই থাকবে। আমি হাসলাম। বিনয় বইয়ের ওপর চোখ নামিয়ে নিল।

সে-রাত্রে বারোটায় যখন আমাদের জন্য চা এল, বিনয় পকেট থেকে একটি পুরিয়া বের করে তাতে একরকম সাদা গুঁড়ো মিশিয়ে নিল। বললো—ঘুম তাড়াবার ওষুধ।

—তোমারও তাহলে ঘুম পায়?

—আজ পাচ্ছে।

—ঘুমের আর দোষ কী। ও-রকম রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে—সত্যি! থাক

আজ বরং ঘুমোই, এসো।

—কিন্তু এখন তো আর চার ঘণ্টার মধ্যে ঘুম পাবে না আমার।

—তাহলে আমাকেও একটু দাও ওষুধটা।

—নেবে? বিনয় পকেটে হাত দিল। হঠাৎ কেমন সাদা দেখালো তাকে। পকেট থেকে যখন হাত বের করলো, আমার মনে হলো তার আঙুল কাঁপছে।

তার সাদা গুঁড়ো আমার চায়ে মিলিয়ে গেল, আস্তে আস্তে দু'জনে চা শেষ করলাম। টেবিলের দু'দিকে বসে আছি দু'জনে, মাঝখানে প্যাথলজির বই খোলা। সে পড়ে যাচ্ছে, বুঝিয়ে বলছে, আমি শুনছি। মাঝে-মাঝে প্রশ্ন করছে আমাকে, আমি ঠিক-ঠিক জবাব দিয়ে যাচ্ছি। আবার খানিক পরে আমি জেরা করছি তাকে। এমনি চলতে-চলতে হঠাৎ এক সময় বইয়ের পাতা ঝাপসা হয়ে এলো আমার চোখে, আর সেই মুহূর্তে মনো হলো বিনয়ের আর বইতে মন নেই, সে স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আস্তে-আস্তে তার মুখটা বিকট হয়ে উঠলো—চোখে গর্ত, গালে মাংস নেই, মাথার চাঁদি উঠে গেছে—ঠোঁট, নাক, দাঁতের বদলে সারা মুখ জুড়ে এক নিঃশব্দ বিদ্রূপ। প্রায় একটা ভয় ছড়িয়ে পড়েছিল আমার স্নায়ুতে, কিন্তু তখনই পা-টা মেঝেতে ঠুকে গেল, চমকে জেগে উঠলাম।

—তোমার ওষুধে তেমন কাজ হলো না, বিনয়। এর মধ্যে স্বপ্ন দেখেও উঠলাম।

—কী স্বপ্ন দেখলে?

—ঐ কাঠের আলমারির কঙ্কালটা আমাকে তাড়া করছে। আমি হাসলাম। ছ'বছর ডাক্তার পড়ার পর এখন যদি ভূতের ভয় ধরে—

—তোমাকে অল্প দিয়েছিলাম। আচ্ছা, কাল হেভি ডোজ আনবো।

—তা-ই এনো। কিন্তু রোববারে আর রাত জাগবো না কিন্তু।

—না, রোববারে আর না! অদ্ভুত মোটা শোনাল বিনয়ের গলা।

শনিবার। স্তব্ধ রাত, সারা বাড়ি ঘুমন্ত, সে আর আমি ছাড়া কেউ কোথাও জেগে নেই। দু'জনের এক জ্ঞান, এক ধ্যান, এক লক্ষ্য। শুধু বন্ধু নয়, সত্যি যেন একাত্ম হয়ে গিয়েছি দু'জনে। কী আনন্দ, এমনি একজনকে আমার জীবনে আমি পেয়েছি! কি আনন্দ, এমনি কোনো কঠিন কাজের মধ্যে দিয়ে কারো সঙ্গে মিলতে পারা! পড়া, পরীক্ষা, সব ছাপিয়ে এই ভাবনাই বড় হয়ে উঠলো আমার মনে—আমার মন যেন হিমালয়ের চূড়াকে স্পর্শ করলো, ছড়িয়ে পড়লো তারায়-তারায়। হঠাৎ আমি তার কব্জিতে হাত রাখলাম। যেন ঝাঁকানি খেয়ে চমকে উঠলো সে।

—কী হলো?

—আমারও বোধহয় ঘুম পাচ্ছে।

—আমি বলতে চাচ্ছিলাম—আজ আর পড়া থাক।

—এই তো হয়ে যাবে। আর-একটু।

—আমার ইচ্ছে করছে না। তার চেয়ে এসো রবিবাবুর কবিতা পড়ি। ছাদে গিয়ে

বসবে?

—না। বরং চা হোক।

জল চাপানোই ছিল, বিনয় দুটি ভরা পেয়ালা নিয়ে এলো টেবিলে। পকেট থেকে দুটি পুরিয়া বের করে আলোর কাছে দেখলো একবার, নিজেরটিতে সাদা গুঁড়ো মিশিয়ে বললো—আজ আরো কড়া করেছি। তোমাকে দেবো?

—দাও।

অন্য পুরিয়াটি আমার পেয়ালায় ঢেলে দিয়ে, সেই পেয়ালাটার দিকেই তাকিয়ে রইলো বিনয়। আমি হাত বাড়ালাম কিন্তু পেয়ালাটা ছুঁতে পারলাম না, এক কঠিন আঘাত অবশ ক'রে দিল আমাকে। টকটকে লাল বিনয়ের মুখ, পেশীগুলো বিকৃত, আগুনের মতো নিঃশ্বাস। তাকে মুচড়ে দিয়ে একটা বোবা, ভোঁতা, পাশবিক আওয়াজ বেরিয়ে এলো, আমার পেয়ালাটা হাতে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করে ফেললো।

সে দাঁড়িয়েই ছিল, আমার সময়ের কোনো জ্ঞান ছিল না। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গাছের মতো পড়ে যেতে দেখলাম তাকে, চেয়ার উল্টে গেল, টেবিল কেঁপে উঠলো, কপাল ফেটে রক্ত বেরোল তার।

তখন আমার চীৎকারে সারা বাড়ির ঘুম ভাঙলো।

এলো বাড়ির লোক, পাড়ার লোক, ডাক্তার, অ্যাম্বুলেন্স, আমাদের অতি প্রিয় মেডিকেল কলেজের এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে সাড়া পড়ে গেল। ...পুলিসও এলো। আমাকে নিয়ে গেল হাজতে।

মর্গের রিপোর্ট ঃ বিষপ্রয়োগে মৃত্যু। আর পুলিসের হাতে তার পকেটে পাওয়া চিঠি ঃ "যে আমাকে সবচেয়ে ভালোবাসে, আমি যাকে সবচেয়ে ভালোবাসি, সে এখন আমার সফলতার পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় এবং একমাত্র অন্তরায়ও সে। তাকে সরাতে পারলে আমার পথ পরিষ্কার। তাই এই রকম একটা ষড়যন্ত্র করলাম গোপনে-গোপনে। ভাবলাম ঃ তাহলে আর দশ বছরের মধ্যে আমি নীলরতনের দু-নম্বর হতে পারি, কুড়ি বছরের মধ্যে আর-একজন নীলরতন ডাক্তার। হতে পারি নয়, হবোই। সে ছাড়া আমার সমকক্ষ কেউ নেই। তাই তাকে আমি সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি—একবার নয়, দু'বার নয়, তিনবার। ট্রেন থেকে ফেলে দিতে গিয়েছিলাম, নিজের দুর্বলতার জন্য পারিনি। জলে ডুবিয়ে মারতে গিয়েছিলাম, নিজের দুর্বলতার জন্য পারিনি। তৃতীয়বার চায়ে বিষ মিশিয়ে—সেখানেও নিজের দুর্বলতা বাধা দিল। মনের মধ্যে এই পাপ নিয়ে আমি আর বাঁচতে চাই না, তার জন্য তৈরি বিষেই নিজের প্রাণ সংহার করছি। তার ভালো হোক।"

কোর্টে দাঁড়িয়ে আমি বললাম যে চিঠির কথা সত্য নয়, আমাকে বাঁচাবার জন্য সে ও-রকম লিখেছিল। আসলে আমিই তাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছিলাম। আমি

কোনো করুণা প্রার্থনা করি না, আমাকে যথোচিত শাস্তি দেওয়া হোক। এখন আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা।

বাবা বড় বড় উকিল-ব্যারিস্টার লাগালেন, কোর্টে লোক ধরে না, সারা মেডিকেল কলেজ ভেঙে পড়ে। ছ-মাস পরে আমি বেকসুর খালাস পেলাম ঃ যথেষ্ট প্রমাণ কোনোদিকেই ছিল না, কিন্তু আমার বয়স দেখে জুরিদের দয়া হলো।

উৎসব পড়ে গেল আমি যেদিন বাড়ি ফিরলাম। আর পরের দিনই বুক চাপড়ে কান্না। অবশ্য সে কান্না আমি কানে শুনিনি, কেননা তার আগের রাত্রে একখানা ধুতির সাহায্যে আমার দেহ থেকে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলাম।

আগন্তুকের অদ্ভুত কাহিনীটি শোনার পর সুকুমার জিগ্যেস করলো, 'চিঠিটা বিনয় কখন লিখেছিল?'

কিন্তু সামনে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। সুকুমার আবার বললো, 'নিশ্চয়ই আগেই লিখে এনেছিল পকেটে?' কিন্তু কী করে আগে থেকেই জানলো কে মরবে, বা দু'জনের মধ্যে একজনও মরবে কি না? বলেই ভাবলো, কাকে বলছি কথাটা? কে এই বিনয়? আর এই শিবশঙ্করই বা কে? আবার ভাবলো, মিছিমিছি দুটো জীবন নষ্ট হলো। দুটো ভালো জীবন। কিন্তু তাও তো দরকার। সব যদি ঠিকমতো চলবে তাহলে সাহিত্য হবে কেমন করে? ভাগ্যিস মানুষ ভুল করে।

আলো নিবিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো সুকুমার। চোখ ডুবে গেল অন্ধকারে, কানে এলো বৃষ্টির শব্দ, পাতার শব্দ। আরাম। ঘন, কালো, গভীর হয়ে ঘুম নামলো তার চৈতন্যের ওপর। ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে ভাবলো, এই পরীক্ষা ব্যাপারটা কিন্তু বড় বাজে।

নিজে বুঝে নিন

আশাপূর্ণা দেবী

রাত নাগাদ বারোটা।

ভুরসুট পরগনার প্রতাপপুরের বড়কর্তা জগদীশপ্রতাপ তাঁর কলকাতার বাড়ির তিনতলায় নিজের শোবার ঘরে একা একা বসে জোর আলো জ্বালিয়ে দু'খানা মোটা খাতা সামনে বিছিয়ে হিসেবপত্র দেখছিলেন।

যদিও জমিদারির বারোটা বেজে গ্যাছে কবেই। এখন তালপুকুরে ঘটি ডোবে না; তবু 'বড়কর্তা' নামটির মায়া ছাড়তে পারেননি জগদীশপ্রতাপ। এখনো প্রতাপপুরের কেউ 'বড়কর্তা' না বললে মনে মনে যথেষ্ট চটেন।

চটবার কারণও বিদ্যমান আছে বৈকি! ওই 'প্রতাপপুর' তো তাঁরই ঠাকুর্দার বাবা নরসিংহপ্রতাপের খাস 'পত্তন'। তাঁর নামেই প্রতাপপুর। তিনি নাকি দাবি করতেন তিনি মহারাজা প্রতাপাদিত্যর জ্ঞাতিগুষ্টির।

তা জাগগে। কে কী না দাবি করছে।

তবে বোলবোলাও একখানা ছিল বৈকি। জগদীশপ্রতাপের বাবার আমলেও ছিল কিঞ্চিৎ।

জগদীশ অবশ্য তাঁর বাপের ঠাকুর্দা মহামান্য নৃসিংহপ্রতাপকে জ্ঞানে তেমন ভালো করে দেখেননি। আবছা মনে পড়ে, দীর্ঘদেহী এক ব্যক্তি খুব ভোরবেলা আকাশের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে সূর্যপ্রণাম করছে। মন্তর পড়ছেন গমগমে গলায়।

এছাড়া আর বিশেষ কিছু মনে পড়ে না।

যা কিছু শোনা বাবার কাছে।

শুনতে পেয়েছেন সেই নৃসিংহপ্রতাপের জন্মদিনটি আর তাঁর জন্মদিনটি এক।

নৃসিংহপ্রতাপের সেদিন সত্তর বছরের জন্মতিথি।

সকালবেলা ঠাকুর মন্দিরে ভোগ পুজো সব দেওয়া হয়ে গ্যাছে। নৃসিংহপ্রতাপ তিলবাটা মাথায় ঘসে দীঘিতে চান করে এসেছেন এবং এসে খিড়কির পুকুরে একটি জিওল মাছ ছেড়ে দিয়ে নিজের দীর্ঘায়ু নিজেই কামনা করে পুজোপাঠ করেছেন। তখনো না সাড়া না শব্দ।

দুপুরে যখন রুপোর থালা-বাসনে সত্তর প্রকার ব্যঞ্জন সাজিয়ে প্লাস বৃহৎ একটি রুইমাছের মুড়ো আর বড় জামবাটির একবাটি পরমান্ন নিয়ে যুঁই ফুলের মতো

ফুরফুরে চামরমনি চালের ভাতটির সামনে খেতে বসেছেন আর গালচের আসনের ধারে কাছে মস্ত একটা পিলসুজের ওপর প্রকাণ্ড একখানা পেতলের প্রদীপ পেটভর্তি খাঁটি গাওয়া ঘি নিয়ে দপদপ করে জ্বলছে।

আগের আমলে এটাই ছিল জন্মদিনের শুভকাজের অঙ্গ। কেক কাটাকাটির তো চলন ছিল না। আর বয়েস গুনে জ্বেলে দেওয়া মোমবাতির সারি ফু দিয়ে নিভিয়ে দেওয়ারও পাট ছিল না। সেকালে লোকে বাতি নিভে যাওয়াটাই অলক্ষণ কুলক্ষণ মনে করতো। তাই প্রদীপে পেটভর্তি তেল, মোটা করে সলতে।

আর খানদানি বাড়িতে প্রদীপের পেট ভরানো হতো তেলের বদলে ঘিয়ে। আর প্রথম অন্নটি মুখে দেওয়া মাত্তর ভোঁ ভোঁ করে তিনবার শাঁখে ফুঁ দেওয়া।

তা সে সব পর্ব মিটেছে।

তোয়াজ করে খেয়ে চলেছেন নৃসিংহ। সত্তরটি পদ, সুযোগ মতে একবারও অন্তত মুখে ঠেকাতে হবে। তো ঠ্যাকাতে ঠ্যাকাতে যখন চাটনিতে এসে ঠেকেছেন, তখন আবার তিনবার ভোঁ ভোঁ শঙ্খধ্বনি।

কী হলো? আবার শাঁখ?

জিগ্যেস করতে না করতেই, ট্যাঁ ট্যাঁ কান্নার শব্দ। সদ্যোজাত শিশুর গগনবিদারী পরিত্রাহি শব্দ।

ওটা আবার কী? কাঁদে কে?

বুড়ি পিসি কাছে বসে পাখা নাড়ছিল। বলল,—ঘরে নতুন মানুষ এলো। তোর ব্যাটার ঘরে নাতি জন্মালো।

—অ্যাঁ, তাই নাকি? তার মানে নৃসিংহপ্রতাপের প্রপৌত্র এলো। তো আসবার কথা ছিল বুঝি?

—কথা ছিল বৈকি। তো দু-দশদিন বাদে আসার কথা। আচমকা আজই তোর জন্মদিনে হানকান করে ভূমিষ্ঠ হয়ে বসলো।

নৃসিংহ ক্ষীরের বাটিতে গোঁফ ডুবিয়ে মুচকে হেসে বললেন,—হুঁ। ব্যাটা খুব ধড়িবাজ হবে মনে হচ্ছে। ওরে কে আছিস। এই প্রদীপটায় আরো ঘি ঢেলে দিয়ে যা।

শুধু ঘি না, একেবারে খাঁটি গব্যঘৃত।

তো সেই প্রদীপ ঘি খেয়ে খেয়ে একনাগাড়ে জ্বলতে থাকল। ছ-দিন ছ-রাত। ষেটেরা পুজোর পরদিন সকালে তার ছুটি। রাতে বিধাতা-পুরুষ কপালে লেখন দিয়ে যাবার কাজ সেটা অবধি।

বিধাতাপুরুষ কী লিখে গেলেন কে জানে। তবে সেই জগদীশের কাছে খাঁটি গব্যঘৃত এখন স্বপ্নের বস্তু।

সাবেকি মানটির ঠাটবাট রেখে চলেছেন এখনো। ভাতের পাতে ঘি, দুধ, দই, চাটনি, পাতিলেবু কম্পালসারি।

গাওয়া ঘি বলে দেশ থেকে ঘি আনান বেশি দাম দিয়ে। তো সেই খাঁটি ঘিয়ের আড়াই ভাগ বনস্পতি। আর বাকি দেড়ভাগ ভঁয়সা।

তাহলে কী হবে। দেশের ঘি বলে ওতেই আত্মপ্রসাদ জগদীশপ্রতাপের।

'প্রতাপের' বালাই নেই কোথাও, তবু প্রতাপপুরের অহঙ্কার।

ওই যে নৃসিংহপ্রতাপের সঙ্গে জন্মদিনের মিল তাই তাঁর সঙ্গে যেন কেমন একাত্ম অনুভব করেন। আবার বাপের মুখে শুনেছেন, চেহারাতেও নাকি মিল।

তবে?

হলেও অবান্তর, মনেপ্রাণে জগদীশ প্রতাপপুরের বড়কর্তা। চালচলনে তদুপযুক্ত ছাপ রাখার আপ্রাণ চেষ্টা।

এই যে রাত দুপুরে খাতাপত্তর নিয়ে হিসেবে বসেছেন, তো টেবিল-চেয়ারের বালাই আছে নাকি? শোবার ঘরের মস্ত পালঙ্কাটাকেই 'কাছারি ঘরের ফরাস' মনে করে তার মাঝখানে জোড়াসনে বসে সামনে খুলে রাখা জাবদা খাতা দুটো থেকে কী সব মেলামিলি করছেন।

আগে আগে ভারী কাচের দোয়াতদানি সামনে বসিয়ে কলমে কালি ডুবিয়ে লিখতেন। ছেলে বলে বলে ফাউন্টেন ধরিয়েছিল। সম্প্রতি আবার 'আরো সুবিধে' দেখিয়ে নাতি ডটপেন ধরিয়েছে।

তা দেখছেন ব্যাপারটা মন্দ নয়। বেশ সুবিধের। কালের বদলের সঙ্গে সঙ্গে সুবিধে বাড়ছে বৈকি! তবে অসুবিধেও যে বাড়ছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, একথা জগদীশপ্রতাপ জোর গলায় ঘোষণা না করে ছাড়েন না।

এখন আর ছেলে তর্কে নামে না। তর্কটা নাতির সঙ্গে চলে। পাল্লাটা কোনদিকে ভারি, ডটপেনের না খাঁটি গাওয়া ঘিয়ের—এ তর্কের মীমাংসা হয় না।

রোজই হিসেব চলে।

টেবিলে খাওয়া আরামের না মাটিতে বসে খাওয়ার। প্যান্ট পায়জামা সুবিধের না লম্বা কোঁচা ধুতির।

নাতির প্রশ্নে দাদুর জবাব,—পেন্টুল পাজামা তো তোদের একালে জমিদারেও পরে, জমাদারেও পরে। কিন্তু লম্বা কোঁচা? কই দেখাদিকি কোনো জমাদারের.... টেবিলে খাওয়া?

যেন অফিস কাছারিতে কাজ করতে বসা। মাটিতে আসন পেতে ছড়িয়ে বসে খাওয়ার অভিজ্ঞতাই আলাদা। হিসেব করে দ্যাখ।

তা সে যাক।

এখন জগদীশ যে হিসেব নিয়ে বসেছেন, সেটি বেশ জটিল।

প্রতাপপুরের 'বাবুদের বাড়িটি' মানে নৃসিংহপ্রতাপের বানানো সেই প্রাসাদটির এখন এমন জরাজীর্ণ অবস্থা ঘটেছে যে, মেরামতি করে একটু ভদ্রস্থ করতে হলেও লাখ লাখ টাকার ব্যাপার। আসবে কোথা থেকে সে টাকা? আর সারিয়ে তুলেই বা

কী হবে? কে বাস করতে যাবে সেই ভুরসুট পরগনায় প্রতাপপুরে?

ছেলের মতে বেচে দাও। বরং ঘরে কিছু আসবে। মরা হাতি লাখ টাকা। ওই ভাঙা বাড়িরও এখন অনেক দাম পাওয়া যাবে।

—ভিটে আবার বেচব কী?

বলে প্রথমে খুব রাগারাগি করছিলেন জগদীশপ্রতাপ। ক্রমশ যুক্তিতর্কে নিমরাজি! কিন্তু মুশকিল এই—নয় নয় করেও সেখানে এখনো অনেক আসবাব-পত্তর। যাওয়াও হয় সেখানে। অন্তত জগদীশ তো যান।

সবাই যে 'বড়কর্তা বলে ছুটে আসে, এ আহ্লাদ গৌরব কি দার্জিলিং, কাশ্মীর, নৈনিতাল পাহাড়ে গেলে হবে?

তা সেসব যখন চুকে বুকে যাচ্ছে। জিনিসগুলো কী হবে? ছেলে আর বৌমা বলল— এখানে কাজে লাগার মতো যা কিছু আছে নিয়ে আসুন। বাকি বিলিয়ে দিয়ে আসুন।

কিন্তু এখানে কাজে লাগবার মতো অনেক কিছুই তো একে একে আনা হয়েছে। আর কী আনা হবে? ঘরে ঘরে যে বৃহৎ বৃহৎ পালঙ্ক বসানো আছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যে কাঁঠাল কাঠের সিন্দুকগুলো আছে এখানে সেখানে, বৈঠকখানা বাড়িতে যে ঝাড়লণ্ঠনটা ঝুলছে সেগুলে বিলোতে চাইলে বা নেবে কে? কার ঘরে এত জায়গা আছে?

তাছাড়া আর একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার আছে, যেটা নিয়েই এখন সমস্যা আর হিসেব নিকেশ। জগদীশের ঠাকুমা একদা বড়লোকের গিন্নির দেমাকে আবদার করেছিলেন, তাঁর 'লক্ষ্মীর ঘরটি'র অর্থাৎ পুজোর ঘরটির পুরো মেজেটা টাকা গেঁথে গেঁথে বাঁধিয়ে দিতে হবে। যেমন সব কাশী বৃন্দাবনের মন্দিরে দেখে এসেছেন।

যে কথা সেই কাজ।

আনানো হলো বস্তাভর্তি চকচকে আসলি চাঁদির টাকা। কোনোটায় মহারানীর মুখ, কোনোটায় তাঁর ন্যাড়ামাথা ছেলের মুখ। তা সেটি গুছিয়ে সাজিয়ে গাঁথতে মিস্ত্রিরাই পারবে। ডাকা হলো হিন্দু রাজমিস্ত্রি মুকুন্দকে। ঠাকুর ঘর বলে কথা! চিরকেলে রাজমিস্ত্রি রসিদ আর আবদুল হেসে হেসে বলল, —বাড়িখানা কিন্তু আমরাই বানিয়েছিলুম মা-ঠাকরুন। আপনার ওই লক্ষ্মীর ঘরটিও।

তা হোক। এখন ঘরে উঁচু তাকে লক্ষ্মীর পট। নতুন ধানের হাঁড়ি। সেসব থাকবে। শুধু মেজেটা খোঁড়াখুঁড়ি। তারপর টাকা গেঁথে গেঁথে মেজে বানিয়ে ফেলা।

এখন জগদীশ মহাফাঁপরে পড়েছেন ওই ঘরটার হিসেব নিয়ে। ক-হাত বাই ক-হাত ঘর। তার মেজেটা জুড়ে যে টাকা পোঁতা হয়েছে সে কত টাকা।

পুরনো—তস্য পুরনো সব খাতাপত্তর থেমে মজুর মিস্ত্রিদের দৈনিক 'রোজ'-এর হিসেব।

মুকুন্দর 'রোজ' ছ'আনা, তার মজুরের রোজ দু-আনা। কিন্তু ক'দিন লাগল আর কতগুলো টাকা পুঁতল তার হিসেব পাচ্ছেন না কোথাও। তাই রাত জেগে সেই আদ্যিকালের খেরো বাঁধান খাতা নিয়ে আঁতি পাঁতি খুঁজছেন।

ছেলে বলল,—অত হিসেবের কী আছে?

যখন খোঁড়াখুঁড়ি করতে লাগবে, তখন কেউ পাহারা দিতে উপস্থিত থাকবে। যত যা ওঠে।

তবে সত্যি টাকার এখন অনেক দাম। ষোলো আনার টাকা এখন অনেক বেশি দামে বিক্রি করা যাবে।

কিন্তু কে বসে পাহারা দেবে?

ছেলে বলে,—আপনার ঠাকুমার আবদারকেও বলিহারি যাই বাবা। ঘরের মেজেয় টাকা গেঁথে বাহার করে দিতে হবে। তিনি টাকা মাড়িয়ে মাড়িয়ে হাঁটা চলা করবেন। অথচ টাকা না কি মা-লক্ষ্মী, পা ঠেকে গেলে নমস্কার করতে হয়।

ছেলের বৌ বলল,—সেকালে জমিদার গিন্নিদের অহঙ্কারই ছিল আলাদা। সত্যি টাকা মাড়ানো উচিত?

জগদীশ বললেন,—এ প্রশ্ন আমিও করেছিলাম বাবাকে। বাবা বলেছিলেন, দেবমন্দিরে তো থাকে। এ তো ওঁর পুজোর ঘর লক্ষ্মীর মন্দির।

এখন পরের জেনারেশান বুঝুক ঠ্যালা।

বাড়ি বেচে দেব চুকে যাবে। তা নয় তার মেজে খোঁড়াও, টাকা ওপড়াও। তো গুনে দেখেছেন কখনো কত টাকা গাঁথা আছে?

ওরে বাবা! কে আবার কবে গুনে দেখতে গ্যাছে।

কিন্তু এখন ভাবছেন জগদীশ, গোনা থাকলে ল্যাঠা মিটে যেত। খোঁড়াখুঁড়ির মিস্ত্রিকে কড়া করে বলে দেওয়া যেত, দ্যাখো বাপু, এই আছে, একটুও যেন এদিক ওদিক না হয়।

সে শাসানির উপায় নেই।

তবু এই সত্তর বছরের জগদীশ এই রাত বারোটায়, বাড়ির সবাই যখন ঘুমে কাদা, আর রাস্তা নিঃঝুম, তখন পালঙ্কের ওপর বাবু গেড়ে বসে সামনে খেরোর খাতা খুলে সেকালের নায়েক গোমস্তাদের 'অনিন্দনীয়' ছাঁদের হাতের লেখা সব হিসেবপত্তর তন্ন তন্ন করে দেখছেন, যদি কোথাও লেখা থাকে কত টাকা পোঁতা হয়েছিল।

হঠাৎ একটা জায়গায় চোখ পড়ে গেল। আর চোখ যেন সেখানেই ফ্রিজ হয়ে গেল।

'কলিকাতার ট্যাঁকশাল হইতে আনয়ন করা হইল দেড় মণ রৌপ্যমুদ্রা ও...সের গিনি।'

কত সের? বোঝবার উপায় নেই। ঠিক সেইখানটায় পোকায় খেয়েছে।

দেড় মণ রৌপ্যমুদ্রা। ....এত সের গিনি।'

হঠাৎ ভারি রাগ হয়ে গেল জগদীশপ্রতাপের। কর্তারা সব যা ইচ্ছে করে গ্যাছেন। আর পরের জেনারেশানের ভাগ্যে শুধু ডুগডুগি।

টাকার হিসেব, গিনির হিসেব সংখ্যা নিয়ে নয় মণ সের দিয়ে। সাপের পা দেখছিলেন সব।

টাকা থাকলেই এইভাবে নয়ছয় করতে হবে?

রাগের চোটে জগদীশপ্রতাপের মনে পড়ল না চিরকালের পৃথিবীতে আদি অনন্তকাল থেকে তাই হয়ে আসছে। টাকা থাকলেই নয়ছয়। শুধু 'নয়ছয়ের' রীতি-পদ্ধতিটাই স্থান কাল পাত্রের হিসেবে আলাদা হয়।

নবাব বাদশারা তাদের জুতোয় হীরে মুক্তো সেঁটে বাহার করতেন। খানদানি বাবুর পোষা বেড়ালের বিয়েতে লাখ টাকা খরচ করতেন। আর বড় মানুষের গিন্নিরা শখ হলে তাঁর দাঁড়ের ময়না পাখি, টিয়াপাখির দাঁড়টাকে সোনা দিয়ে গড়িয়ে নিতেন।

তা শুধু সে যুগে কেন, এ যুগেও কি টাকা নয়ছয়ের কোনো হিসেব আছে? হুঁ। এ যুগে অতো সোনা রুপোয় বাহার না দিক শখের খাতিরে লাখ লাখ টাকা আকাশেই উড়িয়ে দেয়, বাতাসে ছড়িয়ে দেয়। কে ভাবতে যাচ্ছে দেশের কত লোক খেতে পাচ্ছে না।

রাগটা একটু প্রশমিত হলে জগদীশপ্রতাপ ভাবলেন, তা তো হলো। রুপোর টাকা ঠাকুর ঘরের মেঝেয় আর দেওয়ালের খানিকটা পর্যন্ত যে গেঁথে রাখা হয়েছে, সেটা তো চাক্ষুষই দেখেছি। তবে টাকাগুলোর ওজন যে দেড় মণ তা কে ভাবতে গ্যাছে?

বেশ মনে পড়ে ছেলেবেলায় জগদীশ আর তাঁর পিঠোপিঠি দিদি ঠাকুর ঘরে গেলেই গুনতে বসতেন, কতগুলো টাকা মহারানী মার্কা, কতগুলো ন্যাড়ামাথা রাজা মার্কা।

কিন্তু গিনি?

গিনি তো কোথাও সাঁটা থাকতে দেখেননি।

অথচ খাতায় স্পষ্ট করে গিনির হিসেব লেখা রয়েছে। গিনি...সের। লক্ষ্মীছাড়া কাগুজে পোকারা কেটে খাবার আর জায়গা পায়নি। ওই 'কত' সের তার সংখ্যাটি হাপিস করে দিয়েছে।

তা দিক, ছিল তো কিছু। দশ সের পাঁচ সের এক সের আধ সের যা হোক। কিন্তু

কোথায় তারা?

মাথাটা আরো ঝুঁকিয়ে খাতাটা আরো তন্ন তন্ন করে দেখছেন, হঠাৎ যেন সামনে একটা ছায়া পড়ল।

কে?

চমকে উঠলেন জগদীশ।

—কে? কে? কেরে ব্যাটা।

ব্যাপারটা কী? যতই রোগা সিড়েঙ্গে আর তোবড়ানো চেহারা হোক রাত বারোটায় বন্ধ ঘরের মধ্যে ঢুকে এল কীভাবে?

তবে কি আজ জগদীশ দরজায় খিল লাগাতে ভুলে গেছলেন? কিন্তু এমন ভুল তো হয় না জগদীশের।

গিন্নি চন্দ্রবিন্দু হয়ে যাওয়ার পর থেকে তো একাই থাকতে হয়। কাজেই বেশ জম্পেশ করেই সব বন্ধ করে তবে শোন।

ওঃ। দৈবাৎ একদিন হয়তো ভুলে গেছেন, আর অমনি ব্যাটা চোর এসে সেঁধিয়েছে? কোথায় ওৎ পেতে বসে থাকে?

যাক, সাবধানতার ঘাটতি নেই জগদীশের। কারণ এই ঘরেই লোহার সিন্দুক। এখন সব ব্যাঙ্কের ভল্টে।

সংসারের সব গয়নাপত্তর আর দরকারি কাগজপত্তর ভল্টে রেখে আসার ফ্যাসান হয়েছে। জগদীশ এ ফ্যাসানের গাড্ডায় পড়তে রাজি নয়। ছেলে বৌ যত বলে বলুক।

চোখের সামনে না থাকলে জিনিসটা ক্রমেই ছায়া ছায়া হয়ে যাবে না? একবার খুলে দেখবার ইচ্ছে হলে দেখতে পাবেন?

কেন, মজবুত সিন্দুকের অভাব আছে বাজারে?

আর তোমার গিয়ে ব্যাঙ্কই বা কী নিরাপদ? রাতদিনই তো 'ব্যাঙ্ক ডাকাতি'। ব্যাঙ্ক লুঠ।

জগদীশের মাথার শিয়রে লোহার সিন্দুক, মাথার বালিশের তলায় রিভলবার।

এর থেকে বুকের বল আর কিসে?

'কে?' বলে উঠেই জগদীশ হাত বাড়িয়ে মাথার বালিশের তলায় হাত চালিয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে সামনের মূর্তিটা বলে উঠল, উঁ-হু-হু দোহাই বড়োকত্তা অমন কাজটা করবেন না। ওতে আপনার লোকসান বৈ লাভ হবে না!

বড়কর্তা।

তার মানে চেনা চোর।

অর্থাৎ প্রতাপপুরের জানিত।

হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললেন,—হুঁ। তা সত্যি। তোর মতন একটা ছুঁচোকে মেরে

গুলিটাই লোকসান। তো কে তুই?

আজ্ঞে কেউ না।

কেউ না। বটে? তামাসা? তবে তো দেখছি মরণের কাল ঘনিয়ে এসেছে তোর। ইষ্টনাম স্মরণ কর ব্যাটা। এই চালালাম হাত বালিশের তলায়।

আজ্ঞে বড়কর্তামশাই, আমাদের মতো নিকৃষ্ট জনের আবার ইষ্টনাম! আর বাঁচাই বা কী, মরাই বা কী!

—হুঁ। খুব কথা জানিস দেখছি। তো বড়কর্তা বললি কোন্ সুবাদে?

—শৈশবাবধি শুনে আসছি, ওই সুবাদে।

—বুঝেছি। প্রতাপপুরের 'মাল'। তো বাঘের ঘরে ঘোগ? বড়কর্তার ঘরে এসে সেঁধিয়েছিস চুরি করতে?

—আ ছিঃ ছিঃ! অমন কথা বলবেন না কর্তা! আপনার ঘরে সেঁদুবো চুরির মতলবে?

—বটে? তা' মাঝরাত্তিরে দোরটা একটু খোলা পেয়ে সুড়ুৎ করে ঢুকে এসেছ কীসের মতলবে যাদু? কর্তার পা টিপে দিতে? না পাকাচুল তুলে দিতে?

—হিসেবের খাতার পাতা পোকায় কেটেছে দেখে চিন্তে করছিলেন। তাই ভাবলুম...।

জগদীশ সোজা হয়ে চড়া গলায় বলে ওঠেন,—বলি তুই লোকটা কে? নাম কী?

—আজ্ঞে জ্ঞানাবধি তো দেখে আসছি সবাই বৈকুণ্ঠ বলে ডাকে।

—বটে। নাম জানো না? সবাই বৈকুণ্ঠ বলে ডাকে সেটাই জানো। পাজি বদমাস। একটা কথার সিধে জবাব দিতে জানো না? বলি প্রতাপপুরে তো মেলাই বৈকুণ্ঠ। টাক বৈকুণ্ঠ, খোঁড়া বৈকুণ্ঠ, কুমীর-খাওয়া বৈকুণ্ঠ....।

—আজ্ঞে ওনারা তো সব সজ্জন। এ হতভাগা হচ্ছে মুকুন্দ মিস্ত্রির ব্যাটা, মিস্ত্রি বৈকুণ্ঠ! এখন অবশ্য পাবলিকে বলে...।

—অ্যাঁ। কী বললি?

স্প্রীংয়ের পুতুলের মতো ছিটকে খাড়া হয়ে বসলেন জগদীশ।

—চালাকি খেলতে আসার আর জায়গা পাওনি ব্যাটা? রাগের মাথায় আপন খুড়োর মাথাটা থান ইটের ঘায়ে গুঁড়ো করার দায়ে তার না ফাঁসি হয়েছে! আর তুমি ব্যাটা...।

লোকটা অকুতোভয়ে বলে,—আজ্ঞে ফাঁসি হয় নাই, একথা তো বলি নাই। সেই তরেই তো বলতে যাচ্ছিলুম, এখন পাবলিকে নামটা উচ্চারণ করতে বলে 'খুনে বৈকুণ্ঠ'। আমার ঘরখানাকে বলে 'খুনে বৈকুণ্ঠর বাড়ি'।

—ওঃ। তা ফাঁসির ফাঁস আলগা করে ফেলে জেলখানা থেকে পালিয়েছিলি তাহলে? বদলে আর একটা নকল বৈকুণ্ঠ ফাঁসিতে ঝুলল?

আ, ছিঃ ছিঃ। —শিউরে উঠল লোকটা—

ওকথা বলবেন না কর্তা। প্রাণে বড় দাঁগা পাবো। তবে হ্যাঁ ঘটছে এমন ঘটনা রাতদিনই। জেলখানার মধ্যে কতজনই যে অপরের নামে 'প্রক্সি' দিয়ে ঘানি ঘোরাচ্ছে, পাথর ভাঙছে, তার সীমে সংখ্যা নাই। আর ফাঁসি? তাও মাঝে মধ্যে দু-একটা প্রক্সি চলে বৈকি! তা ওসব হলো গে পয়সাওলা লোকদের কারবার। হতভাগা বৈকুণ্ঠ মিস্ত্রির বলে পান্তোর ওপর নুন জুটতো না। সে কিনতে যাবে ফাঁসি খাবার মানুষ! ছ্যা।

—থাম বদমাস! কেবল প্যাঁচানো কথা।

জগদীশ প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে উঠে রিভলবারটা টেনে বের করে বাগিয়ে ধরে বললেন,—সিধে জবাব দে। বলি ফাঁসিটা শেষতক হয়েছিল, না রদ হয়ে গিয়েছিল?

—আজ্ঞে গরিবগুর্বোর কী আর শাস্তি রদ হয় বড়কর্তা? সেও বড় মানুষদের ঘটনা।

—ফের? বললাম না, সিধে জবাব দিবি। বলি ফাঁসিটা হয়েছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কার হয়েছিল?

—ওই তো রাজমিস্ত্রি বৈকুণ্ঠের।

—তাহলে তুই কে?

—ওই তো বলুলম, আজ্ঞে 'কেউ' বললে ওই বৈকুণ্ঠ মিস্ত্রি! আবার কেউ না বললেও চুকে যায়।

—আবার!

জোরে একটা ধমক দিতে যাচ্ছিলেন জগদীশপ্রতাপ। হঠাৎ দরজায় ধাক্কা পড়ল। তার সঙ্গে জগদীশ-এর ছেলে অমিতপ্রতাপের উদ্বিগ্ন গলার স্বর,—বাবা; দরজাটা একটু খুলুন তো!

জগদীশ একটু হতচকিত হলেন। তাহলে তো ঘরের দরজা বন্ধই আছে। ভুলে খুলে রাখিনি। তবে? ওই পাজিটা অথবা পাগলটা ঘরের মধ্যে ঢুকল কী করে?

সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য মাথায় খেলে গেল, তার মানে ব্যাটা আগেই কোনো ফাঁকে ঢুকে পড়ে খাটের নিচে-টিচে লুকিয়েছিল। জগদীশ যখন খাওয়া-দাওয়া করছিলেন তখন তো আর দরজায় তালা লাগিয়ে যাননি। এবার থেকে তাই করতে হবে দেখছি।

তা এসব তো মুহূর্তের চিন্তা।

খাট থেকে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে দরজাটা সাবধানে খুলতে গেলেন, পাছে বৈকুণ্ঠবাবাজি ফস্ করে বেরিয়ে সটকান দেন।

কিন্তু এ আবার কী! কোন্ ফাঁকে ফট্ করে কোথায় গা-ঢাকা দিল?

কোথায় আর সেই খাটের নীচেই। আচ্ছা থাকো বাবাজি। দ্যাখো তোমার কী হয়।

দরজাটা খুলেই নিজেই প্রশ্ন করলেন,—কী হল?

ছেলে বলল,—আমাদের আবার কী হবে? আপনার কী হল তাই জানতে এলাম। মনে হল হঠাৎ যেন কাউকে ধমকে উঠলেন।

জগদীশ মনে মনে হাসলেন। বাবুর কান মাঝরাতেও খাড়া।

—ও হ্যাঁ। তা দিয়েছিলাম বটে।

—এত রাত্তিরে—বন্ধ ঘরের মধ্যে কাকে?

খাটের নিচের দিকে একটু অলক্ষ্যে তাকিয়ে জগদীশ একটু মজা করার গলায় বললেন,— 'কাউকে' বললে কাউকে। আবার কাউকে নয় বললে নয়।

ছেলের পিছু পিছু বৌমাও চলে এসেছে। দু'জনে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করে বলল,—মানে?

—মানে এক ব্যাটা ছুঁচো এসে জ্বালাচ্ছিল....।

বৌমা ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরটার দিকে তাকিয়ে দেখে অবাক হয়ে বলল,—এই ওপরের ঘরে ছুঁচো!

—সেই তো....।

ছেলে চমকে উঠে বলল,—বাবা, আপনার রিভলবারটা খাটের ওপর পড়ে আছে কেন?

—ওই তো....।

জগদীশ অম্লান গলায় বলেন,—ভেবেছিলাম, জ্বালাচ্ছে নিকেশ করে দিই। তো ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে আর ইচ্ছে করল না।

কী কাণ্ড! ঘরের মধ্যে ছুঁচো।

তো সেটাকে তো তাড়াতে হবে।

ছেলে ফটাফট ঘরের আর দুটো আলো জ্বেলে দিয়ে আলনায় ঝোলানো জগদীশের শৌখিন ছড়িটা নিয়ে খটাখট খটাখট তাড়া লাগিয়ে ঘর তোলপাড় করে তুলল।

খাটের নিচেটায়?

তা দেখল বৈকি। টর্চ জ্বেলে হেঁট হয়ে।

ইত্যবসরে নাতিও ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে।

—কী হয়েছে দাদু? এত রাত্তিরে সবাই হট্টগোল করছ কেন?

দাদু প্রতিভভাবে বলেন,—কিছু না দাদু, ঘরের মধ্যে একটা ছুঁচো ঢুকে পড়েছিল, সেটাকে তাড়াতেই—কিন্তু কোন্ ফাঁকে সে হাপিস হয়ে গেল। অবশ্য ছুঁচো, 'চোর বললে চোর'।

—ছোর অ্যাঁ! কই? কোথা দিয়ে পালাল?

জগদীশের চিন্তার সুর,—তাইতো ভাবছি।

—বাবা!

অমিতপ্রতাপ বলল,—আপনি রাত অবধি জেগে জেগে ওইসব পচা পচা ভুতুড়ে খাতাগুলো দেখতে বসবেন না। খাতাগুলো দেখলেই তো আমার মাথা ঝিমঝিম করে।

আর ছেলের কথা শেষ হতে না হতেই বৌমা বলে উঠলেন,—আর রাতের খাওয়াটা একটু হাল্কা হলে ভালো হয়। আপনাদের প্রতাপপুরের পাঠানো ক্ষীরের সঙ্গে খাঁজা কাঁঠাল পাকা আম আর তার সঙ্গে খাস্তা লুচি চটকে মেখে—ওঃ! আমার তো দেখেই পেট ব্যথা করে। খাবার কথা ভাবতেই পারি না।

—হা-হা-হা।

জগদীশপ্রতাপ এই মাঝ-রাত্তিরেই ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলেন।

—তা পারবে কোথা থেকে? —জন্মাবধি তো ভয়ে ভয়ে না খেয়ে খেয়ে নাড়ি মরা। আমার ঠাকুর্দা একটা আস্ত কাঁঠাল খেতেন বুঝলে? একাসনে বসে এককুড়ি বড় সাইজের ল্যাংড়া আম। আর একটা ছাগলও একা সাবাড় করতে পারতেন। আমার ঠাকুমাটিও কম যেতেন না। বলতেন, আমের সময় আবার দু-বেলা ভাত খেয়ে মরি কেন? ...তাই তাঁর রাতে ভাতের পাট থাকত না। দাসীরা কেউ একজন এক ঝুড়ি আম, এক গামলা জল আর একখানা বঁটি নিয়ে বসতো। আর ঠাকুমা বসতেন একখানা খালি থালা আর এক কাঁসি ভর্তি মাছের ঝোল নিয়ে। একটির পর একটি আম ছাড়িয়ে পাতে দিয়ে চলেছে, আর তিনি খেয়ে চলেছেন। গোনাগুনতির ধার ধারতেন না। তবে সঙ্গে ওই সর্ষেলঙ্কার গরগরে মাছের তেল ঝালের টাকনা। নিজের গাছের আম, পুকুরের মাছ, গোনাগুনতি কীসের?

নমস্য মহিলা।

বৌমা বললেন—তা না হলে আর অমন সব প্ল্যান মাথায় আসে? টাকা পুঁতে পুঁতে ঠাকুর ঘরের মেজে বাঁধাবো। 'মোজাইক' কোথায় লাগে। এ একেবারে বাহারের চূড়ান্ত।

জগদীশ আবার হেসে উঠলেন।

—তা যা বলেছো বৌমা। এই তো হিসেবের খাতায় সেই টাকার ওজন দেখে চক্ষু- চড়কগাছ। ...কলিকাতার ট্যাকশাল হইতে দেড় মণ রৌপ্যমুদ্রা আনয়ন করা হইল।

—দেড় মণ রৌপ্যমুদ্রা। শুনে মাথা ঘুরছে বাবা। শুতে যাচ্ছি।

বৌমা নেমে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে নাতিও। শোনা গেল প্রশ্ন করছে,—'মণ' কী মামণি?

অমিতপ্রতাপ বলল,—রিভলবারটা আমায় দিন তো।

—কেন? তুমি আবার কী করবে?

—থাক না আমার কাছে। আপনি ঘুমের ঘোরে কী করতে কী করে বসবেন, কী বলা যায়।

—হা-হা-হা। ভাবছিস বাবাটার মাথার গোলমাল হয়েছে। নারে বাবা না। এখন পরামর্শ দে দিকি। বাড়িখানা হাতছাড়া করার আগে ওই দেড়মণ রৌপ্যমুদ্রা উপড়ে নেওয়া যায় কীভাবে?

—কাল দিনের বেলা ভাবা যাবে বাবা। এখন শুয়ে পড়ুন।

আবার ফটাফট জোরালো আলোগুলো নিভিয়ে দিয়ে ছেলে দরজাটা টেনে ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

জগদীশ তাড়াতাড়ি দরজার খিল ছিটকিনি দুটো লাগিয়ে, ঘুরে এসে আবার খাটের ওপর বসতেই যেন খিক খিক করে একটা হাসির শব্দ পেলেন।

—কে? কে? অ্যাঁ!

—খুব বোপাটে পড়ে গেছলেন বড়কর্তা, কী বলেন? ছেলে বৌমা নাতি পর্যন্ত ছুঁচো খুঁজতে হাল্লাক।

জগদীশ সন্দেহের গলায় বলেন,—তোর রকম সকম দেখে তো তোকে মানুষ বলে মনে হচ্ছে না বাপু?

—আজ্ঞে আপনি হচ্ছেন বিচোক্‌খোন বেক্তি।

—ফাঁসি খেয়ে মরে অপদেবতা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস নাকি?

—আহা বড় ভাল নামটি তো দিলেন কর্তা। অপোদেবতা। বাড়তি একটা 'অপো' থাকলেও দেবতার দরে চলে এলুম তা'লে?

—হুঁ। তো হঠাৎ আমার এখানে এলেন কেন বাপু? মতলবটা কী?

জগদীশ রিভলবারটা বালিশের তলায় গুঁজে রেখে খাতার বোঝা বন্ধ করে সরিয়ে রেখে বাবুগেড়ে গুছিয়ে বসে বললেন,—শুনি তোর মতলব!

—কোনো কুমতলোব নাই বড়কর্তা। সাত পুরুষে আপনাদের খেয়ে মানুষ। ওই যে আপনার ঠাকুরমার টাকা পোঁতা ঘর, ও ঘর তো আমারই বট্‌ঠাকুর্দা বানিয়েছিল।

—অ্যাঁ তাই না কি? কে সে? নামটা কী?

—আজ্ঞে বাবার জ্যাঠা। নাম ছিল পাতকীচরণ। হিন্দু সম্প্রদায়ের মিস্ত্রিদের মধ্যে খুব নাম ডাক ছিল। দেবমন্দিরের কাজকম্মো তো অহিন্দু মিস্ত্রি দিয়ে চলতো না।

—বটে না কি? খুব যে ভাঁওতা দিচ্ছিস। ঘরবাড়ি মঠমন্দির পুজোর দালান এসব কারা বানায়? আমি তো বরাবর দেখছি রসিদ মিস্ত্রি আর তার ছেলে বাহার মিস্ত্রি....!

—বড়কর্তা। সে সব হল গে পুজোপাঠ আরম্ভ হবার আগে। আরম্ভ হয়ে যাবার পর কোনো কাম পড়লেই ডাক পড়তো এই আমাদের।

—বুঝলুম। তে-তোর বাবার জ্যাঠাকে তুই দেখেছিস?

—দেখেছি। একশোর কাছে বয়েস হয়েছিল। নামিয়ে বসিয়ে দিতে হতো। আমারে খুব ভালবাসতো। যতো গপ্পো আমার সঙ্গে।

—হুঁ। শৈশব থেকেই এঁচোড় পাকা! তো খাতায় হিসেব দেখছি, রুপোর টাকা, ওজন দেড়মণ। তা থেকে কতটি সরিয়েছিল ঠাকুর্দা, সে গপ্পো কখনো করেছিল তোর কাছে?

সিড়েঙ্গে বৈকুণ্ঠ সড়াৎ করে একদম সোজা।

—ছিঃ ছিঃ। অমন পাপ কথা মুখে আনবেন না হুজুর। এ কী বৈঠকখানা ঘরের কাজ-কাম? যে তা থেকে কিছু মারবে? ঠাকুর ঘর বলে কথা!

—ওঃ। ধর্মজ্ঞানী পুরুষ। তো বল দিকিনি গিনির হিসেবটা কী? সেও নিশ্চয় তোর বড় ঠাকুর্দা....।

থামতে হল।

আবার দরজায় ধাক্কা।

—বাবা! দরজাটা আর একবার খুলুন তো।

জগদীশ গলা নামিয়ে বললেন,—আজ আর হোল না।

এখন যা। কাল আবার আসিস।

উঠে দরজা খুললেন জগদীশ।

—কী? আবার কী হল?

—কী হল সেটাই তো জানতে এসেছি।

ছেলের স্বর বেজায় বিরক্ত উত্তেজিত।

—মনে হচ্ছে আপন মনে কথা বলে যাচ্ছেন। শুনতে পাচ্ছি তখন থেকে।

জগদীশ আত্মস্থ।

বললেন,—কইছি তাই না কি?

—মাঝরাত্তিরে একা একা কথা বলবেন মানে? ঠিক আছে আমি এ ঘরে শুই।

—মাথা খারাপ। তুই আবার কী করতে শুতে আসবি?

—তো আপনি যদি....।

—আরে বাবা কিছু না কিছু না। আমার মেজ মামা বলতো, রাত্তিরে যদি ঘুম না আসে তো খবরদার ঘুমের ওষুধ খেতে যাবি না। এক মনে ধারাপাতে পড় 'কড়াকিয়া', 'গণ্ডাকিয়া', 'কাঠাকিয়া' আউড়ে যাবি। দেখবি ঘুম 'বাপ বাপ' করে আসতে পথ পাবে না! যা যা শুতে যা। আর কথা-টথা শুনতে পাবি না।

ছেলেকে প্রায় ঠেলে বার করে দিয়ে দরজা বন্ধ করলেন।

শুয়ে পড়লেন। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন, কাল আবার আসতে বললাম। আসবে তো? এসে খুব ফিসফিসিয়ে কথা বলতে হবে।

কিন্তু আচ্ছা, ভূত-টূত বলে তো মনে হচ্ছে না। কই কথা বলতে তো গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল না। ভয় ভয় ভাবও করছিল না। অথচ ঢোকা বেরোনোও তো টের পাওয়া গেল না। একা আমার বুড়ো চোখ নয়, আরো তিন জোড়া চোখ তল্লাস করেছে ঘর।

আমাদের প্রতাপপুরে ছেলেবেলায় দেখেছি গোষ্ঠ তেলির ঠাকুমা একটা বিদ্যো জানতো। ধুনোপড়া।

চোরেরা নাকি গোষ্ঠর ঠাকুমার কাছ থেকে ওই ধুনোপড়া শিখে নিয়ে চুরি করতে বেরোত।

না এলো তো চুকেই যাবে। না এলে বোঝাই যাবে চোর জোচ্চোর। আর একে....।

ঘুমটা সরে এসেছে, কানের কাছে মাছির পাখা নাড়ার মতো ফিসফিস শনশন শব্দ।

—বড়কর্তা। ঘুমালেন না কি?

ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলেন জগদীশপ্রতাপ।

নাইলনের মশারি। মশারির মধ্যে থেকেই দেখতে পেলেন একটা ছায়ামূর্তি।

—একী। অ্যাঁ! আবার এক্ষুনি এলে যে? বলে দিলাম না কাল আসতে।

বললেন অবশ্য খুব চাপা গলায়।

—আমাদের আবার কালাকাল। কী বা রাত কী বা দিন। ...ওই গিনিগুলোর হদিস জানতে বট্‌ঠাকুর্দার সন্ধানে ঘুরপাক খেলুম কে জানে কতক্ষণ! তারপর মনে হল 'কাল'কে এসে গেছে। কিন্তু এসে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল বড়কর্তা।

—কেন হঠাৎ খারাপ কেন?

—আজ্ঞে হুজুর, আপনাদের বড় সন্দ বাতিক। এখনো ভাবতেছিলেন ব্যাটা বৈকুণ্ঠ ভূত না চোর।

—বটে। আমি কী ভাবছিলাম তা টের পেলি কী করে?

—সেই তো। ওই রোগেই তো সুখ-শান্তি গ্যাছে। না বলতেই সব বুঝে ফেলি।

—দ্যাখ্ বাপু, ভূতে বিশ্বাস অবিশ্বাস সবটাই মনুষ্য জন্মের একটা রোগ। তুই যখন বেঁচেছিলি, সহজে ভূত বিশ্বাস করতিস?

—বেঁচে? হতভাগা বৈকুণ্ঠ আবার বেঁচেছিল কবে বড়কর্তা? মরেই তো থাকতো।

—নাঃ। সোজা করে কথা বলার ধাতই নেই তোর। তা তোর বট্‌ঠাকুর্দার সঙ্গে দেখা হল?

—হওয়া খুব কঠিনই হচ্ছিল। ওনারা হচ্ছেন পুণ্যাত্মা। স্বর্গে ওনাদের পুণ্যির ওজন মাফিক সব মহল্লা। আমাদের মতন গলায় দড়ি পাপী-তাপীদের সেখানে পৌঁছবার পাশপোর্টই নাই। তবে...।

—থাম। থাম। ওই মহল্লাটা কী জিনিস?

—ও আজ্ঞে অন্য কিছু না, নামী নামী শহরের 'এস্‌টাইল'। কে কোন মহল্লায় ঠাঁই পেয়েছে জানতে পারলেই বোঝা যাবে কার কতটা পুণ্যি। এই যেমন আপনাদের রাজধানীতে—বাসার ঠিকানা শুনলেই বুঝতে পারা যায় কে রাজা, কে

গজা। কে মন্ত্রী, কে যন্ত্রী। কে অফিসার, কে কেরানী। কে এলেমদার, কে জমাদার।

—বটে! রাজধানীর এত কথা জানিস তুই?

—আজ্ঞে এখোন তো আর রেলভাড়া লাগে না! সর্বত্র চড়ে বেড়াই আর দেখি।

—হুঁ। কিন্তু ঠাকুর্দার কাছে যেতে পাশপোর্ট লাগে কেন?

—সে আজ্ঞে ওখানকার আইন। বড় কড়া আইন। তবে কিনা পাহারাদারকে একটু ঘুষ টুস দিয়ে...।

—অ্যাঁ। স্বর্গেও ঘুষ।

—আজ্ঞে কর্তা, ঘুষ আর কোথায় নাই?

খিক খিক একটু হাসির শব্দ।

—থাক। আমার আর জেনে কাজ নেই। ঠাকুর্দা কী বলল তাই বল?

—বলল? বলল যে...।

ঘর অন্ধকার। জোর পাখার বাতাসে মশারি উড়ছে।

বৈকুণ্ঠকে এক-একবার দেখা যাচ্ছে, এক-একবার যাচ্ছে না।

—কী রে? কী হল? থেমে গেলি যে? চলে গেলি নাকি?

—আজ্ঞে চুপ চুপ। সিঁড়িতে যেন কার পদশব্দ শুনলুম। আবার না ছোটকর্তা দরজা ধাক্কায়।

—ধাক্কাক। আমি অঘোরে ঘুমোচ্ছি। ক্যানেস্ত্রা পিটোলেও ঘুম ভাঙবে না।

—বলল, গিনি ছিল আজ্ঞে সাড়ে বারো সের। ঠাকুর্দার সাক্ষাতে ওজন হয়েছিল।

—সা-ড়ে বা-রো সের গিনি!! বৈকুণ্ঠ, এখন তার কত দাম?

—জানা নাই বড়কর্তা। চিরদিনই আদার বেপারি জাহাজের খবর রাখি না।

—আমিই বলছি—অনে-ক দাম। হিসেব করতে গেলে মাথা গুলিয়ে যাবে। ছেলেকে জিগ্যেস করতে হবে। এখন কী উপায়, তা বল?

—আজ্ঞে কীসের উপায়?

—ওই সোনা রুপো উদ্ধারের। ...বৈকুণ্ঠ! চুপ করে গেলি যে! এই বৈকুণ্ঠ।

—আজ্ঞে ঠাকুর্দাকে শুধিয়ে এলাম।

—এক্ষুনি শুধিয়ে আসা হয়ে গেল?

—তা হল আজ্ঞে। মনোরথে চেপে যাওয়া-আসা। তো ঠাকুর্দা বলল, উদ্ধারের উপায় কম। মিস্ত্রি উপড়োতে গেলে চুরি করে সাফ করে দেবে।

—আরে বাবা, পাহারা থাকবে।

—যে রক্ষক সেই ভক্ষক হবে। আর চুরি না করে তো গরমেণ্টের ঘরে খবরটা তুলে দেবে। ব্যাস্। পুলিশি জেরা চলবে। এত অবধি তোমার পূর্বপুরুষ পেল কোথায়? হিসেব দাও। না দিতে পারলে গারদে যাও।

—ওই সেরেছে। তাহলে তো বড় বিপদ।

—আজ্ঞে আপনাকে আর আমি কী বলব? তবে ঠাকুর্দা বলতো, সম্পদই বিপদ। তো এখন ঠাকুর্দা বলল, বড়কর্তাকে বলগে, যা করার তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে। পুরাতন অট্টালিকাখানা দানই করুন আর বেচেই দিন, যেন চটপট করেন।

জগদীশ সন্দেহের গলায় বলেন,—কেন রে বাপু? বড়কর্তার দিন ফুরিয়ে আসছে না কি?

—আহা। ঈশ্। তা নয় আজ্ঞে। ওই অট্টালিকাখানারই দিন ফুরিয়ে এসেছে। কোনদিন না হুড়মুড়িয়ে ভূমিসাৎ হয়। মেরামত তো হয় নাই দু-পুরুষ কাল।

—মেরামত। হুঁ। ও বিশাল বাড়ি মেরামত করা বড় সোজা? তা বলে এক্ষুনি পড়ে যাবে?

—আজ্ঞে যেতে পারে তো! আমি বলি কি কর্তা, এই মওকায় বেচে দিন। মোটা টাকা ঘরে আসবে। তারপর হিঃ হিঃ। পড়ুক হুড়মুড়িয়ে। আপনার কাঁচকলা।

জগদীশ রেগে বললেন,—তার মানে জেনে বুঝে লোকঠকানো!

—তো সে যদি বলেন তো একখানা ধম্মোপুণ্যির আখড়া খুঁজে দানই করে দ্যান।

—তাও তো ঠকানো। জানছি যখন পড়ে যাবে।

—বাঃ, তাতে আর ঠকানোটা কোতা? তানারা তো গাঁটের কড়ি খরচ করে কিনচেন না? তানাদের আগেও ছিল না। পরেও থাকবে না। মাঝখানে দু-দিন নেত্য করে নেবে। তাছাড়া আপনার পুণ্যির ছালাখানায় মোটা খানিকটা পুণ্যি জমা পড়বে। ...যখন দানটা করবেন, খপরের কাগজের লোক আসবে। ফটাফট ফটক উঠবে।

জগদীশ একটা নিঃশ্বাস ফেললেন।

—বৈকুণ্ঠ। বললি তো ভালো। কিন্তু ওই দেড় মণ মহারাণী মার্কা টাকা আর সাড়ে বারো সের গিনি!!

—ও আর চিন্তা করে লাভ নাই বড়কর্তা। ওসব তো আপনার গাঁটের থেকে যাবে না? যাদের গেল তেনারা তো আগেই পগার পার হয়ে গ্যাছেন।

—ঠিক। ঠিক। অ্যাঁ। তাইতো। বাঁচালিরে বৈকুণ্ঠ।

—তো এখন যাই বড়কর্তা। আবার আসতে অনুমতি করবেন তো? আপনার কাচে এলে বড় সুক পাই।

বড়কর্তা কিছু জবাব দেবার আগেই দরজায় টোকা।

ব্যাস্। বড়কর্তা চাদর মুড়ি দিয়ে সপাট।

টোকা। টোকা থেকে ধাক্কা। ধাক্কা থেকে দুমদাম। দমাস-দমাস।

কিন্তু জগদীশ তো অঘোরে নিদ্রায়।

তবে ভয় খাবার কিছু নেই। নাক ডাকছে বাঘের গর্জনে।

সকালবেলা ছেলে বলল,—বাবা। আপনাকে আর একা শুতে দেওয়া হবে না।

—কেন? কেন হে বাপু? আমার অপরাধ?

—আপনি রাতের বেলা সারারাত বিজবিজ করে কথা বলে চলেন। এটা একটা ব্যাধি।

—ব্যাধি! ওঃ! সারারাত বিজবিজ? বলি নাক ডাকায়টা কে?

—সেটা শেষ রাতে। আপনার ঘরে আজ থেকে কেউ শোবে।

—কেউ শোবে না। আমি আজই প্রতাপপুরে যাচ্ছি।

—প্রতাপপুরে? একা?

—একা ছাড়া...তোমাদের সময় আছে? দ্যাখার অভাবে ওই বিশাল অট্টালিকাখানা ধ্বংস হতে বসেছে। ওটাকে আমি ওখানেই হরিসভায় দান করে আসবো।

ছেলে-বৌ দু'জনেই একসঙ্গে চমকে উঠল।

—অ্যাঁ! দান করে আসবেন? এখন ওর দাম কত ভেবেছেন? আমি তো একটা খদ্দের ঠিক করার চেষ্টায় আছি।

জগদীশ মনে মনে বলেন, লবডঙ্কা। তোমার চেষ্টা সফল হবার আগেই বাড়ি মাটিতে শোবে।

মুখে বললেন,—না না। পিতৃপুরুষের ভিটে বেচা হবে না। দানই করে দেবো।

—আর ওই ঠাকুর ঘরের মেজেয় আর দেয়ালে পোঁতা খাঁটি রুপোর টাকাগুলো?

—পারিস তো উপড়ে নিয়ে আয়।

—সে তো আর সোজা কথা নয়।

—তাই তো বলছি যেটা সোজা সেটাই হোক। দান করে দেয়া হোক। আমি আজই যাচ্ছি। একটা টিকিট আনিয়ে রাখি।

ছেলে রাগমাগ করে বলল,—একটা নয় দুটো। আপনাকে তো আর এই বয়েসে একা ছাড়তে পারি না।

—তবে চল্। ভালোই হবে। ফটাফট ফটো ওঠাবার সময় তোরও উঠে যাবে। কাগজে ছাপা হবে।

শুনে বৌ বলল,—আমিও যাবো।

—বেশ তো। চলো একবার শেষ-মেষ ভিটেবাড়ির দেশে।

যাওয়া হলো।

দিব্যি সমারোহ করেই যাওয়া হলো। ছেলে বৌ নাতি চাকর সবাইকে নিয়ে।

কিন্তু?

কারোর ভাগ্যেই কি ফটো-ওঠা জুটল, কাগজে ছাপা হতে?

নাঃ, কপালে ঘি না থাকলে কি হবে?

সন্ধেরাতে পৌঁছলেন। সাপখোপের ভয়ে পুরনো বাড়িতে না উঠে ওখানের বাসিন্দা জ্ঞাতিদের বাড়িতে উঠলেন। ব্যাস্, সন্ধের পর থেকেই বৃষ্টি! ওঃ কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি। যেন প্রলয়কাল ঘনিয়ে এসেছে। শুধু তো বৃষ্টিই নয়, সঙ্গে ঝড়ও।

জ্ঞাতিরা বলল,—দশ বছরের মধ্যে এমন ঝড়বৃষ্টি দেখিইন। গাছ উপড়ে পড়ছে মড়মড়িয়ে, ঘরের চালাটালা ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে দু-দশ মাইল দূরে। দীঘি-পুকুরের জল উপছে উঠে লোকের বাড়িতে ঢুকে আসছে। কতজনের কত কী ঘটল।

আর?

আর সেই রাতেই ঘটে গেল সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটি। বৈকুণ্ঠর ঠাকুর্দা যার ওয়ার্নিং বেল দিয়েছিল।

কিন্তু সকালবেলা দিব্যি আকাশ ফর্সা।

ঘুম টুম নেই। সকাল হতেই বেরিয়ে পড়লেন জগদীশ।

দেখলেন সেই দেড়মণ রুপোর টাকা আর সাড়ে বারো সের গিনির ওপর হাজার হাতার মণ ইট পাথর লোহা-লক্কড়ের স্তূপ।

হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছেন জগদীশ।

কানের গোড়ায় সহসা ফিসফিস।

—মন খারাপ করবেন না বড়কর্তা। ভবিষ্যৎকালে কোনো একদিন এই স্তূপ খনন হয়ে এইসব পুরাতন মুদ্রা...ইয়ে আবিষ্কার হবে।

—তুই? তুই এখানেও?

—আজ্ঞে আমাদের তো এখানেই বাস। তিন পুরুষ যাবৎ।

জগদীশ এদিক ওদিক তাকালেন। কাউকেই দেখতে পেলেন না। কেউ কোথাও নেই।

—দিনের বেলাও ঘুরিস?

—আজ্ঞে আমার আবার দিন আর রাত। আমি তো সবসময়ই আপনার সঙ্গে সঙ্গে।

—তা তোর ঠাকুর্দার দেখছি গণনায় ভুল। পুণ্যির ছালাটা ভরতে তো তর সইল না।

—না হোক গে। এমনিই আপনার অনেক আছে। পরের ধনে পোদ্দারি করে লাভটা কী? সে ভদ্দরলোক যা করে মঙ্গলের জন্যেই করে।

—সে 'ভদ্দরলোক'! মানে?

—কর্তা! আমার আবার ও নামটা মুকে আসে না। আপনি নিজে বুজে নিন।

ম্যাজিকের ভূত

সুমথনাথ ঘোষ

এই নিয়ে দু'দিন হলো। জাদুসম্রাট পি. সি. সরকারের ম্যাজিক দেখবার টিকিট কাটতে গিয়ে ফিরে এলো বুবুন।

ওর দিদি সুচরিতা বলে, "আট সপ্তাহ চলছে এখনো এত ভিড়, বলিস কিরে।"

"হ্যাঁ, যত দিন যাচ্ছে তত যেন ভিড়ও বাড়ছে। ওঃ, কি লম্বা 'কিউ'। দেখলে, তার মাথা খারাপ হয়ে যাবে দিদি। শুনলুম রাত চারটে থেকে নাকি লোকে লাইন লাগায়।"

"কলকাতাটা এখন একটা আদিখ্যেতার রাজ্য হয়েছে।" বলতে বলতে ওদের মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, "স্কুল-কলেজে ছেলেমেয়ে ভর্তি থেকে শুরু করে খেলাধূলা, সিনেমা, থিয়েটার, রেলের টিকিট কাটা পর্যন্ত যেখানে যাও, সর্বত্র ওই ব্যাপার। অথচ লোকের মুখে শোনো, দেশে পয়সার অভাব—মানুষ খেতে পাচ্ছে না, পরতে পাচ্ছে না।"

মেজ মেয়ে সুমিতা বলে ওঠে, হবে না কেন মা? তোমাদেরই ঘরের একটা অর্ডিনারি ছেলে আজ দুনিয়ার চোখে ধাঁধা লাগিয়ে জাদুসম্রাট উপাধি আনলে। পৃথিবীর সব জাদুকরের মধ্যে সে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করলে কেমন করে, কে না তা চোখে দেখতে চায় মা।"

সুচরিতা বলে, "তাছাড়া লোকটা বিজ্ঞাপনও দিতে জানে। দেখছিস না, ক'দিন ধরে লিখছে, ডাক্তারকে দিয়ে হার্ট পরীক্ষা করিয়ে তবে টিকিট কিনবেন। ভূতের খেলা দেখাবার সময় রোজই নাকি একজন দু'জন করে অজ্ঞান হয়ে যায়।"

"ওসব গুলপট্টি! বিজ্ঞাপনের স্টাণ্ট! সবাই বোঝে।" সুমিতা বাঁকা মন্তব্য করে।

"কিন্তু বিলেত-আমেরিকাতেও এই ভূতের খেলা দেখানোর সময় কে কবে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, সেখানকার কাগজের রিপোর্টগুলো পর্যন্ত তুলে দিয়েছে!"

বুবুনের ছোট বোন পিকুন বলে, "দাদা আমি যাবে না, আমার টিকিট কেটো না। আমার ভয় করছে। আমি মার কাছে থাকবো বাড়িতে।"

ববি বলে, "ধ্যেৎ, ভয় কি! বেশ তো ভূতকে চোখে দেখতে পাবো। তুই বড় বোকা।"

পাঁচ বছরের ছেলে ববির ওই কথা শুনে সকলে একসঙ্গে যখন হেসে উঠলো, তখন সে খপ ক'রে তার প্যাণ্টের পকেট থেকে বন্দুকটা বার করে বললে, "আমি

এটা নিয়ে যাবো। গুলি করে মারবো সেই ভূতটাকে।" বলেই ফট্ করে ক্যাপটা ফাটালে।

অনেক কষ্টে পরের শনিবার টিকিট কেটে আনলে বুবুন। ওরা পাঁচ ভাই-বোন যখন সাজগোজ করে বাড়ি থেকে বেরুতে যাবে, ওর মা বললেন, "একটু দাঁড়াও।" তারপর তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গিয়ে ঠাকুরঘর থেকে মা কালীর সিঁদুর এনে, ছেলেমেয়ে সকলের কপালে ছোট্ট করে এক-একটা টিপ পরিয়ে দিলেন।

বুবুন হেসে ওঠে, "এসব তোমার কি কাণ্ড মা।"

মা বলেন, "হঠাৎ মনে পড়ে গেল আজ শনিবার, ভাদ্রমাসের অমাবস্যা। দু-দুটো আইবুড়ো মেয়েকে নিয়ে ভরসন্ধ্যাবেলা কি সব ভূত-প্রেতের খেলা দেখতে যাচ্ছিস—কিসে কি হয় বলা যায় না বাপু।"

বড় ও মেজ মেয়ে এবার হেসে গড়িয়ে পড়লো, "তোমার মাথাটা দেখছি খারাপ হয়ে গেছে মা। এ কি সত্যি? আমরা তো ম্যাজিক দেখতে যাচ্ছি।"

বুবুন হেসে বলে, "নাঃ, তোমাকে আর মানুষ করা গেল না, মা। তাহলে এই যে স্টেজের ওপর রোজ মানুষের জিভ কেটে দিচ্ছে, একটা মেয়েকে করাত দিয়ে দু'খানা করে কেটে ফেলছে জাদুসম্রাট—সব কি তুমি সত্যি মনে করো?"

"জানি না বাপু অতশত। আমি মুখ্যু মানুষ, তোদের মত এত লেখাপড়া তো শিখিনি।"

সেদিন খেলাগুলো সবই খুব জমেছিল। একটা ক'রে শেষ হয় আর দর্শকদের করতালি-ধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখর হয়ে ওঠে।

সুমিতা, সুচরিতা, পিকুন, ববি সবাই মুগ্ধ, বিস্মিত হতবাক্!

বুবুন চুপিচুপি জিজ্ঞেস করে দিদিদের, "কিরে, কেমন লাগছে?"

"এক্সসেলেণ্ট! টাকা সার্থক! এ যেন বিশ্বাস করা যায় না যে ভোজবাজি দেখছি।"

সবশেষে শুরু হবে ভূতের খেলা! তার আগে স্টেজের ওপর পর্দাটা বেশ কিছুক্ষণ পড়ে রইলো। দর্শকরা যখন সেই ভৌতিক দৃশ্য দেখার জন্যে কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারছিল না, ঠিক সেই বিশেষ মুহূর্তে দপ্ করে প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত আলো নিবে গেল। অন্ধকার ঘুট-ঘুট করতে লাগল চারিদিকে। সবাই নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে বসে আছে। কি দেখবে এখনি, কে জানে!

পিকুন দাদার হাতটা খপ্ করে চেপে ধরে বললে, "দাদা বড্ড ভয় করছে।"

ববি দাদার গায়ের সঙ্গে নিজেকে লেটপে দিয়ে ফিসফিস করে বলে, "আমার একটুও ভয় করছে না।"

তৎক্ষণাৎ শন্‌শন্ করে ঝড়ের শব্দের সঙ্গে হাঃ—হাঃ, হিঃ—হিঃ, হিঃ, খট্—

খটা—খট্... বিকট আওয়াজ শুরু হলো। কিম্ভূতকিমাকার সব প্রেতের মূর্তি সেই জমাট অন্ধকারে যেন কিলবিল করে উঠেছে। কোনটা স্কন্ধকাটা, কোনটা গন্নাখেঁদা, কোনটার মাথার খুলির ওপর ভাটার মত রক্তবর্ণ দুটো চোখ জ্বলছে, কোনটার মুখের সামনে ঝুলছে মূলোর মত কয়েকটা দাঁত। কতকগুলো শুধু কঙ্কাল, অদ্ভুত ভঙ্গিতে তারা নাচতে লাগল।

একটা—দুটো—পাঁচটা—দশটা—বিশটা নয় অগনিত। ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পিছনে, মাথার ওপরে, যেদিকে তাকাও শুধু সেই বীভৎস ভূত-প্রেতের ভয়াবহ সব মূর্তি।

হঠাৎ ধপ্ করে একটা আওয়াজ হলো। সঙ্গে সঙ্গে হেলপ্ হেলপ্, ডাক্তার ডাক্তার, বলে দু'তিনজন চেঁচিয়ে উঠলো।

অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। মনে হলো অনেকগুলো জুতোর শব্দ দরজার দিক থেকে ছুটে এসে যেন কাকে ধরাধরি করে চুপিসারে বাইরে নিয়ে গেল। আপপাশ থেকে ফিসফিস আওয়াজ শুধু কানে এলো, অজ্ঞান হয়ে গেছে একজন যুবক।

খেলা চলছে। দর্শকপূর্ণ সেই প্রেক্ষাগৃহে স্তব্ধ থেকে স্তব্ধতর হয়ে ওঠে। সবাই যেন ভয়ে আড়ষ্ট, জড়সড়। কারো মুখে কথা নেই।

এমন সময় দরজার দিক থেকে কয়েকটা ভারী বুটের আওয়াজ এসে স্টেজের সামনে থেমে গেল। এবং গম্ভীর কণ্ঠে একজন বলে উঠলো, "মিঃ সরকার, শিগগির বন্ধ করুন এই মারাত্মক খেলা। নইলে আপনাকে এখুনি অ্যারেস্ট করবো। লালবাজার থেকে আসছি।"

জাদুকর সরকারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—ওয়ান, টু, থ্রি।...

নিমেষে সব ভূত-প্রেতগুলো কোথায় মিলিয়ে গেল! দপ্ করে আলো জ্বলে উঠলো। দর্শকরা দেখলো সামনে একজন পুলিস ইন্সপেক্টার দাঁড়িয়ে আছেন, কয়েকজন পুলিস কন্সটেবল সঙ্গে নিয়ে।

দর্শকরা হৈ-চৈ করে উঠলো, "খেলা বন্ধ করতে দেবো না। আমরা পয়সা দিয়ে টিকিট কেটেছি!"

ইন্সপেক্টার সাহেব বললেন, "এইমাত্র যে যুবকটি খেলা দেখতে দেখতে অচৈতন্য হয়ে পড়েছেন, তাঁর অবস্থা সঙ্কটজনক। তাঁর জীবনের জন্যে জাদুকরকে দায়ী হতে হবে, তা কি আপনারা জানেন?"

এবার জাদুসম্রাট স্টেজের সামনে এগিয়ে এসে বললেন, "এ অভিযোগ সত্য নয়। কারণ পৃথিবীর বড় বড় শহরে আমি এই খেলা দেখিয়েছি, কিন্তু কোথাও এরকম ঘটনা ঘটেনি। এভাবে আরো অনেক দর্শক সংজ্ঞাহীন হয়েছেন বটে, কিন্তু একটু পরেই মুখে-চোখে জল দিয়ে বাতাস করতেই তাঁদের চৈতন্য ফিরে এসেছে। এটা আতঙ্কজড়িত সাময়িক দৌর্বল্য ছাড়া আর কিছু নয়। তবে যিনি এখনি অজ্ঞান

হয়ে পড়েছেন, তিনি যদি আগেই অন্য কোন সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন, তার জন্যে কি আমি দায়ী? তাই আমি অনুরোধ করছি, সেই রোগীকে সকলের সামনে নিয়ে আসা হোক এবং এখানে দর্শকদের মধ্যে যদি কোন ডাক্তার থাকেন তাহলে তাঁকে আমি সাদরে আহ্বান জানাচ্ছি, তিনি রোগীকে এসে পরীক্ষা করে দেখুন।"

"বেশ।" বলেই পুলিস ইন্সপেক্টার সাহেব বাইরে বেরিয়ে গেলেন এবং সেই রোগীকে ধরাধরি করে স্টেজের ওপর নিয়ে এলেন।

এবার হাতজোড় করে জাদুকর সরকার বললেন, "ডক্টরস্ ইফ এনি হিয়ার, ডু প্লিজ কাম!"

সঙ্গে সঙ্গে এখান-ওখান থেকে চার-পাঁচজন উঠে দাঁড়ালেন।

"ইয়েস্ ইয়েস্, ইউ অল্ কাম...প্লিজ!"

দু'জন ইংরাজ ডাক্তার, একজন পাঞ্জাবি, একজন চীনা ও একজন বাঙালি একসঙ্গে স্টেজে উঠে একে একে রোগীর নাড়ি পরীক্ষা করে সবাই একমত হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, রোগীর অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক। এখুনি একে হাসপাতালে ভর্তি করতে না পারলে হয়তো জীবন বিপন্ন হয়ে দাঁড়াবে।"

জাদুকর সরকার বললেন, "এখুনি হাসপাতালে আমি ফোন করে দিচ্ছি অ্যাম্বুলেন্স পাঠাবার জন্যে।"

ডাক্তাররা সবাই স্টেজ থেকে নেমে এলেন।

রোগী তখনো মূর্ছিতের মত পড়ে আছে। হঠাৎ একজন দাড়িওলা মুসলমান স্টেজের ওপর উঠে রোগীর মুখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললে, "কোন রোগ নয় হুজুর, ওনার ঘাড়ে ভূত চেপেছে। ওনার মুখের ভাব দেখে আমি বুঝতে পেরেছি।"

চারদিক থেকে একসঙ্গে রব উঠলো, "কে তুমি?"

"আমি একজন ভূতের ওঝা। আমার তিনপুরুষের এই কাম, এই ব্যবসা হুজুর। কালুখালির রহিম শেখের ব্যাটা ছোলেমালি আমি। গাভা, গৈলা, পটুয়াখালির ওদিকে সবাই আমায় একডাকে চেনে। আমি এসেছিলুম হুজুরের খেলা দেখতে। ভূত-প্রেত নিয়ে সারা দুনিয়া জয় করে এসেছেন শুনে একবার দেখতে এসেছি। আমি মুখ্যু মানুষ, আপনাদের মত লেখাপড়া শিখিনি, কিন্তু এটা জানি যে, ভূতে যাকে ধরে কোন ডাক্তার-বদ্যি বা কোন ওষুধ-ইঞ্জেকশন তার কিছু করতে পারবে না। আমি চল্লিশ বছর ধরে এই কাম করছি। ওস্তাদের দোয়ায় আর খোদার মর্জিতে আমার চিনতে কখনো ভুল হয় না।"

জাদুকরের মুখে-চোখে তখনো অবিশ্বাস। তিনি বলেন, "সারা পৃথিবীতে এই খেলা দেখিয়ে এলুম, কখনো তো এমনধারা হয়নি! সত্যি সত্যি ভূত তো কারুর ঘাড়ে চাপেনি!"

লোকটি বলে, "রহিম শেখের ব্যাটা ছোলেমালি কখনো ঝুট বলে না হুজুর। এক গ্লাস জল আনুন, আমি এখনি প্রমাণ দিচ্ছি।"

সঙ্গে সঙ্গে এক গ্লাস জল এনে তার হাতে দিতেই পকেট থেকে একখানা ভাঁজকরা সিল্কের রুমাল বার করে স্টেজের ওপর বিছিয়ে ওঝা নমাজ পড়ার ভঙ্গিতে বসে বিড়বিড় করে কতকগুলো কি মন্ত্র পড়ে, তারপর সেই জল নিয়ে রোগীর চারিপাশে তিনবার প্রদক্ষিণ করে যেমন গ্লাসের জল রোগীর মুখের ওপর ছিটিয়ে দিয়ে তিনবার ফুঃ—ফুঃ—ফুঃ বলেছে অমনি সেই অচৈতন্য যুবকটি গর্জে উঠলো, "কে তুই আমায় মারলি, তোর মুণ্ডু আমি চিবিয়ে খাবো!"

"আগে তো আমি তোর ঘাড় মটকাই, তারপর তুই যা পারিস করিস।" বলে ছোলেমালি আবার বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে সেই জলটা ওর গায়ে ছিটিয়ে দিলে। অমনি নাকিসুরে সে চেঁচিয়ে উঠলো, "আমার মারছিস?"

"আচ্ছা, আর মারবো না। তুই কে আগে বল্, কোথায় থাকিস, আর কেনই বা এত লোক থাকতে এর ঘাড়ে চাপলি! সব ঠিক ঠিক বল্, তাহলে কিছু করবো না। আর যদি মিথ্যে কথা বলিস, তাহলে সরষে-পোড়া হলুদ-পোড়া এবং শেষে লোহা-পোড়া মনে রাখিস! আমি এক—দুই—তিন যেই বলবো, অমনি তোকে বলতে হবে।"

এক...দুই...তিন...

নাকিসুরে অমনি সেই যুবকটি বলে উঠলো, "আমার নাম মলয় সরকার। আমি থাকি যাদুকরের লালরঙের নতুন কাঠের বাক্সে। আর যার ঘাড়ে চেপেছি, সে আমার পরম শত্রু। অনেকদিন পরে তাকে পেয়েছি, তাই তার ঘাড় না মটকে ছাড়বো না।" "এর নাম কি? ইনার সঙ্গে তোর কিসের শত্রুতা? বল শিগগির?"

"এর নাম শঙ্কর সেন। হুগলী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আমরা দু'জনে একসঙ্গে পড়তুম। ফাইনাল পরীক্ষায় আমার ফার্স্ট হবার কথা, কিন্তু ও বড়লোকের ছেলে বলে অনেক টাকা ঘুষ খাইয়ে ফার্স্ট হয়ে যায়। ফার্স্ট হলে কলেজের স্কলারশিপ নিয়ে বিলেত যেতুম, সেখান থেকে রিসার্চ করে এলে ওই কলেজেই সাড়ে আটশো টাকার মত মাইনের চাকরি হতো। কিন্তু ও আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে আমার জীবনটা ব্যর্থ করে দেয়। তাই আমি মনের দুঃখে হুগলির পুল থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করি। কেউ একথা জানে না। জোয়ারের জলে ভাসতে ভাসতে আমার দেহটা একটা জঙ্গলের মধ্যে আটকে যায়। সেখানে শিয়াল-কুকুরে যখন আমার পচা দেহটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল তখন এক চামার আমার দেহ থেকে মাংসগুলো ছাড়িয়ে ফেলে, আমার হাড়গুলো নিয়ে কলকাতার এক দোকানে বিক্রি করে দেয়। সেই দোকানদারের কাছ থেকে আমাকে কিনে নিয়ে এসে জাদুকর লাল কাঠের বাক্সয় আশ্রয় দেন। প্রতিদিন আমায় নিয়ে খেলা দেখিয়ে আবার সেইখানে ভরে রাখেন। এতদিন পরে আমার সেই চিরশত্রু শঙ্করকে পেয়েছি এখানে, আর

কি ছাড়ি! তাই ওর ঘাড়ে চেপেছি।"

বড় বড় ডাক্তাররা সব হতভম্ব হয়ে গেলেন। তাঁদের ডাক্তারি-শাস্ত্রকে ডুবিয়ে দিলে ওই একটা অশিক্ষিত গেঁয়ো ওঝা! তবু শেষ পর্যন্ত কি হয় দেখার জন্যে তাঁরা সবাই সাগ্রহে অপেক্ষা করেন।

দর্শকরা সব ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। তাহলে যতগুলো কঙ্কাল নিয়ে জাদুকর খেলা দেখালেন সবাইয়ের ভেতর সত্যিকারের ভূত আছে? চোখের সামনে এ দৃশ্য দেখার পর মিথ্যা বা বোগাস্ বলে তারা উড়িয়ে দেয় কি করে?

আর, জাদুকরের মনের অবস্থা না বলাই ভালো।

একটু পরে অ্যাম্বুলেন্স এসে গেলে, জাদুকর তাদের ফিরিয়ে দিলেন। শঙ্কর সেনের বাপ-মা সঙ্গে ছিলেন, তাঁরাও কোন আপত্তি করলেন না। তবে জাদুকর সরকারের কানে কানে তাঁরা বললেন, "আমার ছেলে বিলাত ফেরৎ ইঞ্জিনিয়ার, কলেজের স্কলারশিপ নিয়ে বিলেত গিয়েছিল তাও সত্যি, কিন্তু ওই যে ঘুষ দিয়ে ফার্স্ট হয়েছিল বলছে, ওটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এতগুলো লোকের সামনে এইভাবে আমার ছেলের নামে অপবাদ দেওয়ার জন্যে আমি ওর নামে মানহানির মামলা আনবো।"

সকলেই হো-হো করে হেসে উঠলো।

"কার নামে মানহানির মামলা করবেন?" জাদুকর সরকার মিষ্টি হেসে প্রশ্ন করলেন শঙ্কর সেনের বাবাকে।

তিনি ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন। রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বলে উঠলেন, "তাই বলে সকলের সামনে এই মিথ্যাকে মেনে নিতে বলেন!"

একজন বৃদ্ধ লোক দশ টাকার সিট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে এর প্রতিবাদ করলেন। বললেন, "মলয় সরকারের 'স্পিরিট' যা বলেছে, তা বর্ণে বর্ণে সত্যি। কারণ, আমার চেয়ে এ খবর বেশি কেউ জানে না। আমি ওই কলেজে তখন কেরানীর চাকরি করতুম। শঙ্কর সেনের নম্বর আমিই কেটে বাড়িয়ে দিই। আজ আট বছর হলো আমি রিটায়ার করেছি।"

দর্শকরা কেবল নয়, স্বয়ং জাদুসম্রাট পর্যন্ত হতবাক! একটা নাটক যেন তাঁর চোখের সামনে অভিনীত হচ্ছে!

লজ্জায় অধোবদন হয়ে শঙ্কর সেনের বাবা দাঁড়িয়ে রইলেন।

ছোলেমালি তখন গলায় জোর দিয়ে বলে, "আজ্ঞে আমি তো আগেই বলেছিলুম ওনাকে ভূতে ধরেছে। তার প্রমাণ তো দেখলেন!"

শঙ্কর সেনের মা এবার হাতজোড় করে বললেন, "আপনি আমার ছেলের ঘাড় থেকে ওই অপদেবতাকে নামিয়ে দিন দয়া করে—আপনাকে আমি প্রচুর বকশিস দেবো।"

"দিচ্ছি মা, আপনি ব্যস্ত হবেন না। যখন এতটা আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পেরেছেন, শেষটুকু করবো বইকি। দেখুন না এবার মোক্ষম মারণাস্ত্র ছাড়ছি।"

বলেই চোখ বুজে বিড়বিড় করে কতকগুলো কি মন্ত্র পাঠ করে, পকেট থেকে দেশলাই বার করে, জাদুকরের খেলার প্রোগ্রামটাতে আগুন লাগিয়ে শঙ্কর সেনের মুখের কাছে যেই নিয়ে গেল অমনি সে হাঁউমাঁউ করে লাফিয়ে উঠলো, "ওঁরে মেঁরে ফেঁললে রেঁ..."

"বল্ এখনি ওকে ছেড়ে চলে যাবি?"

"হ্যাঁ যাবো।"

"ঠিক বলছিস?"

"হ্যাঁ ঠিক বলছি।"

"আচ্ছা তাহলে ওই যে সামনে 'ওয়াটার অব ইণ্ডিয়া"-র বড় কলসিটা জলে ভর্তি রয়েছে, ওটাকে শুধু দাঁতে করে ধরে নিয়ে চলে যাব, তবেই বুঝবো আমরা যে, তুই ওকে ছেড়ে দিয়েছিস।"

সঙ্গে সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে এসে শঙ্কর সেন সেই কলসীটা দাঁতে কামড়ে ধরে ছুটে স্টেজের ভেতরে চলে গেল। সকলে তার পিছনে পিছনে গিয়ে দেখলে শঙ্কর সেনের দেহটা মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে সেই লাল কাঠের বাক্সের কাছে।

মুখে জলের ঝাপটা মেরে পাখার বাতাস দিতে দিতেই তার জ্ঞান ফিরে এলো। চোখ চেয়ে তার চারিপাশে এত লোক দেখে উঠে দাঁড়িয়ে লজ্জিত কণ্ঠে সে তখন প্রশ্ন করলে, 'আমি এখানে কেন মা?"

ওর বাবা বললেন, "তোর শরীরটা খারাপ হয়েছিল বলে জাদুসম্রাট তোকে ভেতরে এনে বিশ্রাম করতে দিয়েছিলেন।"

বাবা-মার সঙ্গে শঙ্কর সেন স্টেজ থেকে দর্শকদের সামনে নেমে গেল। ভেলভেটের পর্দাটা স্টেজের ওপর ধীরে ধীরে যেই নেমে এলো, করতালি-ধ্বনিতে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ বারংবার মুখরিত হয়ে উঠলো।

'জনগণমন' সঙ্গীত থামলে সকলে হুড়মুড় করে দরজা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। বাসের জন্য অপেক্ষা করছিল বুবুনরা। একটা বাস চলে গেল। এত ভিড় যে ওরা উঠতে পারলে না। পিকুন বললে, "দাদা ভূত কে, যে লোকটা ওর বাবা-মা'র সঙ্গে স্টেজ থেকে নেমে গেল?"

ববি বলে উঠলো, 'ধ্যেৎ বোকা, ভূত তো কখন তার বাড়ি চলে গেছে, না দাদা?"

বুবুন কি জবাব দেবে ভাবছিল। এমন সময় ওর রাঙাদি বললে, "লোকটা ম্যাজিকের সঙ্গে ড্রামা মিশিয়েছে চমৎকার। একেবারে সত্যি বলে ভুল হয়, না দিদি?"

সুচরিতা অন্য কথা বুঝি চিন্তা করছিল। বললে, "ঠিক বলেছিস। ম্যাজিককে যে এইভাবে দিব্যি বাস্তবের রূপ দেওয়া যায়, তা চোখে না দেখলে কল্পনা করা কঠিন। জাদুসম্রাট উপাধি কি আর এমনি দিয়েছে লোকে!"

সামনে একটা 'ডবল ডেকার' আসতে ওরা হুড়মুড় করে উঠে পড়লো।

টেলিফোন

সত্যজিৎ রায়

ক্রিং—ক্রিং...ক্রিং—ক্রিং...ক্রিং—ক্রিং...

বীরেশবাবু বিরক্ত হয়ে খাটের পাশের টেবিলের উপর রাখা টেলিফোনটার দিকে দেখলেন। টেলিফোনের পাশেই ঘড়ি, তাতে বারোটা বাজে। রাত বারোটা। বীরেশবাবু সবে হাতের বইটা বন্ধ করে ঘরের বাতিটা নেবাতে যাচ্ছিলেন। এদিকে টেলিফোনটা বেজেই চলেছে। বীরেশবাবু রিসিভারটা তুলে নিলেন।

'হ্যালো—'

'ফোর সিক্স ফাইভ ওয়ান সেভেন সিক্স?'

'ইয়েস—'

'বীরেশবাবু আছেন? বীরেশচন্দ্র নিয়োগী?'

'কথা বলছি।'

'ও। নমস্কার।'

'নমস্কার।'

'এত রাত্রে ফোন করছি বলে কিছু মনে করবেন না।'

'ঠিক আছে। কী ব্যাপার?'

'আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল।'

'আপনি কে বলছেন জানতে পারি কি?'

'আমার নাম গণপতি সোম।'

বীরেশবাবুর বিরক্তিটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। বললেন, 'কিন্তু এখন তো কথা বলার সময় হবে না। আমি শুতে যাচ্ছিলাম। আর, তাছাড়া আপনাকে তো চিনিও না।'

'আমি কিন্তু আপনাকে চিনি। আপনার পেশা ডাক্তারি। তিন মাস হল এই বাড়িতে এসেছেন। আগের বাড়িতে আগুন লেগে প্রচুর ক্ষতি হয়। তাই আপনাকে এখানে উঠে আসতে হয়। আপনার স্ত্রী গত হয়েছেন আজ এগার বছর হল। আপনার বয়স পঞ্চান্ন। আপনার একটি ছেলে আছে—ইঞ্জিনীয়ার—সে ভূপালে থাকে। কেমন, ঠিক বলিনি?'

বীরেশবাবু যারপরনাই বিস্মিত হলেন। বললেন, 'আপনি এত কথা জানলেন কি করে?'

'ধরে নিন এটা আমার একটা বিশেষ ক্ষমতা। এখন বলুন আপনি আমার

কথাগুলো শুনতে চান কিনা।'

'বেশি সময় লাগবে না তো?'

'না। অবিশ্যি কথার পর যদি কথোপকথন চলে তাহলে কিছুটা সময় লাগতে পারে।'

ঠিক আছে। বলুন।

আজ থেকে সাত বছর আগের কথা বলছি। আমার পেশা ছিল ওকালতি। আপনি সেই সময় মুক্তরামবাবু স্ট্রিটে থাকতেন, তাই নয় কি?

ঠিকই বলেছেন।

আপনার ছেলের নাম অরূপ।

হ্যাঁ।

সে তখন সিটি কলেজে পড়ত।

হ্যাঁ।

এটাও আপনি জানেন কিনা দেখুন—আপনার ছেলের একটি বন্ধু ছিল, নাম শ্রীপতি।

তা হতে পারে। ছেলের বন্ধুদের খবর আমি সব সময় রাখতাম না। এই শ্রীপতি আমার মেজো ছেলে। খুব ভালো ছেলে ছিল—যেমন পড়াশুনায়, তেমনি স্বভাব-চরিত্রে। তার বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ছিল আপনার ছেলে অরূপ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার ছেলে কুসঙ্গে পড়ে। তার ফলে ক্রমে তার মধ্যে অনেক বদ অভ্যাস দেখা দেয়। অরূপ অনেক চেষ্টা করেছিল তাকে বুঝিয়ে বলে এই কুসঙ্গ ত্যাগ করাবে, কিন্তু তাতে সে সফল হয়নি। অথচ শ্রীপতির উপর থেকে অরূপের টান যায়নি। অরূপ বদ্ধপরিকর ছিল যে শ্রীপতিকে আবার সৎপথে ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু তার চেষ্টা বৃথা হয়। এসব কি আপনার জানা?

অরূপের এই বন্ধুকে আমি দেখেছি, কিন্তু সে যে কুসঙ্গে পড়েছিল সেটা জানতাম না।

এবার একটা দুর্ঘটনার কথা বলি। আমার ছেলেকে জুয়ার নেশায় ধরে। সে রেসের মাঠে যেতে শুরু করে। তার ফলে তার অনেক হার হয়, এবং বিস্তর দেনা হয়ে যায়। তখন সে অরূপের কাছে হাত পাতে। বলে তাকে উদ্ধার না করলে আত্মহত্যা ছাড়া তার আর গতি নেই। অরূপ তাকে সাহায্য করে কীভাবে সেটা আপনি জানেন কি?

এখন বুঝতে পারছি।

কী বুঝছেন?

আমার বাড়িতে সিন্দুকে একটা অতি মূল্যবান জিনিস ছিল। এটা আমার ঠাকুর্দার সম্পত্তি। একটা হীরের আংটি।

হ্যাঁ। আপনার ঠাকুরদাদা ছিলেন চণ্ডীপুর স্টেটের রাজার গৃহচিকিৎসক।

রাজাকে একবার দূরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন বলে রাজা খুশি হয়ে তাঁকে এই আংটিটা দেন। ঠিক বলিনি?

'ঠিক।'

'এই আংটিটি সিন্দুক থেকে বার করে আপনার ছেলে আমার ছেলেকে দিয়ে দেয়।'

'আশ্চর্য ব্যাপার! আমরা এই আংটি অন্তর্ধান রহস্যের কোনো কিনারা করতে পারিনি। পুলিসও পারেনি।'

'পারবে কি করে? আপনার ছেলে এত ভালো, তাকে আপনারা সন্দেহ করবেন কি করে?'

'তা তো বটেই।'

'সেই আংটি কিন্তু আমার ছেলের কাছেই থেকে যায়। আংটিটা তার এত ভালো লাগে যে সেটা হাতছাড়া করতে চায় না। শেষটায় আমি ছেলের অবস্থা জানতে পেরে মহাজনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তার দেনা শোধের ব্যবস্থা করি।'

'সেই আংটি কি এখনো আপনার ছেলের কাছেই আছে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু সেটা সে আপনাকে ফেরত দিতে চায়। তার আংটির সখ মিটে গেছে। আংটি ফেরত দিয়ে সে কলঙ্কের হাত থেকে রেহাই পেতে চায়। তাছাড়া আপনার ছেলের মনেও একটা গ্লানি রয়েছে, সেটাও দূর করা দরকার।'

'আপনার ছেলে কি আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়?'

'হ্যাঁ—এবং এখনই। সে রওনা হয়ে গেছে। এতক্ষণে সে প্রায় আপনার বাড়ি পৌঁছে গেছে।'

'তার নাম যেন কী বললেন?'

'শ্রীপতি।'

'আর আপনার নাম গণপতি?'

'হ্যাঁ।'

'আপনাদের নাম কি সম্প্রতি খবরের কাগজে বেরিয়েছে?'

'তা বেরিয়েছে।'

'দাঁড়ান, মনে করতে দিন।'

'করুন। সময় নিন।'

বীরেশবাবুর একটু ভাবতেই মনে পড়ল। বললেন, 'মনে পড়ছে। কালকের কাগজেই বেরিয়েছে আপনাদের নাম। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে একটা গাড়ি আর লরিতে সংঘর্ষের ফলে গাড়ির তিনজন যাত্রী তৎক্ষণাৎ মারা যান। তার মধ্যে একজন গাড়ির চালক, আর দু'জন বাপ ও ছেলে—নাম গণপতি সোম আর শ্রীপতি সোম।'

'আপনি ঠিকই বলছেন। আমিই সেই গণপতি সোম।'

'আ-আপনি...তার মানে...'

'তার মানে আপনি যা ভাবছেন তাই।'

'কিন্তু এ যে অসম্ভব!'

'কেন অসম্ভব হবে? দেখুন তো আপনি কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছেন কিনা।'

'হ্যাঁ পাচ্ছি।'

'কী শব্দ?'

'কে যেন আমার নীচের দরজায় টোকা মারছে।'

নিস্তব্ধ রাত্রে বীরেশবাবু স্পষ্ট শুনতে পেলেন সে শব্দ—টক্-টক্...টক্-টক্... টক্-টক্-টক্...। তারপর টেলিফোনে শুনলেন—

'দরজাটা খুলে দিন। আমার ছেলে অপেক্ষা করছে।'

'না না—আমি দরজা খুলব না।'

বীরেশবাবু বুঝলেন তাঁর গলা শুকিয়ে আসছে। তাঁর ডান হাতে রিসিভারটা কাঁপছে। আবার টেলিফোনে কথা—

'দরজা না খুললেও সে ঢুকতে পারবে। সে ক্ষমতা তার আছে। এবার শুনুন তো কোন আওয়াজ পাচ্ছেন কিনা।'

'সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে পায়ের শব্দ।'

'আপনি কোনো চিন্তা করবেন না বীরেশবাবু। সে আপনাকে বিরক্ত করবে না। শুধু আপনার পাশের ঘরে গিয়ে টেবিলের উপর রেখে আসবে আংটিটা।' চরম আতঙ্কে বীরেশবাবু বললেন, 'না-না—আপনি আপনার ছেলেকে ডেকে নিন, ডেকে নিন!'

'তার তো উপায় নেই বীরেশবাবু। সে আপনার দোতলায় পৌঁছে গেছে।' বীরেশবাবু স্পষ্ট শুনলেন পাশের ঘরে পায়ের শব্দ। শব্দটা এক মুহূর্তের জন্য থামল, তারপর আবার শোনা গেল। এবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়ার শব্দ। টেলিফোনে কথা এল—

'এবার আপনি নিশ্চিন্ত। আপনি টেলিফোন রেখে পাশের ঘরে গিয়ে দেখুন। আমি আসি। আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভালো লাগল। গুড নাইট।' বীরেশবাবু রিসিভারটা রেখে দিলেন। তাঁর কপাল এই পৌষ মাসেও ঘর্মাক্ত। কিছুক্ষণ বিছানায় চুপ করে বসে থেকে তিনি উঠলেন। অতি সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে পাশের ঘরের ভেজানো দরজাটা খুলে ঘরে ঢুকে বাতিটা জ্বালালেন। হ্যাঁ, সত্যিই পড়ে আছে টেবিলের উপর। এই অল্প আলোতেও ঝলমল করছে তার দ্যুতি—সাত বছর পরে ফিরে পাওয়া তাঁর ঠাকুরদাদার হীরের আংটি।

সত্যি ভূতের গল্প

বিমল কর

সারদাচরণ বকসির নাম তোমরা নিশ্চয় শোনোনি। আমরা ছেলেবেলায় শুনেছিলাম। তখন সারদাচরণকে বলা হত গোয়েন্দা সারদা। উনি লহরী সিরিজের ছ' আনা দামের বইগুলোতে হামেশাই দেখা দিতেন। 'মারাকানার গুপ্তধন', 'তিন প্রহরে ঘণ্টা বাজে', 'পরশুরামের পিস্তল'—এ সব ছিল তাঁর বিখ্যাত বই। তবে সারদাচরণের আসল খ্যাতি ছিল ভূতের গল্প লেখায়। প্রায় প্রত্যেকটি কাগজেই তাঁর ভূতের গল্প বেরুত। দারুণ গল্প। অমন গল্প কেউ আর লিখতে পারত না। এক-একটা গল্প পড়ার পর দিন-দুই গা ছমছম করত।

সারদাচরণ যে কবে লেখাটেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন তা জানতাম না। আর মানুষের ছেলেবেলা তো বরাবর থাকে না, আমরাও বড়সড় হয়ে চাকরি-বাকরি করতে লাগলাম।

ঘটনাচক্রে সারদাচরণের সঙ্গে আমার আলাপ হল সেদিন। ঝাড়গ্রামে গিয়েছিলাম একটা কাজে। সারদাচরণের বাড়ির এক পাশেই আমায় থাকতে হয়েছিল। সেই সূত্রেই আলাপ, তারপর কথায়-কথায় ধরা পড়ে গেলেন এই সারদাচরণই সেই গোয়েন্দা সারদাচরণ। বৃদ্ধ মানুষটি এত চমৎকার, আর গল্প-গুজবে এমন পাকা যে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে গল্প হচ্ছিল। কার্তিক মাসের ঠাণ্ডা পড়েছে সামান্য। সন্ধে হয়ে গিয়েছিল।

কথায়-কথায় আমি বললাম, 'আপনি ভূতের গল্প লেখা কবে ছাড়লেন?'

'অনেককাল আগে।'

'ছাড়লেন কেন? দারুণ লাগত আপনার ভূতের গল্প। দু'-একটার কথা এখনও মনে আছে।'

সারদাচরণ হাসলেন। বললেন, 'কেন ছাড়লাম জানো? একবার এক অদ্ভুত কাণ্ড হল। সেই থেকে ছেড়ে দিলাম।'

কী কাণ্ড?

শুনতে চাও?

বাঃ শুনব না কেন? আপনি বললেই শুনব।

সারদাচরণ একটু চুপ করে রইলেন। তারপর শুরু হল তাঁর গল্প—

সেটা নাইনটিন ফরটি-টুয়ের গোড়া হবে। তখন সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পিক

পিরিয়ড। কলকাতা থেকে লোকজন সব পালিয়ে গিয়েছে বোমার ভয়ে। খাঁ-খাঁ করছে শহর। ব্ল্যাক-আউটের চোটে কলকাতা সন্ধে হতে না হতেই অন্ধকার। ঠুঙি-পরানো গ্যাসের আলো জ্বলে রাস্তায়—তাও সিকি মাইল অন্তর। আমি কিন্তু কলকাতা ছেড়ে পালাইনি। কেমন করে পালাব বলো? পেট চালাতে হবে তো! পল হ্যামলিন কোম্পানিতে চাকরি করি, তারা খুব কড়া ধাতের। থাকতাম শীলবাবুর হোটেলে। মির্জাপুর স্ট্রিটে। চাকরি করি, লহরীর ছ' আনা সিরিজের বই লিখি, আর বাচ্চাদের কাগজের গল্প। ভূতের গল্পই বেশি। বড়দের কাগজেও লিখেছি দু-চারটে।

একদিন হোটেল থেকে বেরিয়ে খানিকটা পায়চারি করে কলেজ স্কোয়ারে গিয়ে বসলাম। একটু-একটু চাঁদের আলো, শীত পালাই-পালাই করছে, বেশ লাগছিল। আমার বরাবরই চুরুট খাবার অভ্যেস। নতুন একটা চুরুট ধরিয়েছি এমন সময় কে যেন এসে পাশে বসল।

কলকাতায় তখন সন্ধের পর লোকজন বড় একটা বেরুত না। কোথায় বা যাবে অন্ধকারে। পাড়ার মধ্যেই সিনেমা-থিয়েটার যেত, বা বন্ধু-বান্ধবের কাছে। কলেজ স্কোয়ার একেবারেই ফাঁকা। দু-চারজন, আমারই মতন আছে হয়তো, চোখে পড়ে না।

পাশে এসে যে লোকটি বসল তাকে আমি নজর করলাম। লিকলিক করছে রোগা, গায়ের রঙ কালোই মনে হল। লম্বা ধরনের একটা জামা পরেছে। সেটা কোট না আলখাল্লা বুঝতে পারছিলাম না।

একটু আলাপ জমাবার চেষ্টা করলাম। লোকটা জবাবই দেয় না কথার, শুধু হ্যাঁ আর না। মনে হল লোকটা ভীষণ বিরক্ত হয়ে রয়েছে।

আমারও কেমন জেদ ধরে গেল। লোকটাকে কথা না বলিয়ে ছাড়ব না। তাকে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগলাম, আজে-বাজে যা মুখে এল, লোকটারও সেই একই রকম জবাব, হ্যাঁ আর না।

আমি যখন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিচ্ছি তখন লোকটা আমায় চমকে দিয়ে একটা কথা বলল। কী বলল, জানেন?

বলল, আমাকে সে জানে। আমার নাম সারদাচরণ বক্সি। আমি শীলবাবুর হোটেলে থাকি।

শুনে আমি অবাক। লোকটা কি গোয়েন্দা নাকি?

তারপরই লোকটা বলল, আপনি মশাই যা জানেন না তা লেখেন কেন? ফাজলামি পেয়েছেন?

আমি একেবারে বেইজ্জত। বলে কী লোকটা। চটেমটে বললুম, 'আমি কী লিখি বলুন তো?'

'যত্ত ছাই-পাঁশ।'

শুনলে কথা! রাগে গা জ্বলে উঠল। মনে হল, এক চড়ে লোকটার বদন বিগড়ে

দিই। একেবারে অসভ্য। কোনরকমে রাগ চেপে বললাম, 'মশাইয়ের কি ছাই তোলার অভ্যেস আছে?'

'আমার কী আছে আপনার জেনে দরকার নেই। ...বেশ তো করে খাচ্ছিলেন তিন রাতে তিন খুন, মৃত্যুফাঁদ লিখে—গল্পের গরু তরতর করে গাছে উঠছিল; তা মরতে আমাদের দিকে হাত বাড়ালেন কেন?'

রাগে পিত্তি জ্বলছিল। আমার আবার বদ-অভ্যেস ছিল। রাগের মাথায় তিন পয়েন্ট পাঁচ পয়েন্টও চালিয়ে দিতাম—মানে ঘুসি। কিন্তু রাগ হলেও লোকটার কথাবার্তা শুনে একটু ঘাবড়েও যাচ্ছিলাম। বললাম, 'আপনাদের দিকে হাত বাড়ালাম মানে?'

'একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা সাজছেন যে! বলি এই সেদিন রঙবাহার কাগজে কী লিখেছেন ওটা? ভূত বলে তার জাত নেই—যা খুশি করলেই হল? কোথায় আপনি দেখেছেন ভূতে রিক্‌শা টানছে? ছিঃ ছিঃ, বলিহারি আপনার আক্কেল মশাই, রাত একটায়—অমন শীতের দিনে আপনি ভূতকে দিয়ে নিমতলা স্ট্রিট থেকে বেলগেছে পর্যন্ত রিকশা টানালেন! আপনি নিজে পারবেন টানতে? দেড় দু-মাইল রাস্তা...ছিঃ ছিঃ ছিঃ...।'

আমি একেবারে থ' হয়ে গেলাম লোকটার কথা শুনে। কথাটা তো মিথ্যে বলেনি। একেবারে হালে রঙবাহার পত্রিকায় আমার একটা ভূতের গল্প বেরিয়েছে? তাতে বাস্তবিক এক ভূতুড়ে রিকশা আর রিকশাঅলার কথা রয়েছে।

রাগ একটু কমল। বললাম, 'কেন, ভূতে রিকশা টানতে পারে না?'

'না। কভি নেই...আপনি মশাই বড় বেএক্কেলে। নিজে ফুসফুস করে চুরুট ফুঁকছেন—কই আমাকে তো ভদ্রতা করে একটা দিচ্ছেন না? একটা চুরুট ছাড়ুন।

এবার আমার হাসি পেল। আচ্ছা মজার লোক তো!

একটা চুরুট তাকে দিলাম। দেশলাইও।

লোকটা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চুরুটটা ধরিয়ে নিল।

আমি বললাম, 'আপনি আমার গল্প-টল্প পড়েন?'

'বাধ্য হয়ে।'

'কেন, বাধ্য হয়ে কেন?'

'ওটা আমার চাকরি।'

'আপনি কি রঙবাহার কাগজে কাজ করেন? রণদাবাবুর....'

'না না, রণদার-টনদার কিছু নয়। ওই রণদাবাবুকেও একদিন শিক্ষা দিতে হবে। বাপের পয়সায় কাগজ করে গাধাটা সম্পাদক হয়েছে। ওর বাবা গঙ্গাবাবু প্রায়ই দুঃখ করে বলেন, ছেলেটার কপালে অশেষ দুর্গতি লেখা আছে।'

বলে কী লোকটা? রণদাবাবুর বাবা মারা গিয়েছেন বছর কয়েক, তাঁর সঙ্গে এই লোকটার দেখা হবার কথা নয়। ডাহা মিথ্যে বলছে। বললাম, 'রণদাবাবুর বাবা তো

স্বর্গে।'

'আমি কি মর্ত্যে থাকার কথা বলছি! মায়ের কাছে মামারবাড়ির গল্প!'

লোকটার কথাবার্তা থেকে মনে হচ্ছিল, ও যেন আমাকে ধমকাবার জন্যেই এসেছে। বলতে যাচ্ছিলাম, রণদাবাবুর বাবার সঙ্গে আপনার কি কোন টেলিফোন কানেকশান আছে? —আমাকে কথা বলতে না দিয়ে লোকটা বলল, 'ক'দিন আগে বেণুবীণা কাগজে আপনি কী অখাদ্য লেখাই লিখেছেন। ছ্যা ছ্যা। রেল স্টেশনের ওয়েটিংরুমে ভূত ঢুকিয়েছেন। তাও আবার গোসলখানায়। কেন মশাই, ভূত কি রেলের জমাদার না ঝাড়ুদার? আপনার মতো নিরেটে মাথা আর দেখিনি।'

আমি হাঁ করে লোকটাকে দেখতে লাগলাম। অন্ধকারে যেটুকু ঝাপসা জ্যোৎস্না ফুটেছে তাতে তাকে অস্পষ্টই দেখাচ্ছিল। লোকটা দেখি টপাটপ গল্প বলে দিচ্ছে। হঠাৎ আমার মনে হল, রঙবাহার আর বেণুবীণা—কাগজ দুটো আলাদা হলেও ছাপা হয় একই প্রেসে। লোকটা নিশ্চয় ছাপাখানার লোক। ছাপাখানায় কাজ করে।

'আপনি কি প্রেসে কাজ করেন? কম্পোজিটার?' আমি বললাম।

'কম্পোজিটার—! কেন?'

'না, বলছিলাম—মানে ছাপাখানার কম্পোজিটার হলে তাকে সবই পড়তে হয়। আপনি পটাপট এত গল্পের কথা বলে যাচ্ছেন—।'

'চ্যাঙড়ামি করছেন!' লোকটা খেঁকিয়ে উঠল। 'কম্পোজিটার! আপনার সব ক'টা ভূতের গল্পের ভূতদের কথা আমি বলে দিতে পারি। বলব?' বলে লোকটা চুরুটে গোটা-পাঁচেক টান মারল। কাসল খকখক করে। তারপর বলল, 'আপনার একটা ভূত ট্রাফিক পুলিসের কাজ করেছে লোয়ার সার্কুলার রোডে, তার জন্য দুটো বাস মুখোমুখি ধাক্কা লাগিয়েছে। এ-রকম হয় না। ভূতরা মানুষের মতন অত বাজে ট্রাফিক পুলিস হয় না। আপনি আর-একটা যা কাণ্ড করেছেন, লাশকাটা ঘরে একটা ভূতকে দিয়ে অনবরত হা-হা-হি-হি করে হাসিয়েছেন, ভূতরা আপনাদের মতন হ্যা-হ্যা করে হাসে না, তারা দাঁত বার করে হাসতে শেখেনি। লাশকাটা ঘর দেখেছেন কখনো জন্মে? তার গন্ধ শুঁকেছেন! গল্পটা পড়ে আপনাকেই কাটতে ইচ্ছে করছিল। আপনি অদ্ভুত লোক মশাই, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোর মতন—যত রাজ্যের বাজে নোংরা কুচ্ছিত কাজ ভূতদের দিয়ে করিয়েছেন। যেন মানুষরা কত ভাল, তারা সব ভাল ভাল কাজ করে। বোলপুরের সেই গল্পটায় একটা বুড়ো ভূতকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে আপনি তেলেভাজা খাইয়েছেন, আর নিজেরা খেয়েছেন ওমলেট। তার রেজাল্ট কেমন হয়েছিল মনে আছে তো? কলেরা হতে হতে বেঁচে গিয়েছেন! ...আপনি খুবই বাজে লোক। ভূতকে দিয়ে সংস্কৃত বলিয়েছেন। পৃথিবীতে কোন ভূতই দু-তিনটে ভাষা বলতে পারে না। সংস্কৃত পারে না, পুস্তু পারে না, জার্মান পারে না। কেন পারে না জানেন না, আপনাকে জ্ঞান

দেওয়া বৃথা। আপনি গবেট টাইপের, যাক্‌গে, দুটো কথা বলতে এসেছি, বলে চলে যাই। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

আমি চুপ। মুখে কথা আসছিল না।

লোকটা বলল, 'শুনুন। যা বলছি তার অন্যথা করবেন না। খুন, পিস্তল, গুমখুন —এসব নিয়ে যত খুশি লিখুন, কেউ কিছু বলতে আসছে না। কিন্তু ভূত নিয়ে নয়। আপনারা বাঙালি লেখকরা ভূত নিয়ে ভেলকির গল্প ফাঁদছেন, না-হয় হাসি-মসকরা করছেন। সাহেবরা এমন নোংরা কাজ করে না। তাদের ভূতরা ভদ্রলোক। দু' চারটে হাইক্লাসের ভূতের গল্প মেরে লিখলেও তো পারেন। যত্ত সব! আচ্ছা চলি, অনেক দূর যেতে হবে। তবে যা বললাম মনে রাখবেন। আর ভূতের গপ্প লিখবেন না। লিখলে এমন শিক্ষা পাবেন যে নবাবের মতন পার্কে বসে বসে চুরুট ফুঁকতে হবে না।'

লোকটা উঠে দাঁড়াল।

তাড়াতাড়ি বললাম, 'আপনার পরিচয় স্যার?'

'পরিচয়! আমার পরিচয়, আমি ভূতদের রিপ্রেজেনটেটিভ। দূত বলতে পারেন। ওখানকার সেন্সার অফিসের একজন জুনিয়র অফিসার। সদ্য গিয়েছি। আরে মশাই গত বছর মিলিটারিতে চাকরি পেয়েছিলাম। ফোর্ট উইলিয়ামে আমার পোস্টিং ছিল। মিলিটারি সেন্সার অফিসে। এক হুদো আর্মি অফিসার আমায় তার ট্রাকে চাপা দিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চত্ব। সাইডে যেতেই ওরা আমাকে ওদের সেন্সার অফিসে কাজে বসিয়ে দিল। যাক্‌গে, চলি। আপনি ভূতদের মান-সম্মান ইজ্জত তো নষ্ট করেছেনই, তার ওপর বাচ্চা-কাচ্চারাও যে ভূতকে শ্রদ্ধার চোখে দেখবে—তারও বারোটা বাজিয়েছেন। আমায় বলা হয়েছিল—আপনাকে ওয়ার্নিং দিয়ে দিতে। সাবধান করে দিলাম আপনাকে। আচ্ছা চলি!'

লোকটা চলে গেল।

আমি হাঁ করে বসে থাকলাম।

সারদাচরণ তাঁর গল্প শেষ করলেন।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'লোকটা কে?'

'জানি না বাপু! তবে ভূতের গপ্প আর লিখিনি।'

'ভয়ে?'

'না না, ভয়ে নয়। মনে হল, আমি ভূতের গপ্প লিখলে লোকটার অন্ন মারা যাবে।' সারদাচরণ হেসে উঠলেন।

সঙ্গী

আলোক সরকার

অরিন্দম বলল, 'চলো একটু চা-খানায় বসা যাক।'

অরিন্দমের সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা। বলতে গেলে ইস্কুল ছাড়ার পর আর ওর সঙ্গে দেখাই হয়নি। কখনো দেখা হয়েছে ট্রামে-বাসে, রাস্তার মোড়ে, দু-এক মিনিট কথাবার্তা, কেমন আছ, ভাল আছি ইত্যাদির পর দু'জনে দু'দিকে চলে গিয়েছি। অথচ ইস্কুলে অরিন্দম ছিল আমার সব চাইতে কাছের বন্ধু। ছুটির দিনেও ওর সঙ্গে একবার দেখা না হলে মন খারাপ হয়ে যেত। ইস্কুল ছাড়ার পর সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেল।

হাতে সময় ছিল। আর তাছাড়া এই দশ মিনিট একসঙ্গে হাঁটার ফাঁকেই অরিন্দম জানিয়ে দিয়েছিল ও নাকি আজকাল হাতের রেখা দেখে মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সব কিছুই নিখুঁতভাবে বলে দিতে পারে। এই সেদিন এক ভদ্রলোকের হাত দেখে বলল, তিনি যেন জলের থেকে একটু দূরে-দূরে থাকেন, সামনের সাত দিন তাঁর একটা মস্ত জল-ফাঁড়া আছে। ভদ্রলোক জানালেন, তাঁকে নৌকো করে যাওয়া-আসা করতে হয় না, আর কলকাতায় যখন থাকেন, তখন পুকুরে-টুকুরে ডুবে মরারও ভয় নেই। অরিন্দম কিছু বলেনি। কিন্তু সাতদিনের মধ্যেই কলকাতায় তুমুল বৃষ্টি নামল। অলিগলি থেকে বড়-বড় চওড়া ট্রাম-বাসের রাস্তা পর্যন্ত এক হাঁটু জলে ভর্তি। ভদ্রলোক আপিস থেকে বাড়ি ফিরছেন, জলের মধ্যেই প্যান্ট গুটিয়ে নিয়ে হাঁটছেন, তাছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না, রাস্তার এক জায়গায় পথের উঁচু-নিচু ঠিক করতে না পেরে পড়ে গেলেন জলের মধ্যে। উঠেও পড়লেন বটে তাড়াতাড়ি, কিন্তু তার থেকেই মস্ত অসুখ, সাতদিনের মধ্যেই সব শেষ।

হাতের রেখা-টেখা দেখে সত্যি কিছু বলা যায় কি না তা না জানলেও আর সবার মতো, হাত দেখানোর সুযোগ মিললে আমারও হাত বাড়িয়ে দেবার ইচ্ছে করে। অরিন্দমের সঙ্গে চায়ের দোকানে যে ঢুকলুম, তার পিছনে হাতে সময় থাকা ছাড়াও হাত-দেখানোর লোভটাও মস্ত কাজ করল। তখনও ঠিক বিকেল হয়নি, চায়ের দোকান সবে খুলেছে, রেস্টুরেন্টের বেয়ারা সবগুলো টেবিল-চেয়ার তখনও গুছিয়ে উঠতে পারেনি। লোকজন একেবারে নেই। অরিন্দম এক কোণের একটা চেয়ারে বসে আমাকে তার পাশের চেয়ারে বসার ইঙ্গিত করল।

অরিন্দম কেন আমাকে তার পাশের চেয়ারে বসত বলল, তা আমি বুঝতে পারলুম। আমি ওকে আমার হাত দেখার কথা বলেছিলুম, ও এখন আমার হাত

দেখতে চায়। পাশাপাশি বসলেই হাত দেখার বেশি সুবিধে। কিন্তু আমি একটু ইতস্তত করে ওর সামনের চেয়ারে বসলুম।

অরিন্দম একটু অবাক হল। যতটা অবাক হল, তার চাইতে বেশি আহত। মুখে কিছু বলল না। ও মুখে কিছু না বললেও আমি মনে-মনে নিজের ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হলুম।

এইরকম যে কতবার ঘটেছে। কতবার এইরকম অভদ্রতা করেছি, কত বন্ধুকে আহত করেছি।

চা এল। অরিন্দম আর তেমন করে কথা বলছে না। ও এতক্ষণ অনর্গল কথা বলছিল, এখন আমার প্রশ্নের দু-একটা ছোটখাটো উত্তর দিচ্ছে শুধু। আমার হাত দেখার ওর আর কোনো উৎসাহ নেই।

শেষটায় আমিই বললুম, "তুমি অবাক হয়ে গেছ, না অরিন্দম?"

অরিন্দম কথা ঢাকবার জন্য বলল, 'কেন?"

"রেস্টুরেন্টে আমার সামনের চেয়ার খালি রেখে আমি কখনো বসি না। তোমার পাশাপাশি বসলে আমার সামনের চেয়ার খালি থাকত।"

অরিন্দম অবাক হয়ে বলল, "কিছু বুঝতে পারছি না।"

"না পারার-ই কথা!" একটু থেমে আমি আবার বললুম, "মাঝে-মাঝে ইচ্ছে করে একবার পরীক্ষা করে দেখতে। আমার সেই সঙ্গী নির্জন দিনের সঙ্গী সে আজও আছে কি না, আমার সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ এখনো তার আছে কি না।"

অরিন্দম একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "তুমি যদি কিছু বলতে চাও স্পষ্ট করে বলো, বিকাশ। হেঁয়ালি ভাল লাগে না।"

"তুমি শুনবে?"

"কেন শুনব না?"

"কোনোদিন কারুকে বলিনি। ভেবেছি, বলাটা হয়তো সে পছন্দ করবে না। কিন্তু আজ এত বছর পরে হয়তো আমার কথা তার আর মনে নেই, এখন বোধহয় বলা যেতে পারে।"

অরিন্দম আরো দু'কাপ চায়ের কথা বলল। আমি আমার কথা বলতে শুরু করলুম।

স্কুল ছাড়ার পর স্কুলের পুরনো বন্ধুরা কোথায় কোনদিকে চলে গেল। কেউ ভর্তি হল বড় কলেজে, কেউ পড়তে গেল বিজ্ঞান, কেউ বাণিজ্য, আমি আমার বাড়ির কাছাকাছি আশুতোষ কলেজে ঢুকলুম। ক্লাসে আমার পরিচিত কেউ নেই, স্কুলের বন্ধুরা কেউ নেই, আমার খুব একা-একা লাগত। সব চাইতে কষ্ট হত বিকেলবেলায়। কলেজ থেকে ফিরে এসে করবার কিছু নেই, অথচ বিকেলবেলায় বাড়িতে বসে থাকাও যায় না। পুরনো বন্ধুরা কেউ নেই, নতুন বন্ধু পেতেও সময় লাগে, আমি একা-একা রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াতুম। কিন্তু কতক্ষণ আর রাস্তায়

এলোমেলো ঘুরে বেড়ানো যায়, পার্কে দাঁড়িয়ে ক্রিকেট খেলা দেখা যায়! সেই বিকেলগুলো আমার কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। সেই বয়সে, তুমি বুঝতেই পারো, নানা বিষয়ে কৌতূহল জেগে ওঠে, নানা বিষয় জানতে ইচ্ছে হয়। তখন রোজই নতুন-নতুন জানা আর নিজের উপর গভীর আস্থায় নিজেকে মস্ত পণ্ডিত বলে ভাবা। তখন সঙ্গীর দরকার একান্ত, যার কাছে বিদ্যে জাহির করা যায়, তাকে তর্কে পরাস্ত করে একটা উঁচুদরের আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়, যার সঙ্গে ভাবনা বিনিময় করে নিজেকে তৈরি করে নেওয়া যায় ভিতরে-ভিতরে। আমার অনুরাগের বিষয়টা ছিল সাহিত্য, কিন্তু কার সঙ্গে কথা বলব, কাকে বুঝিয়ে দেব কবিতা কাকে বলে আর কাকে বলে না। কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ জমে ওঠেনি, সারাদিন চুপচাপ কাটে, আর বিকেলবেলায় বড় বেশি তীব্র হয়ে ওঠে আমার নিঃসঙ্গতা।

শেষটায় চায়ের দোকানের আশ্রয় নিলুম। চায়ের দোকানে বেশ সময় কাটে, এক কাপ চা নিয়েই আধঘণ্টা একঘণ্টা বসা যায়, শোনা যায় আশপাশের টেবিলের আলাপ-আলোচনা, গাল-গল্প। বিকেল কাটানোর পক্ষে মন্দ নয় চায়ের দোকান। কিন্তু অনেক দোকানে বেশি ভিড়, সেখানে মিনিট পনেরোর বেশি বসাই যায় না, আমি খুঁজে পেতে হাজরা রোডে একটা কম-ভিড়ের চায়ের দোকান বের করলুম। বিকেলবেলায় আমি চলে যেতুম সেই চায়ের দোকানে, ঘণ্টাখানেক বসতুম। তারপর এলোমেলো খানিকটা ঘুরে বাড়ি ফিরে আসতুম। চায়ের দোকানে জানলার পাশের চেয়ারটা আমার বাঁধা ছিল, জানলা দিয়ে দেখতুম পথের মানুষজন, গাড়ি-সাইকেল, আর শুনতুম আমার টেবিলের আশেপাশের টেবিলে নানা বয়সের নানা ধরনের লোকদের পৃথিবীর প্রায় সব বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা তর্ক-বিতর্ক। সেইসব আলোচনা আমার তেমন ভাল লাগত না, তবু সময় কাটানোর জন্য সেদিকে মন দিতুম। ওরা কেউ সাহিত্য বোঝে না, সাহিত্যের কোনো খোঁজখবর রাখে না। ওদের সঙ্গে কখনও দু'-একটা কথা বলে আমি এক কোণের জানালার ধারের চেয়ারে বসে হয় রাস্তা দেখতুম, না হলে সদ্য-কেনা কোনো ম্যাগাজিনের ভিতরে ডুবে যেতাম। চায়ের দোকানে যারা আমার পরিচিত, তারা কখনো আমার হাতের ম্যাগাজিনের খোলা পাতা উঁকি দিয়ে দেখত, কখনো বা হাতে নিয়ে কবিতা বিষয়ে দু-একটা ব্যঙ্গ-মেশানো সরস মন্তব্য করে আবার ফিরিয়ে দিত। আমি তাতে রাগ করতুম না, ওদের কথার উত্তর না দিয়ে কেবল মৃদু হাসতুম, সবার সঙ্গে কি সাহিত্য-আলোচনা করা যায়! রাগ না করলেও মনে-মনে কিন্তু আমি একটা কষ্ট পেতুম, আমার মনের কথাগুলোকে বলতে না-পারার কষ্ট। যদি সঙ্গী থাকত আমার একজন, কথা বলা যায় এমন সঙ্গী!

সেই চায়ের দোকানে এক কাপ চায়ের দাম ছিল এক আনা। তখন নয়াপয়সা অর্থাৎ আজকের দিনের হিসেবের পয়সা চালু হয়নি। প্রথম-প্রথম আমি রোজকার দাম রোজই মিটিয়ে দিতুম, পরে দোকানের মালিকের সঙ্গে চেনাশোনা হতে ঠিক

হল সারা মাসের চায়ের দাম আমি মাসের শেষে একবারে মিটিয়ে দেব। এটা আমার পক্ষে সুবিধের ছিল, মালিকেরও কোনো আপত্তি ছিল না। ষোলো আনা এক টাকা—প্রতি মাসের শেষে আমাকে দু' টাকা দিতে হত। সারা মাসে বাড়তি চা আমি কাপ-দুয়েকের বেশি খেতুম না।

এইরকমই চলছিল। আমার বিকেলগুলো একরকমভাবে কেটে যাচ্ছিল। খুব ভালও না, খুব মন্দও না। কিন্তু সেবার মাসের শেষে দাম মেটাতে গিয়ে একটা ঘটনা ঘটল। আমি, যেমন দেওয়ার কথা, দোকানের মালিককে দু' টাকা দিতে গেলুম আর তিনি অল্প হেসে বললেন, "চার টাকা।"

আমি অবাক হলুম। বললুম, 'দু' টাকাই তো হবার কথা। এমাসে এক কাপের বেশি চা আমি মাত্র দু'দিন খেয়েছি।'

মালিক বললেন, "ঠিকই। কিন্তু আপনার বন্ধু? তিনিও তো রোজই আপনার সঙ্গে চা খেয়েছেন!"

বন্ধু! বন্ধু আবার আমার কে! আমি প্রতিবাদ করতে গেলুম, কিন্তু দেখি, দোকানের আর সবাই হাসছে। তারা সবাই আমার পরিচিত, একই দোকানে বসে অনেকদিন চা খাচ্ছি, কেউ আমার শত্রু নয়। তাদের একজন তো বলেই উঠল, "আপনার সামনের চেয়ারে বসে চা খান, আজও খেয়েছেন, এই তো এইমাত্র তিনি উঠে গেলেন!"

আমার সঙ্গে মজা করার অথবা আমাকে জব্দ করার কোনো কারণই এদের থাকতে পারে না। আমি বুঝলুম, কোথাও একটা ভুল-বোঝাবুঝি হচ্ছে। আমি আর কথা বাড়ালুম না, মালিকের হাতে পুরো চার টাকা দিয়ে তাড়াতাড়ি দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

বাড়ি ফিরতে-ফিরতে আমার মনে হল হয়তো কোনো অসৎ লোক আমার বন্ধু সেজে আমার নামে চা খেয়ে যায়। আমি ঠিক করলুম, এবার থেকে খুব কড়া নজর রাখতে হবে। কে আমার সামনের চেয়ারে বসে আমার বন্ধু সেজে আমার নামে চা খেয়ে যায়, লক্ষ্য করতে হবে।

সারা মাস খুবই সতর্ক থাকলুম। আমার সামনের চেয়ারে কেউ বসলই না। আমার পাশের চেয়ারে যারা বসল, তারা দাম মিটিয়ে দিয়েই চলে গেল। আমি ভাবলুম, লোকটা হয়তো সব জানাজানি হয়ে গেছে বুঝে ভয়ে আর আসছেই না। একরকম ভালই হল, আমার দুটো টাকা লোকসান হল বটে, কিন্তু আর হবে না।

কিন্তু সে মাসেরও শেষে সেই একই ঘটনা। মালিক আমার কাছে চার টাকা চাইলেন। আমি জোর দিয়ে বললুম, "কেউ আমার সঙ্গে চা খায়নি, আমার সামনের চেয়ার সারা মাস আগাগোড়া খালিই ছিল।"

দোকানের মধ্যে অনেকেই আমার পরিচিত। তাদের একজন কিন্তু বলে উঠল, "সে কী, আপনার সামনের চেয়ারে বসে তিনি রোজ চা খান, আপনার সঙ্গে কত

গল্প করেন, হাসি-ঠাট্টা-মস্করা করেন, এই তো আজই এতক্ষণ গল্প করে এইমাত্র চলে গেলেন।”

আর-একজন বলল, “আপনার সঙ্গে সাহিত্য-আলোচনা করেন, আপনিও তাঁর সঙ্গে তর্কে মেতে ওঠেন।”

এরা সবাই আমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র করতে নেমেছে। ডাহা মিথ্যে বলছে। রাগে আমার শরীর কাঁপতে লাগল। কিন্তু এতগুলো লোকের অভদ্রতার বিরুদ্ধে আমি কিছুই করতে পারব না, পারার ইচ্ছেও আমার নেই। আমি আরও দু’ টাকা মালিকের হাতে দিয়ে কোনোদিকে না তাকিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এলুম।

আর এ দোকানে নয়। কালই অন্য দোকানের খোঁজ করতে হবে।

পরের দিন ঘুরতে-ঘুরতে আর-একটা চায়ের দোকানের সামনে এলুম। এ-দোকানে চায়ের দাম একটু বেশি, ছ’ পয়সা, অর্থাৎ তখনকার দিনের দেড় আনা। দোকানটাও আগের চাইতে অনেক বড়, সাজানো-গোছানো। আমি দোকানে ঢুকে জানলার পাশেই একটা চেয়ার পেয়ে গেলুম। এ-দোকানে ভিড়ও অনেক বেশি। চা আনতে বলার পরেই আমি বুঝতে পারলুম, এখানে বেশিক্ষণ বসা যাবে না, একঘণ্টা আধঘণ্টা তো নয়ই, পনেরো মিনিটও নয়। এ দোকান আমার চলবে না। আমার সময় কাটানো নিয়ে কথা, সময় কাটানোর মতো, অনেকক্ষণ বসার মতো একটা দোকান খুঁজে বার করতে হবে।

ভিড় ক্রমশই বাড়ছে। অনেক লোক দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে। আমি দেখলুম, আর বসা সম্ভব নয়। আমার চা-ও ফুরিয়ে গেছে। মাত্র দশ মিনিট বসেছি, এর মধ্যেই উঠতে হবে!

আমি উঠে দাঁড়ালুম। আস্তে আস্তে কাউণ্টারে গিয়ে টেবিলের উপর ছ’পয়সা রাখলুম। যে আমাকে চা দিয়েছিল, কাউণ্টারের লোকটি তার দিকে তাকাল। সে বলল, “তিন আনা।”

“তিন আনা!” আমি কাঁপা গলায় বললুম, “কিন্তু আমি আমি তো এক কাপই চা নিয়েছি!”

“আপনার বন্ধু, যিনি আপনার সঙ্গেই চা খেলেন, গল্প করলেন, তারপর দাম না দিয়ে চলে গেলেন, তাঁর চায়ের দাম?”

আমার সমস্ত শরীর তখন কাঁপছে। আমি কোনমতে তিন আনা বার করে টেবিলের উপর রাখলুম।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরোতে যাব, হঠাৎ আমার মনে পড়ল, এত ভিড়ের মধ্যেও আমার সামনের চেয়ারটা কিন্তু খালিই ছিল।

আমার গল্প শেষ হল। অরিন্দম কিছু বলল না, চুপ করে বসে রইল। আমার হাত দেখার কথা ওর মনেই পড়ল না, আমারও না।

ছেলেবেলার ভূত

প্রলয় সেন

না, কারুর মুখ থেকে শুনে লিখছি না। বানিয়েও না। বিশ্বাস করো, ছেলেবেলায় স্বচক্ষে আমি এক জল-জ্যান্ত ভূত দেখেছিলাম। শুধু আমি একলা নই, আমাদের পাড়ার অনেকেই।

তখন আমার বয়স চার কি পাঁচ হবে। সে সময় আমাদের দিকটাতে একটা বিদ্‌ঘুটে ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছিল।

আমদের পাড়া মানে এই কলকাতা শহরেরই দক্ষিণেরই একটা অংশ। এখন যেখানে বাড়ি ঘরের জটিলতায় আকাশ দেখা যায় না—ঢাকুরিয়ার সেই পশ্চিম ভাগটা আমাদের ছেলেবেলায় ছিল পাড়াগাঁ ধরনের। বাঁশঝাড় ছোটবড় নানা মাপের অজস্র পুকুর উত্তরে ছিল। দক্ষিণে বিশাল গড়খাই মাঝে মাঝে ফলের বাগান কালকাসুন্দর ঝোপ, কি না ছিল। শীতকালে ভর দুপুরে প্রায়ই দেখতাম শেয়াল মা তার ছানাপোনা নিয়ে গর্ত থেকে ফাঁকায় উঠে এসে রোদ পোয়াচ্ছে। আর ছাঁচতলায় হরবকত ছোটাছুটি করত বেজী আর গন্ধগোকুলের দল। সন্ধে নামতে না নামতেই ঝোপেঝাড়ে বা ঘড়াঁসার চোখ ধক ধক করে জ্বলত।

সেই সময়, সবে জ্যৈষ্ঠ শেষ হয়ে আষাঢ় পড়েছে, বৃষ্টিটৃষ্টিও হচ্ছে বেশ, শুরু হয়ে গিয়েছিল সেই পিলে চমকানো ভূতের দৌরাত্ম্য।

হঠাৎ বলাকওয়া নেই মাঝরাত্তিরে শোনা গেল, ঘোষবাড়ির টিনের চালে ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে—কাঠের খড়ম পরে হাঁটলে যেমন হয়, তেমনি এক ঘচাং মচাং বিশ্রী আওয়াজ।

ঠিক তার দু'দিন পরে শ্যামকোটাল ভোরবেলা তার গোয়াল ঘরে দুধ দুইতে গিয়ে বিকট চিৎকার করে পাড়ার লোক জড়ো করল। কি ব্যাপার, না—সবাই গোয়ালে ঢুকে দেখে, শ্যামকোটালের সবচেয়ে পুরুষ্টু দুধেল গাইয়ের বাঁট সাতসকালে শুকিয়ে মুচমুচে হয়ে আছে। আর ঠিক বাঁটের ওপরেই কয়েকটা বেশ বড় দাঁতের কামড়ের দাগ। একমাত্র দুধরাজ নামে এক জাতীয় বিষধর সাপই নাকি গরুর বাঁট চুষে দুধ খায়। শ্যামকোটাল হাউ মাউ করে বলল, বাবুরা, এ কিছুতেই দুধরাজের কাজ নয়। দুধরাজের দাঁত এত বড় হতেই পারে না। তাহলে আর কোন্ প্রাণীর হতে পারে। শেয়াল কুকুর তো আর গরুর দুধ খেতে আসবে না। সকলের সঙ্গে সঙ্গে ঘোষবাড়ির রাত্তিরের ঘটনাটার কথা মনে পড়ে। কেউ আর উচ্চবাচ্য করে না।

আতঙ্কিত মুখে যে যার বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

বিপিন মণ্ডলের ছেলে হারু খুবই ডাকাবুকো ধরনের। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে রাতদিন আদাড়ে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। সেবারও বৃষ্টিতে আশপাশের পুকুরটুকুর ভেসে গিয়ে বাড়তি জল আমাদের পাড়ায় পুবের নিচু মাঠটায় জমেছে। হারুও যথারীতি তৈরি। রাত একটু মজতে লণ্ঠন হাতে কোঁচ আর খালুই নিয়ে হারু পুকুরভাসি মাছের খোঁজে সেই জলে থইথই মাঠে নেমেছে। হারুর চোখের দৃষ্টি যেমন তেজালো, হাতের নিশানাও তেমনি অব্যর্থ। সে টকাটক একদেড় পোয়া ওজনের মাছ গাঁথে আর খালুইতে ভরতে থাকে। বেশিরভাগই পোনামাছ। শেষে খালুই ভরে উঠলে সে ডাঙায় এসে একটা শ্যাওড়া গাছের ডালে খালুইটা ঝুলিয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে জম্পেশএ করে টানতে থাকে। হঠাৎ জলের ভেতর কিছুটা দূরে একটা বড় ঘাই উঠতে হারু লোভ সামলাতে পারে না। হাতের আধপোড়া বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কোঁচটা বাগিয়ে ফের জলে নেমে পড়ে। কিন্তু কাছাকাছি গিয়ে দেখে, ও হরি, মাছ নয়— একটা গোসাপ। সে ব্যাটাও হারুর মতই মাছের খোঁজে জলে ঘোরাফেরা করছে। বিরক্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়ায় হারু। তারপর ডাঙার দিকে তাকাতেই ভয়ে তার হাতে পায়ে খিল লেগে যায়। লণ্ঠনটা টুক করে পড়ে যায় জলে। দেখে, একটা মিশকালো হিলহিলে ছায়ামূর্তি শ্যাওড়া গাছের ডাল থেকে খালুইটা পেড়ে নিয়ে একটা মাছ মুখে পুরে পুরে কচকচ করে চিবুচ্ছে। পরদিন সকালে হারুকে জল কাদা থেকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

সতীশ মিত্তিরের দিদি ছিলেন পাড়ার সার্বজনীন বুড়িপিসি। বালবিধবা। ভাইয়ের সংসারেই মানুষ। পাড়ার সকলে বুড়িপিসিকে ভালবাসত। বুড়িপিসি দিনমান ঘুরে ঘুরে এবাড়ি সেবাড়ির খবরাখবর নিতেন। বিয়ে শ্রাদ্ধ অন্নপ্রাশন সত্যনারায়ণ পূজা আঁতুড়ঘর—সব কাজেই বুড়িপিসির ডাক পড়ত। বিধবা মানুষ। একাহারী। খাওয়া সারতে বিকেল হয়ে আসত। সতীশ মিত্তিরের বাড়ির পেছনদিকে ছিল একটা এঁদোপুকুর। বুড়িপিসি অনেকগুলো হাঁস পুষতেন। হাঁসগুলো দিনভর এঁদো পুকুরটায় চরে বেড়াত; গেঁড়ি গুগলি তুলত পাঁক থেকে। সেদিন খাওয়ার শেষে অবশিষ্ট কিছু এঁটো ভাত-তরকারি সমেত পাথরের থালাটা নিয়ে এঁদোপুকুরের তাল পৈঠায় এসে দাঁড়িয়েছেন বুড়িপিসি। একেই বেলা আর বেশি নেই। তার ওপর আকাশ মেঘে কালো হয়ে ওঠায় উলুমঝুলুম অন্ধকার নেমেছে। বুড়িপিসি প্রতিদিনের মত মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ তুলে ডাকছেন—'চই-চই-চই-চই...'। ও মা, হাঁসগুলো দূরের পানাদাম থেকে ফিরে আসবার আগেই পুকুরপাড়ের বেলগাছ কি জামগাছটা থেকে ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ে সেই অশরীরী। তারপর এক হ্যাঁচকা টানে পাথরের থালাটা টেনে নিতে 'উফ্ মাগো, মেরে ফেললে গো' বলে বুড়িপিসি টাল খেয়ে পাড়ের দিকে মুখ থুবড়ে পড়ে যান। পরের দিন চেঁচামেচিতে মিত্তির বাড়ি সরগরম। বুড়িপিসির কোলে কাঁখে বোঁচকা-পুঁটলি। তিনি কারুর কথা শুনতে

রাজি নন। সমানে গলা ফাটাচ্ছেন, 'সতীশ, এখনই চল্। আমাকে হাওড়া ইস্টিশনে নিয়ে গিয়ে ট্রেনে তুলে দিবি। আমি আর এক বেলাও এই ভূতের রাজ্যে থাকব না। কাশী চলে যাব...।' —পাড়ার বয়স্করা সে যাত্রা অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বুড়িপিসিকে শান্ত করে।

তার কয়েকদিন পরের কথা। আমাদের পাড়ার পশ্চিমে, এখন যে জায়গাটা সেলিমপুর নামে পরিচিত, সেখানে তখন ছিল একটা পরিত্যক্ত কবরখানা। কবরখানার গা ঘেঁষে এক মস্ত তাল বাগান। রাত ফর্সা হতে না হতেই পাড়ার ছেলেরা সেখানে তাল কুড়োতে যেত। সেদিন পাড়ার জনাতিনেক ছেলে তাল বাগানে ঢুকেছে। গোটা পাঁচ ছয় পাকা তাল থলিতেও ভরেছে। হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়ে দেখে একটা বড় তাল গাছের নিচে একটা ছাই রঙা নরকঙ্কাল দাঁড়িয়ে। তার ডান হাতে একটা তাল। ছেলের দল ঘাবড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠতেই ঘটে যায় এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড। হাতের তালটা ফেলে দিয়ে প্রাণীটা ক্যাঙারুর মত বিরাট লাফ মেরে মেরে কাঁটা ঝোপ ডিঙিয়ে চোখের পলকে গড়ঘাইয়ের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। সেই থেকে ছেলেরা আর ওমুখো হয়নি।

বিদ্‌ঘুটে ভূতটার অত্যাচার দিন দিন বাড়তেই থাকে। আজ এ ফলের বাগানে আম সব শেষ, কাল ও বাগানের জামরুল হাওয়া। আজ চাটুজ্জে বাড়ির গিন্নি রান্নাঘরে ডালে ফোঁড়ন দিতে গিয়ে, হঠাৎ জানালায় চোখ পড়তেই বিরাট দুটো ধকধকে চোখ দেখে চেঁচিয়ে ওঠেন, কাল দত্তবাড়ির ছেলে বাইরের ঘরে পড়তে বসে লণ্ঠনের আলোয় দেয়ালে কিম্ভূত এক ছায়া দেখে আঁৎকে ওঠে। ভিরমি খায়। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হতে না হতেই সব বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ হয়ে যায়। যারা অফিস কাছারিতে যান তারাও যত তাড়াতাড়ি পারেন বাস কিংবা ট্রেন থেকে নেমে দুর্গানাম জপতে জপতে বাড়ি ফেরেন। সে এক অসহনীয় পরিস্থিতি!

সহ্য করা ছাড়া উপায়ই বা কি! ভূতটা মেছো না গেছো; শাঁকচুন্নি, ব্রহ্মদৈত্যি না মামদো তো বোঝা গেলেও না হয় ওঝাটোঝা ডেকে একটা বিহিত করা যেত। শেষমেষ রেললাইনের পূর্ব পাড়ের নব যুবক ব্যায়াম সমিতির ছেলের দল ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। তারা আমাদের পাড়ার বয়স্কদের অভয় দিয়ে বলল, 'আপনারা ঘাবড়াবেন না। আমরা ডিফেন্স পার্টি তৈরি করছি। সারারাত জেগে আপনাদের পাড়া টহল দেব। দেখি, ভূত বেটা কি করে।' —চোর তাড়াতে ডিফেন্স পার্টি তৈরি করার রেওয়াজ আছে। কিন্তু ভূত কি এভাবে তাড়ানো যায়। প্রস্তাবটা মনঃপূত না হলেও পাড়ার লোকজন ওদের কথায় শেষ পর্যন্ত দায়ে পড়ে তেতো ওষুধ গেলার মত সায় জানায়।

তারপর বেশ কয়েকদিন ধরে চলল নব যুবক ব্যায়াম সমিতির ছেলে ছোকরাদের দাপাদাপি। মশাল আর লণ্ঠন হাতে এরা সারারাত পাড়ার ভেতর দৌড়দৌড়ি করে। হুইসেল বাজায়। চেঁচিয়ে একজন আরেকজনকে ডাকে। তাতে

অনেকেরই ঘুমের দফা রফা হলেও একটা বিষয়ে সকলেই খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়। তা হল, ভূতের ভয় থেকে কিছু দিনের জন্য পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

শেষমেশ, বললে বিশ্বাস করবে না, ভূতটা একদিন ধরাও পড়ে যায়। অবশ্য ডিফেন্স পার্টির হাতে নয়।

সেদিন ভোরের দিকে আমাদের বাড়ির উত্তরে মজুমদার বাড়ির লাগোয়া বাঁশ-ঝাড় থেকে হঠাৎ একটা গোঙানির আওয়াজ ভেসে আসে। তখন চারদিকে বেশ ফর্সা হয়ে উঠেছে! মজুমদার বাড়ির বড় ছেলে, কলেজে পড়ে, সেই আওয়াজ শুনে বাঁশ-ঝাড়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখে ভেতরে একজন কে তেঠ্যাঙা হয়ে বসে কোঁকাচ্ছে। চারদিক থেকে লোকজন সেখানে ছুটে যায়। তারপর সেই ভূতটাকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে আমাদের বাড়ির সামনের উঠোনে নিয়ে আসা হয়।

দেখে তো ভয়ে আমাদের গায়ে কাঁটা। লম্বা ঢ্যাঙা, রোগা হাড্ডিসার চেহারা। পাঁজরার প্রত্যেকটা হাড় আলাদা আলাদা করে গোনা যায়। মাথা থেকে বটের ঝুরির মত চুলের জপ নেমেছে। মুখভরে সন্ন্যাসীদের মত দাড়িগোঁফ। সারা গায়ে কেউ যেন কালি ঢেলে দিয়েছে।, পরণে হাড়ো পাতলা চামড়া। শুধু কোমরের দিকটাতে একফালি নোংরা ন্যাকড়া। সবচেয়ে মারাত্মক চোখ দুটো। ধকধক করে জ্বলছে। দেখলে মনে হয়, বিশ্বসংসার সব যেন চিবিয়ে খাবে।

সবাই মিলে নানারকম প্রশ্ন করে। ভূত জবাবে কিছুই বলে না। শুধু পেটে একটা হাত রেখে মুখে গোঁ-গোঁ শব্দ তোলে। পাড়ার সবচেয়ে গণ্যমান্য জ্ঞানবাবু বিজ্ঞের মত বলেন, 'ব্যাটার হাবভাব লক্ষ্য করছ তোমরা। ভূত নয়, তবে নির্ঘাত ভূতে ধরেছে লোকটাকে।' —সেকথা শুনে প্রতিবেশী মাধব দত্ত চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করেন, 'তাহলে এখন উপায়?' —'উপায় আর কি', গম্ভীর মুখে জবাব দেন জ্ঞানবাবু, 'ব্যাটার শরীর থেকে ভূত তাড়াতে হলে ওঝা ডাকো শিগ্‌গির।' —সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার দুই ছোকরা তেলিপাড়ার দিকে ছোটে। সেখানে ব্রজেন ভুঁইমালি থাকে। ওঝা হিসেবে তার তখন যথেষ্ট নাম ডাক।

ভিড় একটু পাতলা হয়ে আসতে বাবা মাকে ডেকে পাঠান। মা তখন সবে রান্নাঘরের দিকে গেছে। বাবা এতক্ষণ চুপচাপ লোকটাকে দেখছিল। মা ফিরে এলে বাবা বলেন, 'রঘুকে দিয়ে এক ধামা মুড়ি, কিছুটা গুড় আর একবাটি গরম দুধ পাঠিয়ে দাও তো।'

বাবার কথার ইঙ্গিত মা ধরতে পারে না। কিন্তু বাবার মুখের ওপর কথা বলার মত সাহসও নেই মার। মা আবার রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ায়।

খানিক বাদে চাকর রঘু মুড়ি গুড় দুধ নিয়ে ফিরে এসে বাবা উঠোনে নেমে খাবারগুলো সেই চুল দাড়িগোঁফওলা কঙ্কালটার সামনে রাখে।

তারপর সে এক কাণ্ড। ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ। সব খেয়ে নিয়ে চারদিকে একবার ভাল

করে তাকিয়ে নিয়ে হুমড়ি খেয়ে বাবার পায়ের কাছে পড়ে খোনা খোনা গলায় বলতে থাকে কঙ্কালটা, 'আপনি আমাকে বাঁচালেন বাবুমশাই। আমি বাদার দেশের লোক। বন্যায় ঘরবাড়ি সব ভেসে যাওয়ায় এখানে এসেছি। ছেলেছোকরাদের জ্বালায় পাঁচ ছ'দিন হয়ে গেল পেটে একফোঁটা দানাও পড়েনি—'

ক্রমশ ওর কালসিটে পড়া মুখে হাসি ফুটে উঠতে থাকে।

আমি অবাক হয়ে গিয়ে বলি, 'বাবা, কই, এতো ভূত নয়—এ যে দেখছি মানুষ!' বাবা হেসে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে মাথা নাড়েন, 'ঠিক বলেছিস। এতকাল ভূতই ছিল। পেটে দানা পড়ায় আবার মানুষ হয়ে উঠেছে।'

ভূতুড়ে রসিকতা

আনন্দ বাগচি

কতকাল আগের ঘটনা, তবু চোখ বুজলে সেদিনের কথা বলে মনে হয় আমার কাছে। কিছুতেই ভুলতে পারি না। এতকাল পরে এই কলকাতায় বসেও গায়ে কাঁটা দেয়। ঘটনাটা লিখতে বসে এই রাত্তিরে এখনো আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে সত্যি সত্যি।

গণপতিদের বাড়ির দোতলার হলঘরে বসে আমরা আড্ডা দিচ্ছিলাম। অবিশ্যি আড্ডা দিচ্ছিলাম বললে ভুল বলা হবে, আমরা আড্ডা দেবার ভাণ করছিলাম। আসলে ফটকের অপেক্ষা করছিলাম, সেই বিকেল পাঁচটা থেকে। যদিও পাঁচটার সময়ে ও কদাচিৎই এখানে আসে, ওর আসতে আসতে সন্ধে লেগে যায়। মাসিমা, মানে গণপতির মা, যখন চা আর জলখাবার পাঠিয়ে দেন এঘরে, ঠিক তার কিছু আগে ও এসে হাজির হয় কান এঁটো করা একমুখ হাসি নিয়ে। তারপর সিঙ্গাড়ার চুবড়ির খুব কাছ ঘেঁসে বসে পড়ে রোজ একটি মাত্র বাক্যই মুখস্থ সংলাপের মত আওড়ে যাবে, ইস, আজ বড্ডই দেরি করে ফেললাম, তাই না?

আগে আগে জবাব দিতাম, এখন আর দিই না। এখন আমরা সবাই ওর ওপরে তিতিবিরক্ত, কেউ আর ওকে পছন্দ করি না। ওর মতিগতি বুঝে ফেলার পর অসহ্য লাগবারই কথা। আসলে ফটকে আমাদের বন্ধু-টন্ধু কেউ নয়, ফাঁক তালে আমাদের মধ্যে এসে ভিড়ে গেছে। গল্প করতে, আড্ডা দিতে আদৌ আসে না, আসে জম্পেশ খ্যাঁটনের লোভে। মাসীমার হাতের ওই বোম্বাই সাইজের গব্য ঘৃতে ভাজা সিঙ্গাড়া আর প্রায় টেনিস বলের সাইজের কাঁচা গোল্লার কথা ভাবলে আমাদেরই জিবে জল আসে, তা ওর মত হ্যাংলা পেটুকের তো কথাই নেই। টপ স্পিডে মুখ চালিয়ে ও শেষ তক আমাদের ভাগেও ভাগ বসায়। তারপর চায়ের কাপের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত শুষে খেয়ে মিনিট পাঁচেক ক্লাউনমার্কা হাসিমুখে কেমন ঘোরের মধ্যে যেন বসে থাকে। শেষে যেন ধড়মড় করে জেগে উঠে বলে, ইস, আজ বড্ডই দেরি করে ফেললাম, তাই না! —বলেই নিঃশব্দে ভ্যানিশ হয়ে যায়। ওর ওপরে আমরা চটেছি কি সাধে! কিন্তু গণপতি নিতান্ত ভদ্র ছেলে, ভালমানুষ। বাড়িতে কেউ বন্ধুর মত এলে তাকে অপমান করে তাড়ান তো দূরের কথা, দুটো কড়া কথা বলাও ওর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই অনেক সলা-পরামর্শ এঁটে আমরা আজ তৈরি হয়েছি ফটকেকে এমন শিক্ষা দিতে, যাতে নিজে থেকেই ও সটকে পড়ে, আর কখনো না এ বাড়িমুখো হয়।

কিন্তু এই গল্পের আগেও একটা গল্প আছে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে তখন হঠাৎই বেকার হয়ে পড়েছি। সামনে ধু-ধু ছুটি, অখণ্ড অবসর, অথচ কিছুই করার নেই। আচমকা স্বাধীনতা পেয়ে গেলে যে দশা হয় আর কি। এটা ভাঙছি ওটা জুড়ছি, গল্পের বই পড়েও যেন সময় কাটতে চায় না। সকাল বিকেল টো টো কোম্পানির বিনে মাইনের চাকরি বেছে নিয়েছি শেষ ইস্তক। আহিরীটোলায় বি. কে. পাল এভিনিউতে তখন দুপুরবেলায় ছেলেরা সাইকেল শিখত। শহর তখন কি রকম ফাঁকা ছিল বুঝতেই পার। ঘণ্টা পিছু নামমাত্র ভাড়ায় সাইকেল পাওয়া যেত। সাইকেল জানাই ছিল আমাদের। শুধু পুরনো অভ্যেস ঝালাই করতে উঠে পড়ে লেগে গেলাম আমরা।

দু চাকার ভাড়া করা পক্ষীরাজ ছুটিয়ে আমরা শহরতলির তেপান্তরের দিকে চলে গিয়েছিলাম সেদিন। শুধু আমাদের ঘোড়ার নয়, আমাদেরও তখন পাখা গজিয়েছে। একেক দিন একেক দিক আবিষ্কার করতে বেরিয়ে পড়ি। আজ শুনে হাসবে তোমরা, কিন্তু তখন কলকাতা শহরটাকেই অনেক বড় মনে হত, শহরতলি মানেই যেন বিদেশ। আহিরীটোলা থেকে চিড়িয়ার মোড় কিংবা ঘুঘুডাঙা তখন অনেক দূর। বি. টি. রোড দিয়ে এত বাস-মিনি-ট্যাক্সি তো তখন চলত না, সেটা ছিল পায়ে হাঁটার যুগ। টালার নতুন পুল পেরিয়ে সবে পাকপাড়ার মুখে পৌঁছেছি অমনি কে যেন ডাকল আমাদের নাম ধরে। আমি, লালু আর অবনী সাইকেল থামিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি গণপতি। গণপতি সামন্ত। ওরিয়েন্টাল ইস্কুলে ক্লাস নাইনে এসে ভর্তি হয়েছিল, সামান্য বন্ধুত্ব ছিল এক সেকশনেই পড়ি বলে কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তবু পোশাকে-আসাকে আর হালচালে বুঝতাম ও আমাদের মতন না, বড়লোকের ছেলে।

হাতে একগোছা নেমন্তন্নের চিঠি নিয়ে ও এগিয়ে এল আমাদের দিকে তোমরা এদিকে?

—বেড়াচ্ছি, কিন্তু তুমি? এদিকেই থাক বুঝি?

না। তবে এবার থেকে থাকব। —বলেই সাইকেলের সীটের ওপরে রেখে তিনটে খামের ওপরে আমাদের তিনজনের নাম লিখে দিয়ে বলল, রাস্তায় চিঠি দিলাম বলে মনে কিছু করো না। কাল আমাদের নতুন বাড়িতে গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্ন। এসো কিন্তু।

মনে করব কি, নেমন্তন্ন লুফে নিলাম। পরদিন গিয়ে দেখি, নতুন বাড়ি ঠিক না, একটা পুরনো বাগানবাড়িকেই ঘষে মেজে চমৎকার তিনতলা বানানো হয়েছে। আর এলাহি আয়োজন করেছেন গণপতির বাবা। দম-ভর খেয়ে আমরা ফিরে আসছিলাম, কিন্তু গণপতি ওর বাড়ির সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। আমরা ওর স্কুলের বন্ধু শুনে সবাই খুব খুশি। ওর মা তো বলেই বসলেন, বাঃ ভালই হল, রোজ বিকেলে তোমরা বেড়াতে বেড়াতে চলে আসবে। নতুন এ পাড়ায় এসে

গনুও বড্ড একলা হয়ে গেছে।

সেই থেকে আমরা গণপতির বন্ধু, রোজ আসি গল্প স্বল্প করতে। চারপাশ খোলামেলা, ফাঁকা চমৎকার। বেড়াতে আসার মত জায়গাই বটে। দোতলার হলঘরটায় বসে নিরিবিলিতে জমিয়ে আড্ডা দিই। নিমাই ফাইফরমাশ খাটে, চা জলখাবার পৌঁছে দিয়ে যায়। প্রথম রাউণ্ডে আসে বড় এক গ্লাস করে ঘরে পাকানো গুলাবি লস্যি। আহিরীটোলার ঘিঞ্জি পাড়া আর মুড়ি তেলেভাজার জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে সত্যিই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি আমরা। শুধু অস্বস্তি ওই ফটিকচন্দ্র, ও মাঝখানে এসেই যা রসভঙ্গ করে। আমাদের নিরঙ্কুশ আড্ডায় বেরসিকের মত থাবা বসায়। যেমন মোটা চেহারা, তেমনি মোটা বুদ্ধি ছেলেটার। আর তেমন কিম্ভূত রুচি। চুনোট করা ধুতি আর গিলে করা পাঞ্জাবি পরে, গায়ে এক গাদা সেন্ট ঢেলে যেন ধেড়ে নিতবর সেজে হাজির হয়। এই বয়সে এই চেহারায় কেউ আড্ডা দিতে আসে ভাবাই যায় না। সিঁড়ির মুখে ওর জুতোর শব্দ পাবার আগেই সেন্টের গন্ধ পাই। এসেই সরু মেয়েলি গলায় ওর মুখস্থ বয়ান ছুঁড়ে দেয় আমাদের দিকে। লালু বাঁকা গলায় আমার কানে কানে বলে, বাবু কালচার।

শেষে থাকতে না পেরে একদিন বলেই ফেললাম গণপতিকে, তোমার বন্ধুটি ভাই কেমন যেন! কিছু মনে করো না।

ফটিক সেইমাত্র একরাশ সিঙ্গাড়া আর কাঁচাগোল্লাকে গোল্লায় পাঠিয়ে উঠে গেছে।

গণপতি আমার কথায় চমকে উঠে বলল, কার কথা বলছ?

—ফটিকচন্দ্র। আমি গলায় ঝাঁঝ মিশিয়ে বলি, আড্ডাটাকে রোজ কেমন মাটি করে দেয়।

এবার দ্বিতীয় দফা চমকাবার পালা গণপতির। বলল, সে কি! ও তোমাদের সঙ্গে আসে, আমি ভাবি তোমাদের বন্ধু।

লালু বলল, না। আমরা কস্মিনকালেও আগে ওকে দেখিনি।

অবনী বলল, গৃহপ্রবেশের দিন প্রথম দেখেছি। আমার পাশে বসে ছত্রিশখানা লুচি আর পঁচিশটা রসগোল্লা খেয়েছিল রাক্ষসের মত। কিরে, ঠিক না? —আমার দিকে সমর্থনের চোখে তাকাল অবনী।

আমি বললাম, হ্যাঁ ভাই। ওর খাদ্য তালিকাটা ওই রসগোল্লা আর লুচিতেই ঠেকে থাকেনি সেদিন। আমি তো ভেবেছিলাম ব্যাটা সেই রাত্তিরেই কলেরা হয়ে মরবে।

গণপতি বলল, যাঃ ওরকম বলিসনি। খেতে একটু ভালবাসে আর কি!

লালু চটে গেল। বলল, একটু! ওকে তুই একটু খাওয়া বলিস? খাওয়া ছাড়া ও জানেটা কী? এখানে কি ও আড্ডা দিতে আসে ভাবিস। রামছাগল ব্যাটা!

আমি চিন্তিত গলায় বললাম, যে ছাগলই হোক, আমি ভাবছি রহস্যটা কী! ও কে? কোত্থেকে আসে?

গণপতি মাথা চুলকে বলল, তাহলে বোধহয় পাড়ারই কেউ। বাবা নেমন্তন্ন পত্র ছড়িয়েছিল এন্তার। এই পাড়ারই কোন বাড়ির ছেলে। তবে প্রথম ক'দিন কিন্তু তোদের পেছন পেছনই এসেছে। তাই আমি ভেবেছিলাম—

অবনী বলল, রবাহূত বলে একটা কথা আছে, এবার বাংলার কোশ্চেনে বাক্য রচনা করতে দিয়েছিল। কিন্তু ওতো দেখছি রবাহূতও নয়।

লালু রাগী গলায় বলল, তাহলে এবার এর একটা বিহিত করা দরকার। একটা মোক্ষম দাওয়াই বাতলা দিকি, অবনী। তোর মাথায় তো নানারকম ফন্দি-ফিকির ভাল খেলে!

অবনী গণপতির দিকে তাকিয়ে বলল, কী রাজি?

গণপতি একটু চুপ করে থেকে বলল, আমি কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারব না। কোন কৌশলে যদি ওকে ভাগাতে পার আমার আপত্তি নেই।

আমি বললাম, মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। ছেলেটাকে দেখে মনে হয় ভীতু টাইপের, ওকে ভূতের ভয় দেখাতে হবে। তাহলে অন্তত সন্ধেবেলা তোদের এই নির্জন বাড়ির ধারে কাছে আসতে সাহস পাবে না।

অবনীর মুখ চোখ সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

লালু মৃদু আপত্তি জানাল, ভূতের ভয় ওর নাও থাকতে পারে।

না থাকলেও পাইয়ে দিতে পারব। —অবনী রহস্যময় হাসি হাসল, কিরে গনু, তোদের নিমাইকে দলে পাওয়া যাবে না বল।

স্বচ্ছন্দে। —গণপতি ঘাড় হেলাল।

শূন্যে একটা তুড়ি ফাটিয়ে অবনী বলল, তাহলে শোন।

আমরা ঘন হয়ে বসলাম। অবনী তার প্ল্যান রসিয়ে রসিয়ে বলল। এই ঘরে আগে নাকি একজন বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করেছিল। খবরটা বাড়ি কেনার আগে গণপতির বাবা জানতে পারেননি। কিন্তু পরশু রাত্তির থেকে হঠাৎ ভুতুড়ে উৎপাত শুরু হয়ে গেছে। সন্ধে থেকেই একটার পর একটা ঘরের বাল্ব ফিউজ হয়ে যেতে থাকে। আবার দিনের বেলা সেগুলো দিব্যি জ্বলে ওঠে। স্কাইলাইটগুলো খোলে আর বন্ধ হয়। দরজাগুলো আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যায়। বাইরে থেকে শাটার টেনে রেখে যায়। ঘরের ভেতর যখন তখন গুলির শব্দ শোনা যায় আর বারুদের গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। এমনি ধরনের নানা উৎপাত। শুকনো মুখে, বেশ ভয় পাওয়া গলায় এই গল্পটা ফটকে আসার পর গণপতি বলবে। যেন সকলকেই বলছে, এই প্রথম। তার আগে কাল সকালেই একটা ফিউজ বাল্ব যোগাড় করে লাগিয়ে রাখতে হবে এই ঘরে। কালীপটকা ভরে দুটো মোটা মোমবাতি রেডি করে আনার ভার অবনী নিজেই নিল। ইলেকট্রিক আলোর বদলে ওই মোম দুটো

জ্বলবে এই ঘরে পটকা এমনভাবে সেট করতে হবে যাতে মিনিট দশেকের মধ্যে ওর পলতেয় আগুন ধরে যায়। সেই সঙ্গে আর একটা কাজ সেরে রাখতে হবে। এ ঘরের স্কাইলাইটগুলোয় কালো সুতো বেঁধে সেই সুতোর প্রান্তগুলো ওপরের তলার জানলার শিকের সঙ্গে জড়িয়ে রাখতে হবে এমনভাবে যাতে নিমাই তিনতলার ঘর থেকেই এ ঘরের স্কাইলাইট খুলতে আর বন্ধ করতে পারে।

জলখাবার দিয়ে যাবার পর নিমাইয়ের কাজ হবে এ ঘরের ভেজান দরজা দুটোয় নিঃশব্দে ছিটকিনি টেনে নিয়ে যাবে। তারপর মিনিট কয়েক পরে স্কাইলাইটের খেলা শুরু করবে। এদিকে ভূতের গপ্পো ততক্ষণে জমে উঠেছে। ওই ওই! বলে আমরা খুব ভয় পেয়ে যাব। তারপরে যেন দড়াম করে মোমবাতি নিয়ে যাবে আমরা আঁতকে উঠে জড়াজড়ি করে ছুটে গিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করব। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ, সুতরাং খুলবে না। লালু অন্ধকারের মধ্যে কুকুর কান্নার ডাক ডেকে আমাদের পিলে চমকে দেবে। বহুদিনের প্র্যাকটিস, ওই ডাকাটা ও মোক্ষম ডাকতে পারে। তারপর দেখা যাবে মজাটা।

পরের দিন যথারীতি আমরা আগে-ভাগেই গণপতিদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম।

সব ব্যবস্থা পাকা। আমরা চারজন অপেক্ষা করে আছি কিন্তু ফটকে আসছে না। ধীরে ধীরে বিকেলের পর সন্ধে হল। বাইরে অন্ধকারও ধীরে ধীরে ঘন হল। মাসিমার পাঠানো সিঙ্গাড়ার গামলা আর কাঁচাগোল্লার থালা নিয়ে নিমাই এসে গেল। অবনী অগত্যা মোম দুটো জ্বেলে দিল। তারপর নিমাইকে ইশারায় কাছে ডেকে কানে কানে বলল, তুই চলে যাস না, ধারে কাছেই থাকিস। ওই দাদাবাবু এলে আস্তে করে দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে চলে যাবি। বাকি সব মনে আছে তো?

নিমাই দাঁত বের করে হাসল।

এক মিনিট দু মিনিট করে সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। উত্তেজনায় আমাদের হাতের আঙুল ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। গরম সিঙ্গাড়াও জুড়িয়ে আসছে ক্রমশ, কিন্তু আমাদের সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। গোটা প্ল্যানটা না আপসেট করে দেয় ফটকে। হতভাগা কি জানতে পেরে গেছে আমাদের মতলব। কিন্তু তাই বা কি করে হবে! দিন বুঝেই কি ব্যাটা আজ কামাই করে বসল। এরকম টেনশন নিয়ে কি বসে থাকা যায়? মোম দুটো তো আর বসে নেই, নিয়মমাফিক গলে ছোট হয়ে আসছে। যেন বোমার পলতেয় আগুন ধরিয়ে আমরা অপেক্ষা করছি।

লালু আর থাকতে না পেরে কঁকিয়ে উঠল, মোমবাতি না ফেটে যায় দুম করে!

চুপ কর! অবনী ধমকে উঠল, যখন-তখন ফাটলেই হল! আমি ঘড়ি দেখছি না? এখনো পাক্কা ছ'মিনিট বাকি।

সস্‌স! ঠোঁটে আঙ্গুল ছুঁইয়ে গণপতি ইসারা করল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ার মত সেন্টের তীব্র গন্ধ আমার নাকে এসে পৌঁছাল। পরের

মুহূর্তেই জুতোর শব্দ। ফটকে মুখ বাড়াল ঘরের মধ্যে। এক মুহূর্ত থমকে ঘরের মধ্যে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, ইস! আজ বড্ডই দেরি করে ফেললাম, তাই না?

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, হ্যাঁ। সিঙ্গাড়াগুলো বোধহয় এতক্ষণে ঠাণ্ডা হয়েই গেল।

অ্যাঁ! বলেই ফটকে গামলা থেকে সিঙ্গাড়া তুলে নিল, এক থাবায় দুটো। তারপরেই সিঙ্গাড়ায় জলহস্তীর মত কামড় বসাতে বসাতে বলল, একি মাইরি, তোমরা ভূতের মত মোম জ্বালিয়ে বসে আছ কেন?

লালু তড়বড়িয়ে বলল, বাল্ব ফিউজ হয়ে গেছে।

অবনী বলল, তাইতো গণপতি, আর একটা বাল্ব কিনিয়ে আন না নিমাইকে দিয়ে!

কানে পৌঁছাবার মত নয় তবু আমরা টের পেলাম দরজায় ছিটকিনি আঁটা হয়ে গেল। শব্দটা ভুল শুনিনি তার প্রমাণ লালু আমাকে চিমটি কাটল।

গণপতি যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাতে একটা সিঙ্গাড়া তুলে নিয়ে বলল, লাভ নেই। সেই তো আবার ফিউজ হয়ে যাবে।

ফিউজ হয়ে যাবে! তার মানে? প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে অবনী গণপতিকে চোখ টিপল। কিন্তু ফটকের তখন প্রায় বেহুঁশ অবস্থা। তার হাত একবার গামলা, একবার থালা ছুঁয়ে চলেছে। মনে হচ্ছে আজ দেরিতে আসার জন্যে বুঝি মরিয়া হয়ে উঠেছে। গণপতি অবনীর ধরতাই পেয়ে সবিস্তারে গল্পটা শুরু করল। বেশ জোরে জোরেই, যাতে ফটকের কর্ণগোচর হয় প্রতিটি শব্দ।

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে মনে হল, কারণ ফটকে খাওয়া থামিয়ে বার দুই গণপতির মুখের দিকে তাকাল। এমন সময় বেশ শব্দ করে স্কাইলাইট দুটো নাচানাচি শুরু করে দিল।

ওই ওই! —আমি আঁতকে ওঠার মত করে চেঁচিয়ে উঠলাম।

লালু এক হাত লাফিয়ে উঠে 'উরি বাবা' বলে আমাকে জাপটে ধরল। অবনী পাংশু মুখে বলল, এ কী রে গনা! এ যে ভুতুড়ে কাণ্ডই শুরু হয়ে গেল!

এই তো সবে শুরু। গণপতি বলল, একটু বস, সবই নিজের চোখে দেখতে পাবে। কিভাবে যে আমরা দিন কাটাচ্ছি...রাতে ঘুমোতে পারি না ভাইরে!

ইস বড্ডই দেরি হয়ে গেল আজ! শেষ কাঁচাগোল্লাটা মুখে পুরে দিয়ে ফটকে আচমকা উঠে দাঁড়াল, আচ্ছা—

তার মুখ দেখে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু সত্যিই ভয় পেয়েছে। টের পেয়ে আনন্দই হচ্ছিল আমার।

ভয় পাওয়া গলা করে আমি দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠলাম, বস! যাবে কী? যেতে

গিয়ে শেষে কি প্রাণটা খোয়াবে? দেখছ না কী শুরু হয়ে গেছে!

ফটকের মুখ দিয়ে কেমন গোঁ গোঁ শব্দ বেরল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে, আমাদের বহুক্ষণের উত্তেজনার অবসান ঘটিয়ে বন্ধ ঘরের মধ্যে পর পর দুটো বোমা ফাটার আওয়াজ হল। চোখের মোমবাতি দুটো ছিটকে গিয়ে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। সেই সঙ্গে আর্তচিৎকার। হুড়োহুড়ি। অবনীর গলা পেলাম দরজার কাছ থেকে। দরজায় দুমদুম আওয়াজ করছে, ভয়ার্ত গলায় চেঁচাচ্ছে, খোল খোল দরজা খোল। এ কী! কে আটকে দিল বাইরে থেকে?

একটা কুকুরের কান্না ঘরের অন্ধকারকে যেন ফালা ফালা করে দিল এই সময়। সেই সঙ্গে গণপতির আর্তনাদ, ছাড়, ছাড়! একটা ঝটাপটির শব্দ। পেতলের গামলা আর থালাটা ছিটকে পড়ল মেঝের ওপর ঝনঝন করে। হঠাৎ মনে হল বরফের মত ঠাণ্ডা দু'খানা হাত সাঁড়াশির মত আমার গলা চেপে ধরেছে। প্রাণপণে চেঁচাতে গেলাম কিন্তু আমার গলা দিয়ে গোঙানির মত সামান্য একটু আওয়াজ বেরল মাত্র। জ্ঞান হারিয়ে ফেলার মুহূর্তে বুঝতে পারলাম, আমাদের তৈরি ছকের বাইরে ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটছে। আর রক্ষা নেই।

সেকেণ্ড কয়েকের জন্যে বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। চোখ মেলে দেখি মেঝের ওপর চিৎপাত হয়ে পড়ে আছি। সিলিং-এর আলোটা দিব্যি জ্বলছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম অবনী আর লালু ঘরের এক কোণে বসে ঠক ঠক করে কাঁপছ। বিধ্বস্ত চেহারায় গণপতি পড়ে আছে তক্তপোষের ওপর চোখ উলটে। ধড়মড় করে উঠে গণপতির কাছে গেলাম। না, বেঁচেই আছে, তবে অজ্ঞান।

অতি কষ্টে বলল, জল শিগগির জল আন!

অবনী আর লালু দু'জনেই উঠে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু ঘরের মধ্যে কোথাও জলের কুঁজো নেই। জলের গেলাসগুলো উলটে জল গড়াচ্ছিল মেঝেময়। দুই হাতে সেই জল থাবড়ে আমি গণপতির চোখেমুখে জলের ছিটে দিলাম। লালু ছুটে গেল দরজা খুলে নিমাইকে ডাকতে কিন্তু দরজা বাইরে থেকে বন্ধ।

অবনী আঁতকে উঠে বলল, আরে এ কী কাণ্ড! ফটকে? ফটকে গেল কোথায়?

সত্যি আমাদের কারো মনেই ছিল না ফটিকের কথা! তক্তপোষের নিচে টিচে সব জায়গা দেখা হল, ফটকে ভ্যানিশ। একেবারে কর্পূরের মত উবে গেছে যেন।

এরপরে আর কোনদিন ফটকে ও বাড়িতে আসেনি। আমরাও যাইনি। পরে শুনেছিলাম ঘটনাটা। ফটিকচন্দ্র কুণ্ডু বলে একটা ছেলে সত্যিই ছিল গণপতিদের পাড়ায়। কিন্তু সে ছিলই, এখন নেই। ক'মাস আগে নাকি দীঘার দিকে কোথায় বরযাত্রী হয়ে যাচ্ছিল বাসে করে। অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। তারপর তাকে ও-পাড়ার নেমন্তন্ন বাড়িতে কেউ কেউ দেখেছে। ওই বরযাত্রীর পোশাকেই। গিলে করা পাঞ্জাবি, চুনোট করা ধুতি, গায়ে সেন্টের গন্ধ।...

ভূতেরা এরকমই হয়

বিকাশ বসু

একদিন এক ভূতের সঙ্গে আমার দেখা। বিশ্বাস হল না তো। না হবারই কথা। আমারই মাঝে মাঝে অবিশ্বাস হয়। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করি—আচ্ছা, ঠিক দেখা হয়েছিল তো? কিন্তু এরকম প্রশ্নের কোনো মানে হয় না। শুধু চোখের দেখাই কি দেখা? কত কথা হল, সেটা কি কিছুই নয়? কিন্তু এমনও তো হতে পারে ব্যাপারটা আদৌ ঘটেনি। ভয় পেলে মানুষের কল্পনাশক্তি বেড়ে যায়। মানে সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া আমার মনগড়া, এমনও তো হতে পারে। তা অবিশ্যি পারে। তাহলে আবার একবার গোড়া থেকেই ভেবে দেখতে হয়।

ঘটনাটা ঠিক ঘটল কখন? কখন আবার? ঠিক সময়। ঠিক সময় মানে? ভূতেদের দেখা দেবার ঠিক সময় বলতে দো দুটো-রাতদুপুর আর দিনদুপুর। না রাতদুপুর ঘটেনি ঘটনাটা। ঠিক সময় মানে ঠিক দুপুরবেলা।

কোথায় দেখাটা হল? চিলেকোঠার ছাতে। আবার কোথায়। সেই জন্যই তো আরও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়—সেই-ই এসেছিল মানে তিনিই এসেছিলেন। চিলেকোঠার ছাতে, একা নির্জনে দেওয়ালে ঠেক দিয়ে বসে আমি ভূতের গল্প পড়ছি, ঠিক সেই সময়।

এমনিতেই আমি গল্প খুব ভালবাসি। কোনো গল্পই—তা সে বাঘ শিকারের গল্পই হোক, আর গুপ্তধন আবিষ্কারের গল্পই হোক কি উকুনে বুড়ির গল্পই হোক—কোনও গল্পই আমার মিথ্যে বলে মনে হয় না। শুনেছি সবই নাকি লেখকদের কলমের কায়দা। তা সে যাই হোক, মনে হয় যেন সব সত্যি, চোখের সামনে সব দেখতে পাচ্ছি। ভূতের গল্প পড়েও মনে হয় সব সত্যি। চিলেকোঠার সেই ভূতের গল্পটাও ছিল দারুণ, আমাকে ভূত বিশ্বাস করিয়ে ছাড়ছিল। আর একটু হলেই পুরোপুরি বিশ্বাস করে ফেলেছিলুম আর কি। ঠিক সেই সময়—

ঠিক সেই সময় ভূত বলল, আমরা কিন্তু মোটেই ওরকম না। হয়ত ঠিক ভূত নয়, হয়ত অন্য কেউ, মোট কথা কে যেন বলল, আমরা কিন্তু ওরকম না।

গল্পে একেবারে ডুবে ছিলুম, তাই চমকে উঠেছি। কিছু না ভেবেই বললুম, কী রকম না?

ভূত বলল, ঐ যে গল্পে যে রকম লিখেছে, ওরকম না।

নিঃসাড় নিঃঝুম দুপুর। আশেপাশের সব বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ। গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ছে না। কোত্থেকে হঠাৎ একটা ধূলোর ঘূর্ণি ঘুরে গেল ছাতের

ওপর দিয়ে। আল্‌সে থেকে একটা কালো বেড়ালও যেন লাফিয়ে পড়ল কার্নিসে।

ভয় পেলে? কে যেন বলল। কে যেনই বলতে হয়—দেখতে তো পাচ্ছি না তাকে।

ভয় পাব কেন! বেশ সাহসের সঙ্গেই বলেছি কথাটা।

কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তবু মনে হল, ভূত যেন মুচকি হাসল, তাহলে?

তাহলে তোমরা কী রকম? আমি সত্যিকার সাহসের পরিচয় দিলুম। এবার। এরকম একটা প্রশ্ন সরাসরি করতে পারব কোনও ভূতকে কোনওদিন ভাবতেই পারিনি। অথচ করে ফেললুম প্রশ্নটা। কী করে যে সাহস বেড়ে গিয়েছিল, কে জানে!

সাহসী লোকদেরই ভূতেরা বেশি পছন্দ করে বোধহয়। আমার সাহস দেখে খুশি হয়ে ভূত বলল, সত্যিই জানতে চাও আমরা কী রকম? বেশ আমি তোমাকে নেমন্তন্ন করলুম।

ভূতের কাছ থেকে এমন সহৃদয় ব্যবহার পাব আশা করিনি। আমার সাহস বেড়ে গেছে আরও এক ধাপ। বলা যায় ভূতই আমার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছে। বললুম, খাওয়াবে কী, কথায় বলে,

ভূতের বাড়ি নেমন্তন্ন

হাওয়া খেয়ে থাক চন্ন।

বলি, খাওয়াবে কী? তোমরা তো হাওয়া খেয়ে থাক শুনি। ভূত রাগতেও জানে দেখা গেল। রীতিমত রেগে বলল, তোমার মুণ্ডু খেয়ে থাকি। ভূতদের সম্পর্কে সব খবরই রাখ দেখছি। ভূতবিশারদ আমার!

আমি ভূতের রাগ পড়াবার জন্যে সবিনয়ে বললুম, অন্যায় হয়ে গেছে দাদা।

ভূত বলল, শোনো হে', তোমাকে আমি কবিরাজি কাটলেট খাওয়াব। যাবে কি না বল আমার বাড়ি।

কবিরাজি কাটলেটের জন্যে—তোমরা জান—আমি বেরিং প্রণালী, ম্যাদাগাস্কার আইল্যাণ্ড, প্যাটাগোনিয়া ডেজার্ট ইত্যাদি ইত্যাদি ভূভারতের সব জায়গায় যেতে রাজি। কলকাতার ভূতের বাড়ি তো তার কাছে নস্যি।

কিন্তু সবার আগে ভূতের ঠিকানা জানা দরকার। আমি বললুম, তো তোমার বাড়িটা ঠিক কোন জায়গায়?

ভূত বলল, শিবকালী রেস্টুরেন্ট।

আমি বললুম, কোন টেবিল?

ভূত বলল, যেদিকে পার্কটা রয়েছে।

আমি বললুম, ডানদিকের? না বাঁদিকের জানলার ধারে?

ভূত বলল, ডানও নয়, বাঁও নয়। মাঝখানের জানলা, কাঠের পার্টিশানের আড়ালে।

আমি বললুম, ও বুঝেছি, বুঝেছি।

ভূত ঝাঁঝিয়ে উঠল, ছাই বুঝেছো। কিচ্ছু বোঝনি। কবে নেমন্তন্ন তা-ই জিগ্যেসই করলে না।

আমি বললুম, কেন ও তো জানা কথা—সামনের অমাবস্যা।

ভূত বলল, ধ্যেৎ। তুমি বড্ড সেকেলে। অনেক আধুনিক হয়ে গেছে ভূতেরা। ওসব অমাবস্যা-টস্যা মানে না আজকাল। তুমি কোনও খবরই রাখ না।

আমি হাঁদার মত প্রশ্ন করলুম, অমাবস্যা নয়, তবে?

ভূত বলল, দোলপূর্ণিমা। সন্ধে ছ'টা।

আবার একটা ধূলোর ঘূর্ণি ছাতের ওপর কয়েক পাক খেয়ে আল্‌সে টপকে উধাও হয়ে গেল। আমার মনে হল, একে বোধহয় পাকা নেমন্তন্নই বলা যায়। ভূত হয়ে এর চেয়ে আর কত ভালভাবে নেমন্তন্ন করবে? ভূতেরা এরকমই হয়, তারা কি চিঠি লিখে নেমন্তন্ন করে?

অতএব দোলপূর্ণিমার দিন সন্ধে ছ'টার একটু আগেই সেজেগুজে শিবকালী রেস্টুরেন্টে হাজির হয়েছি।

কাঠের পার্টিশানের আড়ালে নির্দিষ্ট টেবিলে এক ভূত—থুড়ি এক ভদ্রলোক—বসে, সামনের চেয়ারটা খালি, যেন আমারই অপেক্ষায় রয়েছেন সেই ভদ্রলোক বা ভূত।

প্রথমেই খট্‌কা। ভদ্রলোক কখনও ভূত হতে পারে? কি করে বলব। সবই সম্ভব। তাছাড়া আরও একটা কথা। ভূত না হলে এমন দিনক্ষণ মিলিয়ে ঠিক জায়গাটিতে ভদ্রলোক এমন একা একা বসে থাকবেনই বা কেন। আর সামনের চেয়ারটা এমন খালিই বা পড়ে থাকবে কেন।

দেওয়ালে টাঙানো বড় ঘড়িটা দেখে নিলুম। কাঁটায় কাঁটায় ছ'টা। এবং আজই তো দোলপূর্ণিমা। পকেটে রয়েছে মা, ছোটকা ও গাবুলদার কাছ থেকে পাওয়া মিলিয়ে দোলের পার্বণী দশ-দশটা টাকা। সব হিসেব যখন সহজে মিলছে তখন নিশ্চয়ই কোনও ভুল হয়নি।

আমি এগিয়ে বললুম-ইয়ে আপনার নামটা।

সেই ভদ্রলোক বা ভূত বলল, ভূতনাথ সমাদ্দার।

যাক। নামটাও মিলে গেছে, ভূতনাথ। কিন্তু সেই সঙ্গে খট্‌কাও রয়ে যাচ্ছে যে। ভূতেরা কি সমাদ্দার হয়? হবে নাই বা কেন? আড়তদার, দোকানদার, হাবিলদার—সব রকমেরই ভূত হতে পারে। ভূতনাথ মানে তো ভূতদের রাজা—সমাস-টমাস করলে তো সেরকমই দাঁড়ায়?

ভূত বলল, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।

বেশ ভদ্রই বলতে হয় ভূতনাথবাবুকে। ভূতকে কি ভূতনাথবাবু বলা সঙ্গত? এসব খুচরো চিন্তায় কাজ কি, গলায় যখন দরদ মেশানো আহ্বান। ভূতই হোক আর ভদ্রলোকই হোক, আমি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ি।

এবার কথাবার্তার পালা। কিন্তু কীভাবে শুরু করা যায়? ভূতের সঙ্গে কী বিষয়ে কথা বলা যায়? আবহাওয়ার কথা পাড়া যায় না। ভূতের কাছে শীতও যা গ্রীষ্মও তাই। আমি কথা খুঁজে মরছি, এমন সময় ভূত পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বের করল। আমি ভূত দেখার মত আঁতকে উঠলুম। নিশ্চয়ই কবিতা।

এ কী উভয় সঙ্কটেই পড়া গেল। একদিকে কবিতা অন্যদিকে কবিরাজী কাটলেট! কো ভাডিস, কোন দিকে যাই? আমাকে আর যেতে হল না, বেয়ারা এসে গেল। আমার কবিতা-আতঙ্ক চলে গেল মুহূর্তেই। নিজের অজান্তেই নিজেই বললুম, তাহলে অর্ডার দিই? ভূত বলল, বেশ তো দিন না।

পেটে খেলে অনেক কিছুই সইয়ে নিতে পারা যায়। এক্ষেত্রে সইতে হবে ভূতে-গড়া কবিতা। দেখা যাক কতখানি পারা যায়। খুব কি অখাদ্য হবে জিনিসটা। কাটলেট সহযোগেও? দেখা যাক।

একে একে ২২১/২টা কবিতা পড়লেন ভূতনাথবাবু। ২২টা পুরো আর একটি অসম্পূর্ণ। কবিরাজী কাটলেটের গন্ধে কবিতাগুলো মন্দ লাগছিল না। কবিতার নিজগুণেও হতে পারে। ভূত বলল, শুনুন, এটা আমার বাল্যকালের রচনা ঃ

চলো যাই ইয়োকোহামা
সেখানেতে মেইজোমামা
আলুবড়া ভাজছে
জাপানের যত গামা
ছুঁড়ে ফেলে ফুজিয়ামা
মুঠো মুঠো তাই তুলে খাচ্ছে।

আমি বললুম, বাঃ। একটা জিনিস খুব ভাল লাগছে, আপনার কবিতার বিষয়বস্তু খাদ্য। একালে এমন খাদ্যরসিক কবি আর কি কেউ আছেন?

প্রশংসাবাক্যে কোথায় আপ্লুত হবে, তা নয়, ভূত রাগ দেখিয়ে বলল, তাহলে আমি বোধহয় সেকেলে কবি, আপনাকে বোর করছি। আমি উঠি।

না না তা কেন? আপনি বসুন। হাত ধরে টানি। মুখে অবশ্য বলি না, চলে গেলে কাটলেটের কি হবে?

সেই সময় এলো দুই বড় প্লেটে বিশাল দুই কবিরাজী কাটলেট। সঙ্গে যথাযোগ্য স্যালাড, টোম্যাটোর সস। আর বিশেষ কিছু বলতে হল না। ভূতনাথবাবু বা ভূত

মহাশয় বসে পড়লেন চেয়ারে। আমি বললুম, আপনার খাদ্যবিষয়ক কবিতাই খাদ্যকে টেনে আনল, তানসেনের গান যেমন বৃষ্টিকে টেনে নামাতো।

ভূত হেসে বলল, কী যে বলেন।

আমি ভাবলুম, ভূতনাথের আজ দিল খোশ। তার কবিতার যোগ্য সমঝদার পেয়ে। সেই আনন্দে বেয়ারাকে বকশিশ দেবে। হয়তো গোটা একটা টাকাই।

খাওয়া শেষ হতেই কাঁসার থালায় বিল নিয়ে এল বেয়ারা। আমারই সামনে এসে দাঁড়াল প্রথমে। আমি ভূতনাথকে দেখিয়ে দিলুম। ভূতনাথ আমাকে দেখিয়ে দিল। এ কী রকম ব্যবহার? মোটেই নিমন্ত্রণকর্তার মত নয়। আমি জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত তাকালুম তার দিকে —এর মানে কী?

ভূত বলল, বারে অর্ডার দিলেন, এবার পয়সা দিন।

অর্ডার? হ্যাঁ তা দিয়েছি। কিন্তু আমি তো আপনার হয়েই—

ভূত বলল, আপনি কি আমাদের বাড়ির নাড়ুগোপাল যে আমার হয়ে কাজ করে দেবেন।

নাড়ুগোপাল? কে নাড়ুগোপাল?

আমাদের বাড়ির কাজের লোক।

আমি বলি—তা কেন, তো কেন, আমি—

ভূত বলল, তা কেন, তা কেন কেন করছেন কেন। বেশ ভাল করে ভেবে বলুন তো আপনি আমাদের বাড়ির নাড়ুগোপাল কিনা। ইতিমধ্যে আমাদের দিকে অন্য টেবিল থেকে দৃষ্টি ছুটে আসতে শুরু করেছে। আমি প্রায় চোখ বুজে বললুম, এর জন্যে ভাল করে কেন, আদৌ ভাববার দরকার নেই। আমি আপনাদের বাড়ির নাড়ুগোপাল নই। ছিলুমও না কস্মিনকালে।

ভূত বলল, তাহলে তো হয়েই গেল। এবার বিল মিটিয়ে দিন।

আমি সবিনয়ে বললুম, আপনার নিশ্চয়ই খুব ভুলো মন।

ভুলো মন? আমার? কি যা তা বকছেন। ভূতকে এবার যেন একেবারেই মানুষের মত লাগছে।

শেষ চেষ্টার মত বললুম, আপনার কি একটুও মনে পড়ছে না—

মনে পড়ছে না, মানে? কী আবার মনে পড়বে, আর পড়বেই বা কেন।

মনে পড়ছে না, সেদিন চিলেকোঠার ছাতে আমাকে নেমন্তন্ন করে—

ভূত এবার বিকট হাস্যে ফেটে পড়ল, নেমন্তন্ন? আপনাকে? রামোঃ কস্মিনকালেও না।

ভূতের মুখে রাম নাম। তাও আবার দেবভাষা সংস্কৃতে। আমার মোহভঙ্গ হল। সামনে উপবিষ্ট ব্যক্তিটি ভূত যদি হয়ও, আমার সেই চিলেকোঠার ভূত নয়।

ভূত বলল, অনেক হয়েছে। নিন এবার পয়সা ছাড়ুন।

ছাড়তেই হয়। ভাগ্যিস পকেটে দোলের পার্বণীর টাকা ক'টা ছিল। আর তাতেই

কুলোল। নইলে তো লজ্জার একশেষ হত আজ। কিন্তু এমন কাণ্ড কী করে হয়। দিনক্ষণ সব মিলে গেল, শিবকালী রেস্টুরেণ্ট, দোলপূর্ণিমার সন্ধে ছ'টা এমনকি লোকটার নাম ভূতনাথ। এ নিশ্চয়ই সেই চিলেকোঠার ভূতের কারসাজি। যদিও আজ পয়লা এপ্রিল নয়, আমাকে ফুল বানিয়ে দিল।

সারাক্ষণ আড়ালে দাঁড়িয়ে মজাও দেখছে হয়ত। হয়ত বা কাঠের পার্টিশানের ওদিকটায় এখনও দাঁড়িয়ে হাসছে।

পার্টিশানের আড়াল থেকে সত্যিই হাসি শোনা গেল এবার। চেনা হাসি। ভূতনাথবাবুর। অবাক কাণ্ড। লোকটা এই এখানে ছিল, মুহূর্তের মধ্যে পার্টিশানের ওপারে গেল কি করে। কী করে আবার। তাই তো হবার কথা। আমি যেমন গাধা। ভূতেরা তো এরকমই হয়। পরের ঘাড় ভাঙাই তো তাদের কাজ। ভূতের ঘাড় ভাঙতে পেরেছে এমন কারও কথা কখনও শোনা গেছে কি? ভূতেই আমায় বুঝিয়ে গেল ব্যাপারটা আমার দোলপার্বণীর সবটুকু খসিয়ে।